শুদ্ধসত্ত্ব বসু

৪৬/১, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬

মা ও বাবাকে

পূর্বখণ্ড

ভূমিকা

পাখির গান শোনার আগে তার জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের সংগে পরিচয় প্রয়োজন।

সত্যিই মুক্ত বিহংগের মতো মোলায়েম আর মিষ্টি চেহারা পাখির, টানা টানা দুটো চোখ, পাৎলা সরু আনুপাতিক ভুরু, মসৃণ কপোলতট, উর্মিল হাসির আঘাতে সেই তটদেশে স্নিগ্ধ টোল পড়ে, গোল আবর্তের সৃষ্টি হয়। ধূসর মেটে অথচ ময়লা ময়লা গায়ের রঙ, ভরা যৌবন। পাখির চোখের ওপরে চোখ পড়লে সহসা অন্যমনস্ক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেবার উপায় থাকে না কারুর, বিশেষ করে কোনো পুরুষ মানুষের।

শুধু দেহের ঋদ্ধি নয়, মনের শক্তিতেও পাখি অদ্বিতীয়। পাখি ভয় পেয়েছে কোনো ব্যাপারে—কেউ কখনো দেখেনি। যে কোন রকমের বিপদ আসুক—সে কোমর বেঁধে সেই বিপদকে রোখবার জন্যে এগিয়েছে। গরীব সে, মাতৃহীন, পিতৃহীন সে,—তবু টাকার জৌলুস দেখিয়ে তাকে দুর্বল করতে পারেনি কেউ, গোপন চেষ্টায় যারাই এদিকে উন্মত্ত ছিল, তাদের সকলকেই সায়েস্তা করেছে সে।

পাড়াগাঁর মেয়ে পাখি, সহরের মার্জিত ঠোঁট বাঁকানো মেয়েদের ঢঙ সে জানে না। সাধারণ, সরল—একগুঁয়ে জীবন যাত্রার সংগে পাখির পরিচয়।

এই পাখির জীবন নিয়েই আমাদের কাহিনী বা গল্প।

নটবরের কথা মনে করতেও পাখির ঘেন্না লাগে, কি রকম একটা জঘন্য জুগুপ্সায় তার মন কণ্টকিত হয়ে ওঠে। নটবর সা-কে কি অগাধ বিশ্বাসের সংগে সে গ্রহণ করেছিল, একই গ্রামের ছেলে, একই বয়সের ছেলে, একই জাতের ছেলে নটবর—তাকে ত' অবিশ্বাসের

কিছু ছিল না। কিন্তু তার পেটে পেটে যে এত শয়তানি—পাখি ত ধারণাই করতে পারে নি।

তখন বছর কুড়ি বয়স পাখির, নটবরেরও ওই রকম। পাখি দেহে মনে বেশ ভারী আর বয়স্ক হয়ে উঠেছে যেন, আর নটবরের তরল কণ্ঠস্বরে পৌরুষের একটা পলেস্তারা পড়েছে—আর মাছের ডানার মতো পাৎলা ফিনফিনে সরু গোঁফেব রেখা দেখা দিয়েছে। খালবিল মাঠঘাট বনবাদাড় ঘেরা গ্রামের ছেলেমেয়ে ওরা দুজন। কয়েক পুরুষ পেছিয়ে গেলে ক্ষীণ একটা আত্মীয়তার ধারাবও খোঁজ হয়তো পাওয়া যাবে ওদের দুজনের মধ্যে।

গ্রামে দাংগা বেধেছিল—অসহায় পাখির আর কোন উপায় ছিল না নটবরকে বিশ্বাস করা ছাড়া। আশেপাশের দু চারখানা বাড়ীতে তখন লুণ্ঠন শেষ হয়েছে—সারা গ্রামের আর্ত বিষণ্ণ চীৎকারে পাখি চমকে উঠলো। সে কচু বনের মধ্যে মড়ার মতো পড়ে থেকে সে যাত্রা আত্মরক্ষা করেছিল—এতটুকু বিচলিত না হয়ে।

এই অবস্থায় রাত যখন দুটো বেজে গেছে, লুণ্ঠনকারীর দল চলে গেছে দূরে—পাখি দেখতে পেলে কচুবনের উত্তর দিক থেকে বের হয়ে কে যেন তারই দিকে এগিয়ে আসছে। পাখি প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু একটা মাত্র মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখে তার ভয় কিছুটা কমলো। একজন পুরুষের সংগে লড়তে সে পারবে—তাকে হারিয়ে দেবার সাহস ও বিক্রম তার আছে বৈকি! প্রথমটা পাখি ওই কচুবনের মধ্যে লুকিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলে, কিন্তু মূর্তিটা যখন তারই দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো—তখন সে আর নিশ্চল থাকতে পারলো না, সে-ও উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু দ্বৈরথের প্রয়োজন ঘটলো না। মূর্তিটি নটবরের, সে বলে উঠলো—পাখি, চল আমরা পালিয়ে যাই। আমি তোকে বাঁচাতে আসছিলাম, তোকে দেখেছি—তুই কচু বনে লুকিয়ে পড়লি, তাই বলিনি কিছু। এখন ওরা চলে গেছে—চল পালিয়ে যাই।

পাখি একটু শান্ত সুরে বললে—কিন্তু কোথায়? বাড়ী ঘর ছেড়ে, দেশ গাঁ ছেড়ে, চেনা জানা মানুষ ছেড়ে—

নটবরের যেন উত্তরটা মুখস্থ—এমনভাবে বলতে লাগলো—আমি ত' সংগে থাকবো তোর। কোলকাতা মহানগরীতে যাই চল।

পাখি সেই অন্ধকারের মধ্যে নটবরের চোখ লক্ষ্য করে মুখ তুললে, চোখে চোখ রেখে বললে—ষ্টীমারে উঠবে কেমন করে? সকাল হলেই ত' আবার ভয়—তোমার যতটা না হোক,—আমার—

বাধা দিয়ে নটবর বললে—কি যে বলিস পাখি,আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে তোকে। তোর তরে আমি এই প্রাণ দিতে পারি জানিস। আমার সংগে চল, একটা ব্যবস্থা কিছু হয়ে যাবেই।

এক সংগে বেড়েছে দুজন, এক মাঠে খেলেছে, এক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছে, একই গাছের বকুল কিম্বা কৃষ্ণচূড়া ফুল কুড়িয়ে সৌরভ গ্রহণ করেছে। নটবরের এই আবেগ দীপ্ত কণ্ঠস্বরে পাখির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সে ত' নটবরকে এমন করে আপনার ভাবতে পারে নি। নটবরই তার বিপদে ছুটে এসেছে, তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে বিপন্ন করতে চাইছে। পাখি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল, সে নটবরের হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের দুটো হাতে চেপে ধরলো।

নটবর বললে—কিছু ভয় করিস না পাখি, আমি তোকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবো। চল, আমরা সহরে পালাই, মহানগরে। এখান থেকে একবার বের হতে পারলে, আর কোন ভাবনা থাকবে নারে—

সুতরাং পাখিকে দেশ গাঁ ছেড়ে, নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে, পরিচিত মাঠ পুকুর ত্যাগ করে, শিউলি বকুলতলা ফেলে রেখে—চোর যেমন নিজের পায়ের চিহ্ন মুছে মুছে এগিয়ে চলে, তেমনি ভাবে বাপমার স্মৃতি ঘেরা ভিটে ছেড়ে, শৈশব কৈশোর তারুণ্যের লীলাক্ষেত্র ত্যাগ করে পিছনের জীবন ও সময় মুছে নটবরের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তে হলো।

নটবর সেয়ানা কিনা হলপ করে বলা চলে না, সে পাখিকে

ধর্মোন্মাদ মানুষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণটুকু নিরাপদ করে পালাতে কুণ্ঠিত হলো না। পাখি শুধু নটবরের মুখের দিকে তাকালো। দিনের আলোয় তার মুখ বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে পাখির দিকে না তাকাতেই হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

পাখি বুঝতে চেষ্টা করলো। মেয়ে পুরুষের ১মান বয়সে প্রেম হয় না। নিজের জীবনটাই যেখানে বড় হয়ে ওঠে—সেখানেই ত' চাচা আপনাকে বাঁচিয়ে সরে পড়ে। নটবরের প্রতি ঘৃণা হলো, মানুষের প্রতি সেই পাখির প্রথম ঘৃণা।

তবু নটবর যটুকু করেছে পাখির জন্যে, সেটুকু না বলারও কোনো হেতু নেই। নটবর শুধু প্রাণটুকুর রক্ষা করার জন্যে প্রতিশ্রুতি পায় নি—পাখির মত এমন একটা লোভনীয় শিকার ধরে দেওয়ার জন্যে কয়েকটা রৌপ্য মুদ্রাও জুটেছিল। নিরাপদ স্থানে এসে তার প্রথম কাজ হলো থানায় গিয়ে খবর দিয়ে পাখির প্রাণ বাঁচানর চেষ্টা করা। সে যথাসাধ্য স্মরণ করেই পাখিকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে সুদীর্ঘ বিবরণ দাখিল করে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অভিনয় করে এখনই পুলিশ ফৌজ পাঠিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করার অনুরোধ জানালে। নটবরের সে কি করুণ অসহায়তা।

ধর্মান্ধ গোঁড়ামির উন্মত্ততা থেমে যাবার পর পুলিশের যখন ব্যাপক অনুসন্ধান সুরু হোল, তখন পাখিকে আর লুকিয়ে রাখা গেল না। আতর আলি নামে এক ব্যক্তির বাড়ী থেকেই তাকে পুলিশ নিয়ে গেল। কিন্তু পাখি তখন সন্তানসম্ভবা। অনেকের অনেক অত্যাচার সহ্য করে সে যেন মা বসুন্ধরার মতো নীরব নিস্তব্ধ সহনশীল হয়ে পড়লো।

খুলনার হাসপাতালে একটা মরা ছেলে প্রসব করার পর পুলিশের হেফাজতে তাকে কোলকাতায় নিয়ে আসা হলো—কোনো নারীমংগল সমিতিতে তার থাকার ব্যবস্থাও করা হলো।

পাখির জীবনে এইটুকুই পিছনের পটভূমি।

॥ এক ॥

এই নাকি কোলকাতা? এত লোক, এত বাড়ীঘর, এই রকম বড় বড় বাঁধানো সড়ক? চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। ছোট বয়সে হাতীপোতার মেলায় একবার পাখি গিয়েছিল যেন কার সংগে—শুধু সেখানেই সে এত লোক দেখেছিল। রাস্তার দুধারে কত দোকান, কত রকমের জিনিস সাজানো। মেলা বসেছে নাকি এখানে—এই কোলকাতায়?

ভয়ে ভাবনায় জীবনের এই নতুন পরিবর্তনে পাখির চেহারায় একটা কাতর বিষণ্ণতা নেমেছিল, চোখ দুটি যেন জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে, মনটা গেছে মরে,—সমস্ত চেহারা জুড়ে সেই নিস্তেজ নিরুত্তাপ চেতনার প্রতিফলন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুলিশের গাড়ীতেই তাকে নিয়ে আসা হলো প্রথমে লালবাজারে, পরে নারীকল্যাণ সমিতিতে।

লালবাজারে প্রৌঢ় এক ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাকে নতুন করে জবানবন্দী দিতে হলো, অর্থাৎ তার জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস আবার বর্ণনা করতে হলো। পুলিশ অফিসারের করুণায় গলে পড়লো পাখি। মানুষের প্রতি তার আশা বিশ্বাস ভালোবাসা—সমস্ত সুকুমার অনুভবগুলিই কমে যেতে বসেছে। সে উপায়ন্তর না দেখে সেই অফিসারকে শ্রদ্ধানম্রকণ্ঠে 'বাবা' সম্বোধন করে বসলো—আপনি আমার বাপের মতো, আমাকে একটা পথ দেখিয়ে দিন, কোথায় গিয়ে কিভাবে চলবো আমি!

ক এক চরম অসহায়তা পাখিকে পেয়ে বসেছে—একি দুর্বলতার সম্মুখীন হলো সে আজ ? সহর দেখে কি ঘাবড়ে গেল সে ? নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলে।

এর পরের দৃশ্য নারীকল্যাণ সমিতি। মস্ত বড় দোতলা বাড়ী, দোতলাতেই কম-সে-কম ষোলটা ঘর আছে। কড়াকড়ি আইন এখানে, বাইরে বার হওয়া নিষেধ—শুধু সাত দিনে দু ঘণ্টা ছুটী—জিনিসপত্র কেনার জন্যে অবকাশ,—সাবান, টুথপেস্ট কিংবা এক-আধ গজ ব্লাউজের ছিট অথবা একটা শাড়ী কি একখানা টাওয়েল বা কচিৎ নতুন বের হওয়া একটা বই। সমিতিতে বাকী ছটা দিন খেটে খেতে হয়। পিন-কুশান তৈরী করো, জামা-সেমিজ বানাও, আসনে ফুল তোলো, সোয়েটার বোনো—সমিতির ম্যানেজার অশ্বিনীবাবুকে কাজ বুঝিয়ে দাও।

শুধু একা পাখি নয়, নারীকল্যাণ সমিতিতে আরো অনেক মেয়েই আছে, ছোট বড়ো মাঝারি, তরুণী যুবতী প্রৌঢ়া, কুমারী সধবা বিধবা। মেয়েদের বিচিত্র জগৎ যেন।

পাখির কেমন হাঁফ ধরে যায়, অবশ্য মাঝে মাঝে। দেশ গাঁয়ের ফাঁকা মাঠের কথা, গাছগাছালি ঘেরা ছোট্ট পল্লীর আরো ছোট্ট ছায়া-শীতল একখানা ঘরের উঠোন, দীঘির ঠাণ্ডা নীলচে জল, ওপরে পরিষ্কার নির্মেঘ আকাশ—সব আজ ছবির মত মনে হয়।

ললিতা এই আশ্রমবাসিনীদের একজন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি এই ডাঙায় এসে ঠেকেছে। পাখিকে অন্যমনস্ক দেখে ললিতা বলে উঠলো—তোমাকে ভাই খুব আনমনা দেখি, ব্যাপারটা কি খুলে বলো ত' ?

ব্যাপার ? কি আবার ব্যাপার ভাই ? নতুন সহরে এলাম,

দেখছি—আর ভাবছি এখানে মানুষের একি ব্যস্ততা। এত সব লোক ছুটছে কেন? আগুন ধরেছে নাকি? সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পাখি বললে।

ললিতা ছাড়ার পাত্র নয়। সে পাখির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের জানালার ধারে, হাতলভাঙা একটা চেয়ার টেনে এনে পাখিকে বসালে তার ওপর, নিজে টেবিলের ওপর চেপে বসলো।

—তোমাকে ভাই বলতেই হবে তোমার জীবনের কথা, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এদিক ওদিক চেয়ে ললিতা নীচু স্বরে বললে—যদি সুবিধে করে উঠতে পারি, এই সমিতির বন্দী জীবন থেকে মুক্ত হবো, তোমাকেও ফেলে যাবো না। তাই ত' শুনতে চাইচি তোমার কথা। তোমার সংগে বন্ধুত্ব হবার পর আমি ত' কোনো সংকোচ করিনি, সব কথা বলেছি—আমার জীবনের কিছু ত' গোপন করিনি—পাখি—

পাখি বললে—আজ থাক ভাই, অন্য একদিন বলবো। সব বলবো, শুধু একটু সময় চাইছি।

সময়? কেন? এখনো মনে বুঝি ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। কার জন্যে? ললিতা টিট্‌কিরি করে।

স্রোতের জলে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো আমি—আমার যে কেউ নেই ভাই যার জন্যে মনটা পোড়াবে।

তুমি দেখছি কাব্যি করতেও পারো। তা যাই করো—তোমাকে কিন্তু বলতেই হবে এই পুণ্যধামে তোমার পদার্পণ কেন? আমি ছাড়ছি না।

পাখি আহত দৃষ্টি তুলে ললিতার দিকে তাকালে একবার, পরে শান্তভাবে বললে—বলবো ভাই, সব বলবো। একটু সামলে নিতে দাও।

॥ দুই ॥

দুপুরে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাখি ললিতার কথা ভাবছিল। আশ্চর্য মেয়ে এই ললিতা! যেমন কঠোর আর তেমনি কোমল তার মন। যার প্রতি যখন মজে, তখনই তাকে মাথার মণি বানিয়ে ফেলে। পাখির প্রেমে সে এখন পড়েছে, তাই পাখি ছাড়া তার একদণ্ডও এখন চলে না। চেষ্টা করেছিল পাখির ঘরে সে নিজের জায়গা করে নেবে, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুপ্রভা লাহিড়ী তাতে রাজী হননি। তবুও সে হাল ছাড়েনি, চেষ্টায় আছে।

সহরতলীর ছোট্ট একটা জায়গার মেয়ে ললিতা। মা বাবা তার জীবিত আছেন, এখনো আছেন কিনা কে জানে, যখন ললিতা ঘর ছেড়ে চলে আসে—তখন তারা বেঁচে ছিলেন। তারা ললিতার বিয়ের ঠিক করেন প্রায় মুমূর্ষু এক ধনীর সংগে; মুমূর্ষু ঠিক নয়,—চিররুগ্ন বললে ঠিক বলা হবে। ললিতা স্কুলে পড়া মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ করেছে, সে কেন ওই বীভৎসব্যাধি ব্যক্তিকে বিয়ে করবে। সে যে কোচিং-এ পড়তো, সেখানকার একজন ছোকরা মাষ্টারের সংগে ললিতার মন দেওয়া নেওয়া ঘটে গিয়েছিল। সেও ঘটেছে খুব আকস্মিকভাবে। কি একটা বিলিতি ছবি দেখতে গিয়েছিল ললিতা ম্যাটিনী শো-তে, একাই। হঠাৎ সেখানে ওই মাষ্টার মশাইয়ের সংগে দেখা। ফেরার সময় মাষ্টার মশাই এক কাপ চা খাওয়াতে কোন এক রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গেলেন, চা খেয়ে গড়ের মাঠে সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার ছায়ার তলায় দুজন পাশাপাশি বেড়িয়েছিল কিছুক্ষণ,—যা দু একটা কথা হয়েছিল—তা নিতান্ত লেখাপড়া সংক্রান্তই, কিন্তু ললিতা মন গেল টলে। ওই মাষ্টার মশায়ের সংগে কথা বলতে গিয়ে ললিতার

গলার স্বর ভিজিয়ে ফেললে, মাষ্টারমশাইও কথার স্বরকে দিলে কাঁপিয়ে। কিন্তু ললিতার বাড়ীতে কেউ রাজী নয়—না মা, না বাবা। মেয়ে নিজের পছন্দমত স্বামী দেখে নেবে—এই সুপ্রাচীন স্বয়ংবরা প্রথা কি আজ আর চলে?

মাষ্টারমশায়ের সংগে পরামর্শ করে এক রাত্রে ললিতা পালাল বাড়ী থেকে। কিন্তু যে জায়গায় ওই মাষ্টারমশাইয়ের আসার কথা ছিল, যেখানে এসে দাঁড়াবার কথা ছিল, তখনো সে আসেনি। কোলকাতা সহরের মতো ওদিকের রাস্তায় অত আলো নেই, স্বল্পান্ধকার পথ, তার ওপর কোথাও মেটে বাড়ী, কোথাও বা কোঠাবাড়ী। সদর রাস্তা ছেড়ে গলি ঘুঁজির মধ্যে দিয়ে পথ করে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ললিতা মহা মুস্কিলে পড়লো। সেখানে কেউ নেই। এক আধটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। ঘণ্টাখানেক গাছের আড়ালে অপেক্ষা করেও যখন ওই মাষ্টারের দেখা মিললো না, তখন সে সোজা হাওড়ার দিকে আসার চেষ্টা করলো। পথে কোন বিপদ ঘটেনি। আস্তে আস্তে রাত ফর্সা হয়ে এলো। সে হাওড়া স্টেশনে এসে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে উঠলো।

সেখানে থেকেই ঘর-ছাড়া ললিতার আসল জীবন সুরু। সবটা হয়তো এখন পাখির মনেই নেই, তবু যেটুকু মনে আছে সেটুকুই বা কম কি! ওয়েটিংরুমে আলাপ হলো থিয়েটারের অভিনেত্রী কয়েকজনের সংগে, তাদের সংগেই ললিতা ভিড়ে গেল। প্রথমে বম্বে পরে আবার কোলকাতায়। কিন্তু যে অদম্য মনের জোর, আর উন্নত শিক্ষা দরকার এই দলে থেকে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার—তা ত' ললিতার ছিল না। নষ্ট হলো তার স্বভাব, নষ্ট হলো তার জীবন। তবু বড় একটা পার্ট দিয়ে যথার্থ নায়িকার ভূমিকায় নামায়নি তাকে কখনো, সেই দুঃখেই সে ওই দল ত্যাগ করেছে। তার ওপর আরো কিছু বৈচিত্র্য, দুএকটা মার্চেন্ট অফিসে সেলস্‌লেডির কাজ, মহিলা মেস, ক্রমে ক্রমে এখানকার ম্যানেজারের সংগে হঠাৎ সম্পর্ক স্থাপন, তারপর এই নারী-

কল্যাণ সমিতি। এখান থেকে আই-এ, বি-এ পাশ দিয়েছে সে, এম-এ পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি।

ললিতা বলে—জীবনের এই আবর্তনে কত লোকের সংস্পর্শে এলাম, কত মানুষ দেখলাম, কিন্তু একেবারে আপন করে কেউ গ্রহণ করে নিলে না। আমি শুধু ওই তরুণ মাষ্টার মশাইকে দোষ দিচ্ছি না, তারও তখন বয়স কম, প্রেমের জন্যে একটা বড় দুঃসাহস দেখানোর নার্ভ তার তখনো তৈরী হয়নি, সে না হয় পিছিয়ে যেতে পারে—কিন্তু আরও অনেক মানুষ দেখলাম, সকলেই আমাকে খেলার সামগ্রী মনে করে নেড়ে চেড়ে দেখলে, গ্রহণ করলে না। কিন্তু ভাই পাখি, তুই বলতো আমি মানুষ—না প্লাষ্টিকের তৈরী মেয়ে যে আমার প্রাণের মর্যাদা ওরা দিলে না?

এ প্রশ্ন পাখিরও। কিন্তু ললিতার মতো গুছিয়ে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে না—মেয়েরা মানুষ না প্লাষ্টিক। ললিতাকে তার ভাল লাগে, তার কথা তাকে ভাবায়। একটু একটু করে সে আসে ললিতার কাছে—ললিতার হাতের মুঠোয়।

শুয়ে শুয়ে পাখি ভাবতে লাগলো। খোলা জানালা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, রোদে আকাশটা যেন পুড়ে গেছে, নির্মেঘ হলেও তাই পোড়া ছাইয়ের মত দেখাচ্ছে। কোলকাতার গরম অসহ্য, চারিদিক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তবু জানালাটা বন্ধ করতে ইচ্ছে হয় না পাখির, জীবনের সবই ত' বন্ধ হয়ে এসেছে। সংকীর্ণ ছোট্ট একটি দোতলা ঘরই তার পৃথিবী, এখানে বসেও যদি বাইরের আকাশ-বাতাসের হাতছানিটুকু বন্ধ হয়—সে বড় মর্মান্তিক হবে। তাছাড়া বৈশাখের এই এলোমেলো হাওয়ার মধ্যে যেন তার এমন কি ললিতার,—তাদের মতো বিস্রস্ত বিশৃংখল জীবনের হাহাকার ভেসে আসে। ধূলোয় ভরে যায় ঘর, টেবিল চেয়ারে ধূলোর আস্তরণ পড়ে, চুলে ধূলোর জট জমে। তবু এই বিশৃংখল হাওয়াকে রুখতে পারে না সে। হাওয়ার সংগেও যেন তার কথা হয়, যেমন হয় ললিতার

সংগে। ললিতার মতো হাওয়াও তাকে তারই জীবনের অনুবর্তনটি এঁকে দিয়ে যায়। জীবনের পথে পথে নির্দেশ দেয়, ইংগিত দেয়, হাতছানি জানায়।

ললিতা ত' পাখিকে সবই বলেছে। বাকী রাখেনি কিছু, থিয়েটারের দলে নেচেছে সে, কোথায় কেমন করে জীবনের অবতরণ ঘটেছে, মনের অবনমন এসেছে—কোন পরিচ্ছেদই বাদ দেয় নি। পাখিই বা বাদ দেবে কি করে? কিন্তু কেমন করে সে তার মৃত পুত্রের মা হওয়ার কথা বলবে? মনটা তৈরী করার জন্যেই সময় চেয়ে নিয়েছে সে।

সন্ধ্যের পর ললিতা আবার এল। বিকেলে বোধ হয় কোথাও বের হয়েছিল, সাজগোজের জৌলুস এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ললিতার চেহারাটা আদৌ সুদৃশ্য নয়, তার ওপর জীবনের বহু ধকল ও দ্বন্দ্ব ঘটে গেছে—তাতে যেন তার স্বাস্থ্যে আরও ভাঁটা পড়ে গেছে। ললিতাকে দেখে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স তার—একথা মনেই হয় না। গাল ভেঙ্গে গেছে, চোখ বসে গেছে, দেহের লালিত্য বা সুষমা সব যেন অকালেই ঝরে গেছে। তবু আজ ভায়োলেট শাড়ী পরেছে কুঁচি দিয়ে, মাথায় রিং দিয়ে খোঁপা বেঁধেছে স্বল্প চুলের গুছি করে, হাতের পায়ের নখে রং লাগিয়েছে, চোখেও সুর্মা, একটু সেণ্ট।

পাখি বললে—তোমাকে ভারি ভাল লাগছে ত' দেখতে।

ললিতা একটুখানি ঠোঁট টিপে হাসলে, টানা সুরে বললে—এটা তোর মনগড়া কথা পাখি,—এই সাজ পোষাক করে অন্ততঃ আমি দশ বারো বার আয়নায় নিজের মুখ দেখেছি, এমন হাস্যকর আর বিশ্রী হয়েছে আমায় দেখতে—আর তুই কিনা বললি আমি সুন্দরী হয়েছি।

পাখি জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি।

কোর্টে গিয়েছিলাম একটা ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী দিতে। সেখান থেকে ম্যাটিনী শো-তে একখানি ছবি দেখে এলাম। নিস্পৃহ ভাবে ললিতা বললে।

সে আবার কি? আকাশ থেকে পড়ার মতো বিস্মৃতভাবে পাখি জিজ্ঞাসা করলে। সে সব আজ আর শুনে কাজ নেই। পরে একদিন এ বিষয়ে তোর সংগে আলাপ করবো। বলে ললিতা উঠে চলে গেল। বোধ হয় সাজ পোষাক ছাড়তে।

কত রকমের মেয়েই যে এখানে আছে—কত বিচিত্র মন এদের, কত বিভিন্ন চরিত্র! অথচ একটা দিকে সবাই সমান—সকলের ভাগ্যই পুড়েছে। কারুর নিজের দোষে, কেউ বা লোভে পড়ে সর্বনাশ ডেকে নিয়েছে, আবার দৈব বিড়ম্বনাতেও লাঞ্ছনা এসেছে কারুর কারুর ভাগ্যে। এখানে এসে পাখির জীবনের দৃষ্টি খুলে গেল। নানা মেয়ের সংগে আলাপ করে সুখ দুঃখের কথা কয়ে সে এইটুকু বুঝেছে যে পল্লীর ছোট একটি ঘরের আরো ছোট্ট সীমানা ঘেরা জীবনের যে গণ্ডী, আসলে তা ঠিক নয়, অন্ততঃ বিংশ শতকের আদর্শের সংঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গেলে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতকে অত ছোট করলে চলে না। দুই আর দুইয়ে চার হয়ে থাকে বলে যে নিয়মটা চলে আসছে—একান্তভাবে সেটাই সত্য—আর কোন কিছুর জাগতিক মূল্য কিছু নেই, একথা ঠিক নয়। পাড়াগেঁয়ে সংস্কারের লজ্জায় পাখির মনটা কুণ্ঠিত হতো, মাঝে মাঝে অসহায় এক করুণ্যে কাতর হয়ে উঠতো, কিন্তু ক্রমেই বুঝেছে—পিছনটা জীবন নয়, জীবনের অববাহিকাও নয়, ঘটনা কি জীবনে সম্ভব, সে সম্পর্কে সজাগ থাকতেই হবে। এই সমিতির গেনু মাসির কাছ থেকে অন্ততঃ এইটুকুই পাখি শিখেছে।

শোনা যায় গেনুমাসির স্বামী পুত্র বর্তমান। স্বামীর সংগে বনিবনা হয়নি, চারটি সন্তান আর স্বামী ত্যাগ করে মেসিনের একটি কল সম্বল করে গেনু মাসি ঘর ছেড়ে এই নারীকল্যাণ সমিতিতে এসে জুটেছেন।

গেনু মাসির আসল নাম জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী। বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ সোনার মত উজ্জ্বল, দুধে আলতার মতো ফর্সা। মুখশ্রী বয়সের ভারে গতায়ু হলেও কপালে লাল সিঁদুরের টিপ আর এক মাথা চুলের মধ্যে সিঁদূর দেওয়া সীঁথির বাহারের জন্যে অপূর্ব

দেখায়। গায়ে সেমিজ। দেহে মনে কোথাও জরার চিহ্ন নেই,—শুধু কপালে দুএকটা দুশ্চিন্তার কুঞ্চন বাসা বেঁধেছে মাত্র।

এই গেনু মাসির একটা জীবন দর্শন আছে—তিনি কখনো পিছনকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—যখন এগিয়ে চলাই আমাদের জীবনের ধর্ম, তখন পিছনকে মনে করে কষ্ট পাওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। পিছনটা সকলেরই সোনার থাকে, উজ্জ্বল, সুখের, শান্তির থাকে। তাই অতীত দিনের কথা মনে হলে সকলের কষ্ট হবেই হবে।

ললিতা তর্কচ্ছলে বাধা দিয়ে বলেছিল—আপনি যে সামনে চলবেন মাসিমা, পিছনের জীবনই ত' আপনার ভবিষ্যতের গতি নির্দিষ্ট করে দেবে। 'সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি'—এই সত্য কি তবে উড়িয়ে দেবেন ?

গেনু মাসি উত্তর করলেন—ওরে এ ত' সত্য নয়, এ যে ভুল। ও শুধু কবির কাব্য মাত্র। আমার জীবন পথ ভবিষ্যতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন—এর ওপর অতীতের কোন হাতও নেই অধিকারও নেই। কাল যে আমার কি হবে, কোন্ পথে যাবো—আজ হলপ করে আমি তা বলতে পারি না। এতদিন স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করেছি, শেষ জীবনে দেশের তামাম পুরুষ মানুষের আণ্ডারপ্যাণ্ট, রুমাল বানিয়ে খাবো—কেউ ভেবেছিল ? না, স্বামী পুত্রের ঘর করার জন্যেই এই সমিতিতে আসতে হয়েছে। তুই দু পাতা ইংরিজী পড়েছিস্—বি, এ পাশ করেছিস—ফড় ফড় করে এ সব কথা বলতে পারিস। কিন্তু কেতাবী কথা বাদ দিয়ে তোর নিজের জীবনের দিকে তাকা ত' দেখি মুখপুড়ি। কি ছিলি, কি হয়েছিস—আর কি হবি। যা ছিলি বা যা হয়েছিস—তারই অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কি তুই তোর জীবনকে চালিয়ে নিতে পারবি ?

তা না হয় নাইবা পারলুম মাসি, কিন্তু যখন যে অবস্থা আসবে—তার সংগে খাপ খাইয়ে নেবার সাহস আর সামর্থ্য থাকলে ত' আর

ভাবনা থাকে না। পেছনের জীবনের সেই শিক্ষা অর্জন করাই ত' দরকার। ললিতা বললে।

গুছিয়ে তুই বেশ বলতে পারিস ললিতে—সে ত' আমি আগেই সার্টিফিকেট দিয়েছি। কিন্তু তুই যে কোন্ অন্ধকারে পড়বি, তা তোর জানা যদি না থাকে তা হলে মুস্কিল হবে, আর অন্ধকারের হাতে যাতে পড়তে না হয় সে চেষ্টা করলেই বোধহয় ভালো হবে—তাই না?

তুমি কিন্তু আমার কথাই বলছো মাসি—একবার ভেবে দ্যাখো।

গেনুমাসির তবু বক্তৃতা বন্ধ হয় না। এ কথা সে কথা ওঠে। অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান জীবন—সব কিছুই বৃত্তাকারে আলোচনার বস্তু হয়। দেখা যায় যেখান থেকে তিনি সুরু করেন, ঘুরে এসে সেখানেই শেষ করেন।

ললিতার বিস্ময় লাগে না; গেনুমাসির সংগে এ ধরণের তর্ক ত' সে করেই থাকে প্রায়ই; কিন্তু পাখির বিস্ময় জাগে, দু জনের কথা শুনে। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে বাক্যকে কত সুন্দর কত ছন্দোবদ্ধ করে বলতে পারে এরা—এই সমিতির মেয়েরা।

এইভাবে বহুদিনই গেনুমাসির বক্তৃতা আর ললিতাদির তর্ক শুনেছে পাখি। কিছু যে জ্ঞান হয়নি তা নয়। তর্ক করার সহজ পথের একটা ঠিকানা মেলে, যুক্তি জোগাবার কৌশল শেখা যায়—যাতে শ্রোতাকে নিজের পক্ষে টেনে এনে সহানুভূতিশীল করে তোলা যায়।

কামিনী বলে একটি সুন্দর মেয়েও ছিল সমিতিতে। ললিতার সংগে তার ভাব খুব, বেশ সুশ্রী দেখতে, সুন্দর গড়ন; চেহারায় আভিজাত্য যেমন আছে, তেমনি কামিনীর ব্যবহারে একটা প্রসন্নতা আছে। বেশী কথা বলে না, রাতদিন উদাস হয়ে কি যেন ভাবে।

সমিতির ম্যানেজার যেন কামিনীর দিকে একটু বেশী মনোযোগপ্রবণ, কিন্তু কামিনী তা গ্রাহ্য করে না।

কামিনী একদিন পাখিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলো—আচ্ছা ভাই পাখি, তুমি কখনো কাউকে ভালবেসেছ ?

পাখি তৈরী ছিল না এ প্রশ্নের জন্যে। সকলের বিগত জীবনের ছিটেফোঁটা তার শোনা থাকলেও সে নিজের জীবনের কথা কাউকে বলেনি। বলেনি তার কারণ সে এক অবৈধ মৃত পুত্রের জননী। এই অংশটা বাদ দিয়ে, জীবনের এই কলংককে ঢেকে রেখে নটবর সাহার সংগে ঘর ছাড়ার কথা সে বলবে সকলকে—এই মর্মে মন তৈরী করছিল। রাজনীতির ধর্মনীতির সাম্প্রদায়িক দাংগা—এ ত' এক বাস্তব সত্য, সেই বাস্তব দাংগা-রাক্ষসীর কবলে পড়ে তার কি ঘটেছে—তা জানাতে দোষ কি ! পূর্ববাংলা পাকিস্তানে দিয়ে জাতি ধর্ম, ঘর-বাড়ী, টাকা পয়সা, মান-সম্ভ্রম—এমনকি দেশ-গাঁ সব দিয়ে যখন পশ্চিম বংগে চিরদিনের মতো এসে জুটেছে, পিছনের জীবনের সবটাই মুছে দিতে হয়েছে যখন, তখন জানাতে দোষ কি। এই মর্মে সে নিজের আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনার একটা কাহিনী গড়ে তুলছিল মনে মনে, এমন সময় কামিনীর এই প্রশ্ন।

কাকে ভালবেসেছে পাখি ? নটবর সাহা ? পাতলা ফিনফিনে কিশোর নটবরকে ? খেলার সাথী হিসেবে যাকে মনে ধরেছিল, পুরুষ বন্ধুলাভের উদগ্র লোভে যাকে কাছে ডেকেছিল সে—সেই নটবরকে কি সত্যই ভালবাসতে পেরেছিল ? নটবরও কি তাকে ভালবাসতো ? নিরুত্তাপ ঠোঁট দুটিতে ম্লান হাসির একটা রেখা ফুটে উঠলো ! তাহলে নটবর যার-তার কাছে পাখিকে এক রকম বিক্রী করেই নিজেকে নিরাপদ করতে পারতো নাকি ! নটবর সম্পর্কে তার মোহ ছিল, প্রেমের প্রথম অথচ পাৎলা একটা আস্তরণ যেন জড়াচ্ছিল মনে, কিন্তু নটবর নিজেই তা ছিন্ন করে তার কদর্যরূপ উদ্ঘাটন করে পাখির মনে আঘাত হেনেছে।

নটবরের পর তিনজনের করতলগত হতে হয়েছে পাখিকে। প্রথম জন হলো এমন একজন, দয়া দাক্ষিণ্যের যে কোমল বৃত্তিগুলি মানুষের মনকে নরম করে,—তার মনে সেই সুকুমার বৃত্তিগুলি একেবারেই অনুপস্থিত। সে শুধু দুর্জয় পশুত্ব নিয়েই মাতোয়ারা; দ্বিতীয় জন ভীরুচিত্ত, কিন্তু কোমল নয়, মানুষের দুঃখ বেদনায় সংবেদনশীল হতে জানে না, ফাঁকতালে নিজের পাওনাটা কি করে আদায় করা যায়—এই মতলবেই ঘোরে।

তৃতীয় জন আতর আলি। পাখিকে ধরার ব্যাপারে তার কোনো কৃতিত্ব ছিল না। একটা বিশেষ অঞ্চলে হিঁদুর মেয়ে দেখে সেই দ্বিতীয় জনকে জেরা করে আতর আলি; দ্বিতীয় জন ভয়েই একরকম পাখিকে আতরের হাতে ছেড়ে দিয়ে গা ঢাকা দেয়। আতর পাখিকে তার দেশ গাঁ খবর জিজ্ঞাসা করে,—বাড়ীতে কেউ নেই জেনে—আর এখন ত' ফিরে যাওয়াও চলে না জেনে আতরই পাখিকে নিকে করার প্রস্তাব করে। সে ছিল নম্রস্বভাবের, তবে মাঝে মাঝে যে রেগে ওঠেনি, তা নয়। কিন্তু সে কখনো পাখির সংগে কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করে নি। ধীরে ধীরে মিষ্টি ব্যবহারে ভদ্র বাক্যে পাখির মনকে জয় করে নিয়েই তার সংগে ঘর করছে। আজো এক আধবার মাসের মধ্যে এক আধ দিন বিষণ্ণ উদাস সন্ধ্যায় আতরের শান্ত মুখখানা ভেসে ওঠে, বিশেষ করে পুলিশ যেদিন পাখিকে উদ্ধার করে আনে আতরের আড্ডা থেকে, তখন আতরের ছল ছল করা কাতর চোখ দুটি যেন আজও মনে পড়ে যায় পাখির। এই আতর আলিকেই অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছিল নাকি সে—একটা বছর কি মাস চোদ্দ তার সংগে ছিল—ওই সময়টুকুর মধ্যেই? আতরকেও থানায় ধরে আনা হলো, তার যে কি হলো তা পাখি জানে না, কিন্তু তার বেদনাহত ব্যাকুল চোখ দুটির করুণা সে ভুলতে পারেনি আজো।

কামিনী আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি চুপ করে রইলে? প্রশ্নের জবাব দিতে খুব বিব্রত লাগছে?

পাখি কামিনীর চোখের দিকে দু'চোখ তুলে একটুখানি করুণভাবে হাসলো।

কামিনী বললে—বুঝলাম, তুমিও মরেছ। ওই আগুনে যখন পুড়েছো ভাই, তখন আর অন্য গতি নেই।

সেদিন কামিনীর কাছেই প্রথম পাখি জীবনের খানিকটা অংশ ব্যক্ত করলো। শুধু মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুলিশ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছে—এইটুকু বানিয়ে বললে। আর বললে যে নটবর তার মর্ম সহচর। ললিতাকেও সে এর বেশী কিছু বলেনি।

তোমার কথা কিছু বললে না ভাই—পাখি অনুযোগ জানালে।

কামিনী বললো—তোমাকেই সব বলবো। আমি, তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো এক জায়গায়। সব জানতে পারবে। কিন্তু আজ এখানে নয়। কে কোথা থেকে শুনছে, সেটা ঠিক হবে না।

যত মিশছে সকলের সংগে, পাখির যেন কেমন ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। ললিতাকে চেষ্টা করলে বোঝা যায়, কিন্তু সেজেগুজে কোর্টে সাক্ষী দিতে গেল কেন—কার সংগে কি দরকারেই বা সিনেমা ঘুরে এল—তা কিছুই বোঝা যায় না। গেনুমাসির বক্তৃতার মানে বেশ স্পষ্ট, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ঘর বাড়ী ছেড়ে—স্বামী-পুত্রের উপার্জন ভোগ না করে কেন এই মহিলা সমিতিতে পড়ে আছেন? কামিনী গম্ভীর প্রকৃতির, স্বভাবে রুক্ষতা নেই বটে, কেমন যেন একটা স্তব্ধতা আছে। সেই কামিনী আজ পাখির কাছে তার গোপন বেদনার উৎসখানি খুলতে উৎসুক। সব ঘটনা বা ব্যাপারেই যেন বিরাট একটা কেন এসে পাখির মনকে জড়িয়ে ধরলে। এদের যদি চিনতে জানতে না পারে, এদের জীবন থেকে যদি না শেখে সে—তবে কি করে পাখি তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ ঠিক করবে? এই নারী কল্যাণ সমিতির দেওয়া দুবেলা দুমুঠো ভাত খেয়ে আর তার বদলে এদের কিছু কাজ করে দিয়েই সে তার জীবনকে নষ্ট করে দেবে? সে কি বউ হয়ে,

মা হয়ে জীবনকে কাটাতে পারবে না—সুন্দর সহজস্বাদ সুখের জীবন না হোক—আতর আলির মতো নরম মন কোনো মানুষের স্নেহপ্রীতির আশ্রয়ের ছায়ায়ও সে কি গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না ?

ললিতা ভাগ্য মানে না, তাই সে বলে যে সে সুখেই আছে। বুঝলি পাখি, ভাগ্য মানার বহু জ্বালা। তুই যে স্বাধীন ভারতের প্রথম বলি, এজন্যে তুই নিজের ভাগ্যকে দুষবি, আর কষ্ট পাবি, কিন্তু আমি বলবো তোর নটবর তোকে ডুবিয়েছে, যদি সাজা কারো হওয়া দরকার, তবে সেই লোকটির হোক।

পাখি চুপ করে থাকে।

নটবরের কথা, আতর আলির কথা—এমন কি অনেক কষ্ট করেও সে মনে করতে পারে না,—তার মরা ছেলের কথা ; কিছুই জানে না ললিতা, যদি সে কিছু এই প্রসংগে বলতে যায়—হয়তো ফস করে বেরিয়ে যাবে কোনো কথা বেফাঁস হয়ে। তার চেয়ে সে চুপ করে থাকাই ভালো মনে করে।

পাখি বললে—ললিতাদি, তুমি যে বললে একদিন আমাকে বলবে, কেন তুমি সেদিন কোর্টে গিয়েছিলে, কিসের সাক্ষী হয়ে—কিন্তু আজো ত' কিছু বললে না। কি মামলা চলছে ?

নিতান্তই শুনবি তুই—পাখি, শোন। বলে ললিতা পাখির বিছানায় এসে উঠলো। ঘরে আর কেউ নেই, মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে, রোদের তেজ কমে এসেছে। আকাশে কাক চিলের দল দ্বিতীয় দফা বিহারে বেরিয়েছে। হাওয়ায় ধূলো কম, এলোমেলো ভাবটাও আজ একটু কম।

ললিতা বললে—দরজাটায় খিল দিয়ে আয় আগে। তারপর সব বলছি।

পাখি উঠে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে এল।

ললিতা বলতে সুরু করলে—কোর্টে আমি সাক্ষী দিতে যাই নি। তোর কাছে মিথ্যে বলেছি পাখি। আমি আমার বিয়ের রেজিষ্ট্রী করে এলাম।

পাখি বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বিয়ের আবার রেজিষ্ট্রী কি ললিতাদি। তোমার বিয়ে—মানে?

রেজিষ্ট্রী ম্যারেজের কারণ আর ইতিহাস বলে ললিতা আবার স্থরু করলে—বহু ধরণের মানুষের কাছে ঠকতে ঠকতে পাখি, এইটুকু শিখেছি যে জীবনে যদি কোথাও স্থিতি না থাকে,—তবে ঠকার কখনো শেষ হয়'না। কোথায় চলবি তুই—একটা লক্ষ্যপথ যদি না থাকে? 'যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো' শুধু কথার কথা, তবু কোন্ দিকে দুচোখে প্রথম যাবে—তা মনে মনে ভেবে রাখতে হবে। অভিভাবকহীন মেয়ে আমাদের এই সমাজে শুধু খেলার সামগ্রী। আমার নিজের জীবন দিয়ে এইটুকুই শুধু বুঝেছি। বি, এ, পর্যন্ত পড়েছি, একটা স্কুলে পড়ানোর কাজ জুটিয়ে নিলে চলতে পারি, কিন্তু তবু একা আর পথ হাঁটতে চাইনা। এই সমিতির ম্যানেজার আমাদের অশ্বিনীবাবু যদিও বিবাহিত বলে পরিচয় দেন, তবু আমার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে আমাকে তাঁর গৃহিণী হবার জন্যে অনুরোধ জানান। আমি হাসতে থাকি, তবে সহজ সরল ভাবে মিশতে থাকি, কিন্তু লোকটি যেমন বজ্জাত তেমনই কাপুরুষ। ওর বউ ছেলে পাকিস্তানে রয়েছে বলে যে প্রচার করেন—আমার মনে হয় সেটা ধাপ্পা। উনি মেয়েদের সংগে ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে চান, বিয়ে করে ঘর করতে চান না। তাছাড়া আমার মনে হয় কোন বদ দলের সংগে ওঁর যোগাযোগ আছে, সেখানে মধ্যে মধ্যে কাউকে কাউকে পাঠিয়ে দেবার দালালিও হয়তো করে। তোকে এসব কথা বলতাম না,—তোর ওপর ওর একটু নজর পড়েছে, তাই তোকে সাবধান করে দেবার জন্যেই বলছি। এই অশ্বিনী-বাবুকে ধরে-করেই আমি বেরিয়েছি পথে ঘাটে, বেড়িয়েছি কত জায়গায়। ওঁরই সাহায্যে বি-এ পাশ করেছি। আমি ওঁকেই স্বামীত্বে বরণ করতে চাইলাম, কিন্তু উনি বললেন—যে ঠিক ওঁর প্রয়োজনে উনি আমাকে স্নেহ করেন না, কোন্ এক কুমার বাহাদুর নাকি আমার জন্যে প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন। সেদিন ওঁর গালে একটা চড় মেরে বের

হই। থিয়েটারে কাজ করার সময় অনিলবরণ সেনের সংগে আমার আলাপ ছিল,—অনিলবরণ থিয়েটারে প্রম্‌ট্‌ করতো, টিকিট বেচতো। শুধু আলাপ বলছি কেন, বেশ গভীর আলাপই ছিল। হঠাৎ তার সংগে পথে দেখা, দু-চার কথা হলো না। দু-চার কথার মধ্যে জীবনের গতি ও স্থিতি সম্পর্কে কথা উঠল। গেলাম দুজনে রেজিষ্ট্রী অফিসে। অনিলের বন্ধু ক'জন সংগে ছিল সাক্ষীর অভাব হলো'। সই করলাম।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গল্প গিলছিল পাখি। অশ্বিনীবাবুর সংগে ললিতার একটু মেলামেশা আছে, ঘোরাঘুরি করে—সবাই তা জানতো। কিন্তু ভেতরে ভেতরে এতদূর ঘটে গেছে, তা কেই বা জানে! পাখি জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে তুমি ত' চললে?

ললিতা জবাব দিলে—চলে যেতাম এতদিনে, কিন্তু অনিল বম্বে গেছে, কণ্ট্রাক্ট সার্ভিস কিনা, ছমাস পরেই সে কোলকাতা ফিরবে, তখন চলে যাবো। এই ছটা মাস আছি তোদের মধ্যে। এই ছমাস তোর কোন ভয় নেই, অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে তোকে আমি পাহারা দিয়ে রাখবো। এর মধ্যে একটা দেখে শুনে বর পছন্দ করে নে, বলিস তো ঘটকালি করি তোর হয়ে।

'ধ্যেৎ' বলে ইয়ারকি করার বা লজ্জা প্রকাশের সম্বিৎও যেন পাখির লোপ পেয়েছে। বাইরে থেকে কোন মানুষকেই চেনা যায় না, তার সব কথা শুনেও না। সে কি কাজ করে—তাই দেখেই যেন মানুষের যথার্থ বিচার। অনেক কষ্টে পাখি ললিতাকে একটি অনুরোধ করলে—তার চেয়ে ললিতাদি, তুমি যে ক'দিন আছো এখানে আমাকে সকাল বিকেল পড়িয়ে দাও, সহরের উপযুক্ত করে একটুখানি মানুষ করে তোলো।

যতদিন আছি এখানে সে না হয় করলাম। কিন্তু তুই ম্যানেজার-বাবুর থেকে খুব সাবধানে চলাফেরা করিস। আমাকে ও শীকার হিসেবে ধরেছিল, কিন্তু আমি ত' ফস্কে গেলাম। এখন রইলি তুই আর কামিনী। তবে কামিনীর ওপর কিছু করতে সাহস করবে না, কেননা

উনি জানেন যে কামিনি রিটায়ার্ড জজের একমাত্র মেয়ে, বিরাট বড় লোক। এখানের অন্য সকলেই ম্যানেজারের ওপর চটা। সুতরাং বাকী রইলি তুই। তোর কথা আমাকে উনি বলেওছেন দু'একবার। একটু সাবধানে থাকিস।

সহর জীবনের জটিলতার পরিচয় পাখি যেন এখন থেকে একটু একটু উপলব্ধি করতে লাগলো। এ সব ললিতা বলে কি!

কামিনী কিন্তু এই রকম করে কথা বলে না। জীবন যে জটিল, প্রাণ ধারণের ব্যাপার যে গোলমেলে—কামিনীর সঙ্গে কথা বলে তা বোঝা যায় না। জীবনের একটা বৃত্তি প্রেম—সে শুধু এই বৃত্তিটাকেই বড় করে দেখেছে, একান্ত করে দেখেছে। যে যত বড় প্রেমিক, সে জীবনের সমস্ত সমস্যার তত সহজ সমাধান করতে পারে। কামিনীর মত তাই, পাখিকে সে বার বার বলছে—এই দেখনা ভাই, আমি কি কিছু অসুখী আছি? বাবা তাড়িয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন, গোঁড়া হিন্দু তিনি—ব্রাহ্মধর্ম্মের একটা বেজাত ছেলেকে আমি ভালবেসেছি—এই অপরাধে এই আশ্রমে জোর করে ধরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অন্যত্র বিয়ের মত হলে আমাকে খালাস করে নিয়ে যাবেন, একটু জব্দ করতে তিনি চান। আর ছেলেটির বাবাকে বলে ছেলেটিকে —আমার দয়িত যে—তাকে বিলেতে পাঠান হয়েছে। সে অবশ্য বিলেত যেতই তবে আমাকে নিয়ে। সেখানে ডাক্তারীর উচ্চ ডিগ্রী আনতে গেছে, ফিরে আসুক, সে ফিরে এসে আমাকে এই কারাগার থেকে মুক্ত করবে। এই যে আটকা আছি, কোন দুঃখ নেই, আমি আছি আমার ভালবাসা নিয়ে।

পাখি শুধু শুনে যায়, কোন কথা বলে না। কামিনী তবু ধ্যান করতে পারে তার প্রিয়জনকে, ললিতা ত' প্রায় সংসার পেতেই বসেছে স্বামী নিয়ে। পাখি যেন বড় ফাঁকা বোধ করে। কোলকাতার সহরে এত লোকজন, নিঃশ্বাস ফেলতে হাঁফ ধরে যায় যেন, তবুও পাখি

কতখানি নিঃসংগ। সুখ দুঃখে বন্ধুর মতো ললিতা ছিল তাকে ঘিরে, সেও চলে যাচ্ছে স্বামীর ঘর করতে।

স্বামী পুত্রের মধ্যেই নাকি মেয়েদের সার্থকতা! পাণ্ডুর এক ঝিলিক হাসি পাখির ঠোঁটে এসে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। স্বামী পুত্র ছাড়া কি মেয়েদের জীবনের কোন দাম নাই? যাদের জীবনে স্বামী পুত্র একটা বাহারের মত, ফুলের শ্যামল শ্রীর মতো—তারাই মানুষ? তারা ছাড়া কি যথার্থ মানুষ আর কেউ না?

পাখি যেন আর বন্ধ নারীকল্যাণ সমিতির জালের মধ্যে আটকে থাকতে চায় না। সে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু কোথায় সে যাবে? গেনুমাসি বলেছেন কতবার—দেখ পাখি, হরিণ হলো নিজেই নিজের শত্রু। তার মাংস সুস্বাদু বলেই না তাকে বাঘ সিংহ তাড়া করে। তেমনি মেয়েদের এই বয়সই মেয়েদের শত্রু। তুই যে বলিস সমিতি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বি একদিন পথে, কিন্তু তোর এই সোমত্ত বয়েসের কথা কি ভেবে দেখেছিস।

আজকেও পাখির আবার সে কথাটা মনে হলো। সত্যিই নিজের বয়স আর স্বাস্থ্যের কথা মনে হতে একটু সচকিত হলো, পুরুষের হাতের খেলনা হয়ে পড়বে নাকি সে অসহায়ভাবে বেরিয়ে পড়লে? আর তা ছাড়া এই পাষাণপুরী থেকে বের হবেই বা কি করে?

॥ তিন ॥

নারীকল্যাণ সমিতির ছুটি ছিল সপ্তাহে একদিন—ইচ্ছা মত বের হওয়া যেত। এখন সে জায়গায় রোজই ঘণ্টা দুইয়েকের ছুটি পাওয়া যায়—নিজের নিজের জিনিষপত্র কেনার জন্যেও বটে, একটু আধটু বেড়াবার জন্যেও ; এমনকি অত্মীয়ের সংগে দেখা সাক্ষাতের জন্যেও।

গেনু মাসি ছাড়া বাইরে বের হবার এই সুযোগ সবাই গ্রহণ করেও থাকে। কামিনী, যে কামিনী কখনো এই সমিতির বাইরে যেত না, সেও আজকাল বের হতে সুরু করেছে। তবে সে যায় বেশীর ভাগ পোষ্ট অফিসে, এয়ার মেলে চিঠি দেবার ডাক টিকিট আর কাগজ কিনতে—এই রকমই শোনা যায়।

পাখিও যে না বেড়ায়—এমন নয়, তবে বেশীর ভাগ সময় সে এখন লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হাতের কাজ করে' সমিতিতে দেয়—খাওয়া থাকার জন্য যখন কোন রকম পয়সা লাগে না, তখন অবকাশ সময়ে লেখাপড়ার দিকে মন দিলে ক্ষতি কি—ভেবেই সে ললিতার নির্দেশে বইপত্তরে মন দিয়েছে। কিছু টাকা ললিতা ধারও দিয়েছিল—বাড়তি টাকা ললিতার হাতে কিছু আছে,—কি করে আছে বা থাকতে পারে, সে খোঁজ পাখির কোনদিন জানতে ইচ্ছে হয়নি। লালিতাকে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর যে সে পাবে কে জানে। মানুষ সম্পর্কে পাখির ধারণা, বিশ্বাস,—সব কিছুই কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বেশী হয়নি। গোটা নয়েক হবে। হঠাৎ নীচে কার চাপা কান্নায় পাখি চমকে উঠলো। মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়, হিন্দুশাস্ত্র বা হিন্দুধর্ম মতে বিয়ে থা দিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময় চিরদিনের জন্যে এই আশ্রম ছেড়ে যাওয়ায় বেদনায় দু একটা

মেয়ের চোখে জল যে না দেখা দেয় এমন নয়, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে এমন করুণ অসহায় আর্তস্বর ত' আর কখনো পাখি শোনেনি।

ললিতার ঘরে গিয়ে দেখলো—ললিতা তখনো ফেরেনি। আজকাল রাত দশটার আগে তাকে বড় একটা ফিরতে দেখা যায় না পাখি একাই ওই করুণ স্বর লক্ষ্য করে নীচে নেমে এল। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ওই ঘরে মীনাক্ষী আর খুকু বলে দুটি মেয়ে থাকতো। যতদূর মনে হলো খুকুই যেন কাঁদছে। আর খুব নীচু অথচ কঠোর গলায় একজন পুরুষ কথা বলছে—বোধ হয় সান্ত্বনা দিচ্ছে।

দরজায় কান পেতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা কিছু বোধগম্য হলো পাখির। বহুবার বহুকথার মধ্যে দিয়ে খুকু যা বলছে তা হলো—কেন তুমি আমাকে বিক্রী করে দিলে। আমি ত' তা চাইনা। বিয়ে করে ঘর সংসার করতে চেয়েছিলাম,—সুষ্ঠুভাবে মানুষের মতোই বাঁচতে চাই, ঘরের বউ হয়ে স্বামীপুত্রের ঘর করে—কিন্তু এ তুমি কি করলে? টাকা, টাকা—কি হবে টাকা নিয়ে! যে শাঁসালো খদ্দের, তোমরা তার শাঁস নাও—আমি যাবোনা তার সংগে; না একদিনের জন্যেও না বরং গলায় দড়ি দেব তবুও না। আর যদি মরতেই হয় আমাকে, সব কথাই জানিয়ে যাবো পুলিশকে, কেন এখানে নীলা আত্মহত্যে করেছে, তুমি কি করো মেয়েদের সংগে কি ভাবে টাকা উপায় করো—সব ফাঁস করে দেব।

দরজা খোলার আওয়াজ পেতেই পাখি জোর পায়ে ওপরে উঠে গেল। পুরুষ মানুষটি বার দুই কে কে বলে চীৎকার করে উঠলো—কিন্তু তার পেছনে পেছনে আসবার চেষ্টা করলো না।

পরদিন সকালে ললিতার ডাক পড়লো অশ্বিনীবাবুর ঘরে। কোনো ভূমিকা না করেই বললেন—তুমি কি খুকুকেও মন্ত্রে দীক্ষিত করেছ নাকি? সে যে আপত্তি করেছে বিয়ে করতে?

খুকুকে? আমি বারণ করতে যাবো কেন? সবই ত' দেখছে, বয়স হয়েছে, বুঝছে ব্যাপার-স্যাপার। তোমাকে এতদিনে চিনতে পেরেছে

ললিতা—

মারবে নাকি ? জান এখন আমি আর তোমার এক্তেয়ারির মধ্যে নেই। মিঃ সেনের বিয়ে করা বউ! ললিতা একটু হাসলো, ব্যংগের হাসি।

কারুর ঘরের বউ এই সমিতিতে থেকে এখানকার শৃংখলা নষ্ট করে দিক—এ আমি চাই না। তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।—অশ্বিনী বাবু গম্ভীর ভাবে আদেশ দানের ভংগীতে বললেন।

যাবো ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রকাশ করে দিয়ে যাবো অশ্বিনীদা। তুমি ভালো মানুষের খোলস পরে এক এক করে নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করবে, তা হবে না। তুমি যা অপরাধ করেছে —তাতেই তোমার স্থান জেলে হওয়া উচিত ছিল।

বাধা দিয়ে অশ্বিনীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—ললিতা, সাবধান। ফের তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আগুন নিয়ে খেলা করো না। কাল রাত্রে খুকুর ঘরে আড়ি পাতিতে গিয়েছিলে কেন ? আমি যে ভাবেই ওকে বোঝাই না কেন—তোমার এতে বিদ্বেষের কারণ কি !

হঠাৎ খনিকটা নরম হয়ে অশ্বিনীবাবু বলতে লাগলেন, একদিন তোমাকে ভাল লাগতো, ভালবেসেছি, কিন্তু বিয়ে তোমাকে করবো—এ কথা আমি তোমাকে কোনদিন বলিনি। তুমি বার বার পীড়াপীড়ি করেছো, আমি এড়িয়ে গেছি। শেষে আমি চেয়েছিলাম তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেব—যাতে তোমার সুখ সুবিধে হয়—

বাধা দিয়ে ললিতা বলে উঠলো—যাক ঢের হয়েছে।

অশ্বিনীবাবু খপ করে ললিতার দুটি হাত ধরে ফেললেন,—কাতর ভাবে অনুনয়ের ঢঙে বললেন—ললিতা, একদিন তুমিও আমাকে ভালবাসতে, আর আমিও তোমাকে ভালবাসতুম। সেই স্মৃতিটুকু মনে করেই আমাকে ক্ষমা করে যাও। আমি ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। তাই একজনের কাছে তোমাকে—মানে—

অশ্বিনীদা, তোমাকে ক্ষমা করতেও ঘেন্না লাগে। তোমার আত্মান্ত

কথাগুলি ভাবতেও আমার করুণা হয়! তোমার ওপর প্রতিশোধ কি নেব—তোমার প্রতি দয়া করাই যথেষ্ট।

অশ্বিনীবাবু ললিতার হাত দুটি ছেড়ে দিয়ে বললেন—যখন যা তোমার দরকার হবে, যে রকম সাহায্য তুমি চাইবে এস আমার কাছে—বড় ভাইয়ের মতো আমি, তোমাকে কখনো বঞ্চিত করবো না। বৃহত্তর জীবনের ছায়ার আড়ালে যাতে যেতে পারো সেজন্য কথা দিয়ে রাখলাম। এরমধ্যে পাখি এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে, তা এরা লক্ষ্য করেনি। পাখি হঠাৎ কোনো ভূমিকা না করেই ঘোষণা করে বসলো—ম্যানেজার বাবু, আমি এই সমিতি থেকে চলে যেতে চাই।

বিস্ময়কর সংবাদ! শুধু বিস্ময়কর নয়, যেমন আচমকা, তেমনই অসম্ভবও বটে।

ললিতা ও অশ্বিনীবাবু—উভয়েরই সম্বিত যেন ফিরে এলো। রাগে ঘৃণায় ললিতার সমস্ত শরীর জ্বলছিল তেমনি করুণা আর মমতায় অশ্বিনীর প্রতি মায়াও হচ্ছিল বোধ হয়।

অশ্বিনীবাবু খুব লজ্জিত হয়ে উঠলেন।

ললিতা আশ্চর্য বিস্ময়ের সংগে জিজ্ঞাসা করলে—তুই এই আশ্রম ছেড়ে দিচ্ছিস পাখি? সে কি রে?

পাখি জবাব দিলে—হ্যাঁ। কাল রাত্রে খুকু কাঁদছিল, পা টিপে টিপে নীচে নামি, ওর ঘরেব সামনে দাঁড়িয়ে ওর আর এই ম্যানেজাব বাবুর সব কথা শুনি।

অশ্বিনীবাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝেছেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন—কিন্তু পাখি, তুমি ত' জানো না যে এখান থেকে উপযুক্ত কারণ না দেখিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া তুমি পুলিশের হাত দিয়ে এসেছো; তারা তেমোকে বিশ্রী হামলা থেকে উদ্ধার করে এনে এখানে রেখে গেছে তোমার মরা ছেলে হবার পর,—পুলিশের অনুমতি ছাড়া ত' তোমার ছুটী নেই।

ললিতা বিস্মিতভাবে তাকাল একবার পাখির দিকে। পাখিও মরমে

মরে গেল যেন। বামালশুদ্ধ ধরা পড়লে নতুন চোরের যে দশা হয়—পাখির যেন কতকটা সেই অবস্থা! পাখি বললে—পুলিশের গোপনীয় রিপোর্টের সব অংশটাত' এখনো বলা হলোনা ম্যানেজারবাবু, বাকীটাও বলে ফেলুন—যে এখানে থেকে ম্যানেজারের বদখেয়ালে চলতে হবে, তাতে বাধা দিতে পারবে না। আপনি কি ভেবেছেন বলুন ত'?

পাখির এই রূপ আর কখনো দেখা যায় নি। এই রকম উগ্র হিংস্র ফণিনীর মতো ভীষণ মূর্তি!

আমরা অসহায় হতে পারি, পতিত হতে পারি—কিন্তু সেইটাই ত' সব নয় ম্যানেজারবাবু। আমারা বাঁচতে চাই, জীবন সুরু করতে চাই, ঘর সংসার চাই, স্বামীপুত্র চাই, প্রেম ভালবাসা চাই। একবার পড়ে গেছি বলে যে আর উঠতে পারবো না—মানুষের শাস্ত্রে এমন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত নয়। যদি থাকে—তবে সেই নিয়মকেই ভেঙে দিতে চাই।

ললিতা বললে—পাখি তুই বড় উত্তেজিত হয়েছিস! মুখপুড়ি, তুই বুঝেছিস না—গার্জেনহীন মেয়েদের জীবন কি!

পাখি বলতে লাগলো—বুঝেছি ললিতাদি, সব বুঝেছি।

তোমাকে নিয়ে লোকটি খেলেছে, খুকুকে জ্বালিয়েছে, আত্মহত্যার কারণ হয়ে রয়েছে। সব জানি, সব বুঝতে পারি। কিন্তু এ কি রকম ব্যবস্থা জানতে পারি না—যে নীচে যারা পড়ে গেছে—তাদের আর ওঠাবার চেষ্টা না করে পঙ্কিল পথে চালান করা হবে। আর তা হবে ঐ ম্যানেজারের হাত দিয়ে। আমি ঠিক করেছি—আমাকে ছুটি না দিলে আমি এমন চীৎকার করবো—যে রাস্তায় লোক জড়ো হলে তখন ম্যানেজারের গুণকীর্তন করবো।

অশ্বিনীবাবু দমলেন কিনা বোঝা গেল না, শুধু বললেন—পাখি এখন তুমি ওপরে যাও। ললিতা ওকে একটু ঠাণ্ডা করো।

ললিতা পাখিকে টেনে নিয়ে গেল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় দেখলো—সমিতির আরো অনেক মেয়েই আড়ি পেতে ঘটনাটি শুনেছে।

ললিতা বললে—তুই ঘুণাক্ষরে আমায় বলিস নি যে তুই ছেলের মা হয়েছিলি।

পাখি কেঁদে ফেললো। কান্নায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবার মতো কণ্ঠস্বরে সে বললে—সে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কলংক বোন; আর সেই যে আমার দুর্বলতার জায়গা ললিতা। তাই গোপন করে গেছিলুম। চেয়েছিলাম ভুলে যেতে, চেয়েছিলাম জগতের সকলের কাছ থেকে এই পাপকে লুকিয়ে রাখতে, কারণ ওতে ত' আমার কোন দোষ ছিলনা, ললিতা! যদি পুলিশ আমায় ফিরিয়ে না আনতো, তাতেও আমার কোন দুঃখ ছিলনা, আতর আলির বিবি হয়েই না হয় থাকতাম বেঁচে। জীবনে সেও ত একটা অবলম্বন।

এর জবাবে ললিতা আর কি বলবে! অশ্বনীবাবুকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। পেটে পেটে তার শয়তানি। এই সব অসহায় মেয়েদের দুর্বলতম জায়গাটায় আঘাত করে খুব আস্তে, ভারী মিষ্টি কথা বলে, আর যেহেতু তার চেহারা সুন্দর আর যেহেতু সেই এই আশ্রমের কর্তাব্যক্তি-দের একজন, এই সুযোগে সে তাদের সর্বনাশ করতে দ্বিধা করে না। ললিতা এই মানুষ সম্পর্কে পাখিকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল; বার বার সে পাখিকে বুঝিয়েছিল অশ্বিনীবাবু লোক সুবিধে নয়, দূরে দূরে যেন সে থাকে; কখনও ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না যায়। এবং সুবিধা পেলে এই মানুষটির মুখোশ খুলতে হবে। ললিতা বললে—তুই ওকে আঘাত করলি কেন?

আমি ম্যানেজার বাবুকে আবার আঘাত করলাম কখন?

ওই যে—তুই বললি না যে অন্য উপায়ে না পারলে চীৎকার করে লোক জড়ো করবি আর ম্যানেজার বাবুকে অপদস্থ করবি, তাতেই ও এই রকম করে প্রতিহিংসা নিলে। এবার থেকে তোকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। অবশ্য ওরও দিন ঘনিয়ে এসেছে।

পাখি কৃতসংকল্প হয়েই যেন জোরের সংগে বললে—আমি এই আশ্রম ছাড়বই ললিতা। তুই দেখিস, যে কোনো উপায়ে হোক।

॥ চার ॥

তেজ ভালো পাখি, কিন্তু মাত্রায় বেশী হলে তা আদৌ ভালো ঠেকে না।—গেনু মাসি পাখিকে পড়াতে বসলেন—লংকা হত হয়েছে অতি দর্পে, বলির মতো দানী মানী রাজারও দুর্দশার কথাটা একবার মনে কর—তাই বলি পাখি, যতটা রয়—ততটা সয়। সমিতির মেয়ে তুই, পরের দয়ার ওপর তোর নির্ভর। তোর মুখে যে সব রকম কথা মানায় না—মা।

জ্ঞানেন্দ্র মোহিনীর কথার মধ্যে করুণা আর আবেগের মিশ্রণ ঘটে, পাখি বিহ্বল হয়ে শোনে, হয়তো সান্ত্বনা পায়, হয়তো গেনু মাসিকে একান্ত আপন জন মনে হয়। কিন্তু অশ্বিনীবাবু সম্পর্কে গেনু মাসিরই বা কেন এ রকম দুর্বলতা ?

তিনি বলেন—বুঝলি পাখি, যতক্ষণ না মানুষ আত্মনির্ভর হচ্ছে, নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ এই সমাজে তার কোন দাম নেই। তাঁত বোনা দেখেছিস ? মাকু চিনিস ?—আচম্বিতে থেমে গিয়ে গেনুমাসি প্রশ্ন করলেন।

মাকু ? জানি মাসিমা।

তবে ? বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনের সংগে তোর বিলক্ষণ পরিচয় থাকার কথা। আমরা যে মাকু রে, তাঁতের মাকুর মতই। এদিক থেকে ঠোক্কর খাই যখন, ওদিকে ছুটী, ওদিকে ঠোক্কর খেলে আবার এদিকে পা বাড়াই।

পাখির অবশ্য ভালো লাগে না এই সব উপদেশ প্রয়োগ। গেনু মাসিকে কখনো ভালো লাগে—কখনো ভয় হয়। সমুদ্রের মতো যেন যেখানে তার তীরের সংগে মেলামেশা, সেখানে সে চিত্ত-চমৎকার ;

আছড়ে পড়ছে, জল কল্লোলের একটা স্বচ্ছন্দ সুর সৃষ্টি করে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু যেখানে অনন্ত অসীম রূপ, অতলান্ত গভীরতা—সেখানকার নিবিড়তা অমেয়, কোনো ধারণা করা যায় না, শুধু ভয় করে। গেনু-মাসির উপদেশ বোঝা যায়, উপমা প্রয়োগও মন্দ লাগে না, কিন্তু যখন একান্ত আপন জনের মত গায়ে পড়ে কল্যাণ করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে—পাখির কেমন সন্দেহ হয়।

কিন্তু কেন যে সংশয় পাখি তা বুঝতে পারে না। মানুষকে ভাল-বাসতে সে এক কথায় না পারুক, কিন্তু কাউকে অবিশ্বাস করার মত মূঢ়তা ত তার কখনো ছিলনা। এই সমিতি থেকে তার মনে এক দুর্বলতা এসে বাসা বাঁধলো! সব সময় ভয়—সব ব্যাপারেই একটা সন্দেহ—এ উৎপাত ত' তার ছিল না। বিশেষ করে মানুষ সম্পর্কে এমন মনোভাব সে মনে পোষণ করতে আরম্ভ করেছে? পাখি ভেবে পায় না।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা কর পাখি। নিজের রোজগারে যদি না চলিস ত' শেষ জীবনে তোর খোয়ারের শেষ থাকবে না। তুই জানিস না—পুরুষ মানুষ কি রকম হারামজাদা। গেনু মাসি থেমে থেমে বলেন।

আমি এসব কিছু জানতাম মাসি—এখন বিশেষ করে এই সমিতিতে এসে কিছু কিছু বুঝছি। পাখি বললে।

আরো বুঝবি মা, আরো বুঝবি। চোখ যখন ফুটবে, দেখবি পুরুষদের কি কদর্য রূপ। মেয়েদের নিয়ে কাব্যি করে, ছবি আঁকে, সুন্দর সুন্দর কথা বলে, প্রেম নিবেদন করে—কিন্তু স্বার্থ ছাড়া এক পাও এগোয় না। নইলে আমাকে এই বুড়ো বয়সে ঘর সংসার ছেড়ে দুটো পয়সার ধান্ধায় বের হতে হয়েছে।

পয়সার ধান্ধায়? কি বলছো তুমি মাসি? পাখি আশ্চর্য হয়ে যায়।

পয়সার ধান্ধা মানে—কথার কথা আর কি! পেটের জ্বালায় চলে

আসতে হয়েছে বোন। নইলে খাব কি! আমার কি সমিতিতে এসে থাকার কথা—না, দেখায় ভাল! সবই ভাগ্য পাখি—নইলে স্বামী পুত্তুর ছেড়ে এই নরক কুণ্ডে বাসা বাঁধতে কে চায় বল। আক্ষেপের সুরে বেদনায় ভেঙে পড়ার মত অসহায় ভাবে গেনুমাসি কথা কটি বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পাখি আহত হলো। কাউকে আঘাত করতে সে চায়নি, তবু তার কথায় কেউ দুঃখ পাক—এ ইচ্ছা তার নেই। কিছুটা লজ্জিত কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পাখি বললে—আমি এমনি জিজ্ঞাসা করছি মাসি, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

সামলে নিয়ে গেনুমাসি বলেন—তা জানি পাখি। তবু মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকাই—আর ভাবি, যদি হাতের কাজটুকু না জানতুম—কি দুর্দশা হতো বলতো!

•

পাখির সংগে গেনুমাসির আলাপ জমে যায়। বর্ষিয়সী মহিলা বলে ওপরের তলায় ভালো একটি ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল গেনুমাসিকে। তিনি ঘরটি বদলে নীচে আলো বাতাসহীন বদ্ধ একটা ঘরে বদলি হয়ে এলেন,—বললেন—আমার আবার স্বাস্থ্য, তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকতে চললো, আমি নীচেই থাকি, আমার জায়গায় বরং এই সব কচি মেয়েদের যে কোনো দু একজনকে বদলি করে দাও—ওদের শরীরের দাম আছে।

শুধু ঘরের ব্যাপারে কেন, সমিতির দৈনন্দিন জীবন-চর্যার যে কোনো খুঁটিনাটিতেই গেনুমাসির বদান্য ব্যবহার, দাক্ষিণ্যসুলভ ঔদার্য পাখিকেও মুগ্ধ করেছিল।

একদিন গেনুমাসি পাখিকে উপদেশ দিলেন—আচ্ছা পাখি, শুধু এই সমিতিতে বসে বসে কেন দিন গুজরোচ্চ—পড়াশুনো করে একটা

ছুটো পাশ দাও না—নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো, পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখো।

আমি ত' পড়ি মাসিমা—ললিতাদির কাছে বই পত্তর চেয়ে নিয়ে ওর সাহায্য আরম্ভ করেছি লেখাপড়া।

ও—তাই নাকি! বেশ, বেশ। কিন্তু ললিতা-সখির ত' পাট উঠলো এখেন থেকে। উনি নাগর জুটিয়ে নিয়েছেন। তখন তোমাকে কে দেখবে শুনি। আর, পাশ দেওয়াত' বাপু তোমার একার সাধ্য নয়।

পাখি যে এই রকম একটা সমস্যার কথা কখনো ভাবেনি এমন নয়, তবে দূর ভবিষ্যতের কোনো চিন্তা তাকে কখনো পীড়িত করেনি, তাই ও নিয়ে অতটা ব্যস্ত হয়নি। গেনুমাসির মুখ থেকে কথা শুনে এখন যেন যে একটু বিচলিত হয়ে পড়লো।

তুমি কি ম্যানেজারের কাছে বলেছো নাকি লেখাপড়ার কথা?

না, ললিতাদি বারণ করে দিয়েছে।

ও, তা বেশ করেছে। তবে তোমার যদি দরকার থাকে—আমায় বলো, এ বিষয়ে তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারি।

বেশ ত! আপনাদের পাঁচজনের দয়াই ত' আমার একমাত্র ভরসা।

কিন্তু, তোমাকে ত' আবার কিছু বলতে ভয় করে মা। তুমি আবার ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে ত'। বলবে গেনুমাসি তোমায় এই সাহায্য করছে, এখানে নিয়ে গেছে ওর সংগে আলাপ করিয়েছে; এর কাছ থেকে বই এনে দিয়েছে, টাকা পাইয়েছে, পড়া বুঝিয়েছে, আর আমাকে সকলে ছিঁড়ে খাক। এই কাঙালখানায় যদি একবার শাকের খেতের খবর আসে—বুছতেই পারছো।

পাখি কিন্তু বিশেষ কি বুঝতে পারলো না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো গেনুমাসির মুখের দিকে। সুন্দর ছুপাটি দাঁত গেনুমাসির, বাঁধানো কিনা কে জানে। সাদা দুধের মতো রঙ—তার ওপর পান খাওয়ার

জন্মে খয়েরী একটা ছোপ; হাসলে এখনো বেশ দেখায়। তিনি হেসে ফেললেন পাখির বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখে, পাঁখির গলাটা আলতোভাবে একটু টিপে দিয়ে বললে—আহা যেন কিছু বোঝে না, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না। ছেলের মা হয়ে এলেন—

বেদনার জায়গায় গেনুমাসিও ঘা দিতে জানেন—কিন্তু কেন তিনি এমন করে আঘাত হানেন.—পাখি সে কথাও ভেবে পায় না।

গেনুমাসি বলেন—পাঁচজনকে ত' নয়ই। ললিতে ছুঁড়িকে বলতে পাবি না। তা হলেই তোকে সাহায্য করতে পারি।

সাহায্য? সাহায্য ত' আমি চাইনা, মাসি। শুধু একটু লেখা-পড়ার সুবিধা হয়—

বাধা দিয়ে গেনুমাসি বললেন—ওই হলো। যার নাম ভাজা চাল, তার নামই মুড়ি। তোকে এক সময় নিয়ে যাবো এক জায়গায় লেখা-পড়ার জন্য।

পাখির মনে একটু খটকা রয়ে গেল—ললিতার কাছে কিছু জানাতে বারণ করলেন কেন গেনুমাসি। ললিতা ত' কখনো কাউকে লুকিয়ে কোন কাজ করেনা, বলেও না যে এ ব্যাপারটা লুকিয়ে চলতে হয় ওইটে গোপনে সারতে হয়। কি কষ্টে অর্থ উপায় করে, নিজেকে লজ্জা অপমানের কোন্ চরম দুর্দশায় টেনে নিয়ে এসে সে লেখাপড়া শিখেছে—তা সে মুক্ত কণ্ঠেই সকলকে বলেছে। কিন্তু গেনুমাসির লোকচক্ষের ব্যবহারে যেমন লোক কল্যাণের একটা ছাপ আছে, মেয়ে বিশেষের সংগে তেমনি গোপন ফিসফাসের একটা রহস্য জড়িয়ে থাকে। গেনু মাসি যেন সত্যিই সমুদ্রের মতো, যেমন মাঝখানে ভয়ংকর, তেমন কাছে মনোরম। প্রকাশ্য ব্যবহারে বোঝা যায়, গোপন মেলামেশায় ধরা ছোঁয়া যায় না। গেনুমাসি সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

রাস্তার ধারে নারী কল্যাণ সমিতি। কতলোক রাস্তায় যায় আসে।

কতদিন তাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরেছে পাখি, কিন্তু কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। আজ সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলে। কাছেপিঠে কোথায় একটা মেয়ে স্কুলের ছুটি হয়েছে—মেয়েরা যাচ্চে। তখনো বিকেল হয়নি, গ্রীষ্মকালের শেষ মধ্যাহ্ন। পিচের রাস্তায় জল দিচ্চে ভিস্তিওয়ালারা। আগুনের হল্কা ছুটছে যেন! আকাশের রং পাংশু-বর্ণ, একটা পাৎলা ছাইয়ের আস্তরণে ঢেকে আছে। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে, বড় বড় বাড়ীর ছায়া এসে ঈষৎ শীতল করছে পথকে। পথচারী মানুষেরা সেই ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে। মেয়েরাও চলেছে বই খাতা নিয়ে। কত সুন্দর সুন্দর মুখ, কি রকম শোভনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, কি মনোহর কেশ-বিন্যাস! কেউ চলেছে একা কারা বা ছোট্ট একটা দল করে। একটা বৃহত্তর সহজতর সুন্দরতর জীবনের ইংগিত যেন বিচ্ছুরিত হচ্চে এই সব মেয়েবের চালচলনে। কি উচ্চ-কণ্ঠ, কি উদ্দাম গতিভংগী! জীবনের নির্দিষ্ট পথে যাওয়ার আনন্দ যেন প্রচণ্ডভাবে তাদেরকে আরো উজ্জ্বল আরো মহান্ করে তুলেছে। একটা বড় জীবনের হাতছানি ওদের ডাকছে, আর পাখি যেন তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, আর নিজের মনে কি এক গভীর পীড়া বোধ করে।

নিজের সংকীর্ণ জীবন-পরিধির কথা তার মনে পড়ে। সমিতির এই বদ্ধ পরিবেশ সে নিশ্চয়ই ত্যাগ করবে। কিন্তু কোথায় সে যাবে। এত বড় পৃথিবী অথচ তার জন্যে নিরাপদ স্থান নেই। গেনুমাসি বার বার সাবধান করে দেন। তিনি বলেন যে হরিণী নিজেই নিজের শত্রু, কথাটা ঠিকই।

আরো কত আবোল তাবোল চিন্তা আসে। ললিতা স্খলিত চরিত্রের একটি মেয়ে, কিন্তু সে ত' নিজেকে বুঝে দিতে পেরেছে, জীবনের একটা দার্শনিক রূপ সে সঠিক বুঝে নিয়েছে, তাই কোথাও কোনো ব্যাপারে পেছপা হয় না, জীবনের সব যখন হারিয়ে যায় মনে হয় বুঝি শেষ হয়ে গেল, তখনই সে নতুন করে সুরু করতে পারে। অশ্বিনী বাবু যখন

তাকে নিঃশেষ করে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন—তখন ললিতাই তার পুরনো বন্ধুকে খুঁজে বের করে তাকে বিয়ে করে বসেছে রেজেষ্ট্রী করে। কোথাও পরাজিত হয়নি, পরাজয়ের গ্লানি কখনো তাকে স্পর্শ করে না। কোন আঘাতেই সে ভেঙে পড়ে না। অথচ পাখি? পাখি কত অসহায়! অবস্থা বিপর্যয়ের সংগে খাপ খাওয়ানোর শিক্ষা তার নেই।

গেনুমাসিকেও ডেকে পাখি জানিয়ে দিলে—আমি তোমার সাহায্য চাই মাসি, আমাকে দাঁড়াতে হবে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাকে জীবনের আলো দেখাও, লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো, আমি কথা দিচ্চি কাউকে বলবো না, তুমি আমাকে যে সাহায্য করছো, সে কথা কেউ জানবে না।

এ ত' ভালো কথা মা। কখনো দমে যেতে নেই। বাইরে—ওই উত্তর দিকে একবার তাকা পাখি। ওই কৃষ্ণচুড়ো গাছটা দেখ। কেমন ফুল ধরেছে রাঙা রাঙা। কোলকাতা সহরের রুক্ষ পরিবেশ বলেত' সে ভেঙে পড়েনি। নিজেকে সে ঠিকই প্রকাশ করেছে। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস—তখন বিরুদ্ধ পরিবেশে কেন ভেঙে পড়বি মা। নিজেকে ফুল করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। গেনুমাসির লাগসই উপামায় পাখি চমকে ওঠে বটে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে সামলে নেয়, গেনুমাসির দিকে চেয়ে একটু হাসেও।

বিকেল হয়ে এসেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে। এই রুক্ষ সহরে, পিচঢালা তপ্ত পথের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছে কি অপূর্ব শোভায় ফুল ফুটেছে। কত মানুষের ছোটাছুটি, কেউ এদিক থেকে ওদিক কাজে যাচ্ছে, কেউ বা আলস্যের ভংগীতে মন্থর গতিতে দুশ্চিন্তিত মনটাকে ঈষৎ শান্ত করতে করতে কোথাও ফাঁকায় চলেছে। চারিদিক রোদে পোড়া অট্টালিকার চোখ রাঙানি। আকাশ পাণ্ডুবর্ণ, সত্যিই ত'—তবু এই পরিবেশে গ্রীষ্মের রাজা কৃষ্ণচূড়া ফুলে লালে লাল করে তুলেছে কোলকাতার গাছগুলোকে। ভারি আশ্চর্য লাগালো পাখির

গেন্নুমাসি ঠিকই বলেছেন—এ যেন অদৃশ্যলোক থেকে সুন্দর এই বিশ্রী বেঢপ বেমানান জগতের কাছেও তার মিষ্টি হাতছানির সংকেত জানিয়েছে। বিশ্রী হয়েছিল পাখির মনটা। কিন্তু বেখাপ্পা এই পরিবেশের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ার ভ্রূক্ষেপহীন মোহন রূপ দেখে পাখির মন শান্ত হয়ে উঠলো,—হয়তো তার জীবনের প্রতিই কোন নির্দেশ এল কি না কে জানে? বাইরের পরিবেশকে অস্বীকার করে নিজেকে বিকাশ করে তোলে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নিজেকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করাই ত' যথার্থ জীবন পরিচয়। পাখি ভেঙে পড়বে কেন? পীচের রাস্তা, পাংশু আকাশ, প্রচণ্ড সূর্যের নিদারুণ তাপ, কংক্রীট জমানো মস্ত মস্ত অট্টালিকা—সব কিছুতে তুচ্ছ করেই ত' কৃষ্ণচূড়া মাথায় ফুলের আবির মাখিয়ে দিতে পেরেছে। পারবে না পাখি এই দীক্ষা নিতে? গেন্নুমাসি ঠিকই বলেছেন—কেন, কেন পাখি অবস্থার দুর্বিপাকে নিজেকে জড়াতে দেবে?

উৎসাহের সংগে সে সুরু করে দিল পড়া। প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে, পরে প্রকাশ্যভাবেই। ভয় কিসের? কাকে ভয়? নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে গেন্নুমাসি রয়েছেন, নিজেও এখন অনেকটা বুঝতে শিখেছে—তাছাড়া জিভের আড় ভেঙেছে, সহরের পথে ঘাটে একা চলার ভয় ভেঙেছে। এক বইয়ের দোকানের মালিকের সংগে স্বল্প পরিচয় হয়েছে, বই নোটবই কেনার বা দেখে আসার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য পাচ্ছে।

তাছাড়া, গেন্নুমাসি একজনের সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, অকুণ্ঠ ভাবে অকাতরে পাখিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যিনি। তাঁর নাম তপেনবাবু।

তাই পুরো উদ্যমে নিজের জীবনের পথকে মসৃণ করে নেবার জন্যে পাখি উঠে পড়ে লাগলো। গেন্নুমাসিকে হঠাৎ যেন বড় কাজের মানুষ মনে হলো।

॥ পাঁচ ॥

ললিতার দিন এগিয়ে এল, এইবার সে চলে যাবে এখান থেকে। তার স্বামী বম্বে থেকে চিঠি দিয়েছে, ললিতা যেন ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠে আসে। সমিতি থেকে চিরদিনের মতো ছুটিও পেয়ে গেছে সে।

ললিতা পাখিকে পাখি পড়ানোর মতো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে এই নারী কল্যাণ সমিতির হালচাল, এর মানুষ জনের ব্যবহার। অশ্বিনী বাবু শক্তের ভক্ত, দুর্বলের যম। কামিনী প্রেম-পাগল অস্থির একটি মেয়ে। গেনুমাসির কথাবার্তা আচার ব্যবহার খুবই সন্দেহজনক। অশ্বিনীবাবুর সংগে কেমন যেন যোগসাজস আছে।

পাখি বললে—আমি কিন্তু গেনুমাসিকে ম্যানেজারবাবুর সংগে গোপনে কথাবার্তা বলতে প্রায় দেখি, তবে ভাই—আমার কিছু মনে হয় না।

অন্য কিছু নয়। পাখি—ললিতা বলতে লাগলো, মেয়েদের এই অবস্থাকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করে মেয়েদের মর্যাদা গেনুমাসি দিতে জানেন না। আমার বিয়ের প্রসংগে কি বলেছিল মনে নেই তোর। অনিলবাবুর কাছ থেকে দু-একশো টাকা আদয়ের মতলব দেয়নি,—এত সহজে, বিনা কড়িতেই এই আশ্রম থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে যাবে সে কথা গেনুমাসি ত' ভেবেই পান না। তাছাড়া তোর ওপরে গোয়েন্দাগিরি করেন ওই গেনুমাসি।

কেন? আকাশ থেকে পড়ার বিস্ময় নিয়ে পাখি জিজ্ঞাসা করে।

তুই যে ওর খাসনজরে আছিস। সেইজন্যেই না তোকে সাবধান করা দরকার। ওঁর দার্শনিক চিন্তা আর সতর্কবাণীর পেছনে কিন্তু

একটা সম্মোহিনী টান আছে, সেই আকর্ষণে যেন পড়িসনি। কামিনীকে লক্ষ্য করে যা—বুঝবি তাহলে।

পাখি শোনে আর স্তম্ভিত হয়ে যায়। জগৎ বলতে এই নাকি বোঝায়? কবে যে পাখি একটা চাকরী বাকরী নিয়ে এখান থেকে বের হবে অথবা ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কবে যে সে নার্সিং শেখার জন্যে চলে যাবে এখান থেকে, সেদিনের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে পড়ে সে। ললিতা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে অশ্বিনীবাবুর কাছে কখনো যেন নরম সে না হয়। তবে অকারণে অশ্বিনীবাবুকে কোনদিন খোঁচা দিতেও ললিতা পই পই করে মানা করেছে বটে। কারণ সংঘাতিক রকম প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোক এই অশ্বিনীবাবু। পাখি অবশ্য সেই বৃত্তিটার পরিচয় পেয়েছে এরই মধ্যে। ঐ যে একদিন পাখি বলেছিল চীৎকার করে সে লোক জড়ো করে ম্যানেজারের গুণাবলী কীর্তন করবে, তখন ম্যানেজারবাবু জীবনের সবচেয়ে বেদনার, কলংকের বোতামটা টিপে পাখিকে যন্ত্রণায় কাতর করে তুলেছিলেন—পাখি তা ভুলতে পারে না। অবশ্য এই পাপী ঘৃণ্য মানুষটাকে সে সহজে নিস্তার দেবে না। সুযোগ পেলে ছোবল দিতে হবে—সে শক্তি পাখির আছে। পাপের মুখোসে চিরকাল জৌলুষ থাকে না, রঙ ফিকে হলেই পাপের কুরূপ বেরিয়ে পড়ে। পাখিও সেদিনটার প্রতীক্ষা করুক না!

এক একবার পাখি ভাবে—জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকে বলে একটা নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। নিষ্ঠা কাকে বলে? নিষ্ঠা কি রকম? ললিতা ত' নিজেই গল্প করেছে, কিশোরী বয়সের সাথী তার গৃহশিক্ষকের জন্যে সে ঘর ছেড়েছে, তারপর কত না আবর্তনের মধ্যে দিয়ে কত বিচিত্র পুরুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পেরিয়ে একজনকে বিবাহ করে গৃহস্থালীর সহজ জীবনে উন্নীত হয়ে উঠলো। জীবনে বাঁচার প্রতি কি নিষ্ঠা তার কম! আবার খুকু যে অপরিচিত ব্যবসায়ীকে

স্বামিত্বে বরণ না করে গলায় দড়ি ঝুলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর—সেও কি জীবন-নিষ্ঠা নয়? কামিনী যে প্রেমকে বড় বলে জেনেছে—প্রেমের পাত্রকে সে গণ্যও করে না, তারও কি জীবন-নিষ্ঠার অভাব আছে বলা যায়? না, পাখি—যার বউ হয়েই থাকতে চেয়েছিল, স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করতে চেয়েছিল, সবুজ ঘাসের ভেলভেট মোড়া কাঁচা গ্রামে ছোট্ট মাটির ঘরে স্বামী-পুত্রের সেবায় সে ত' বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল নিজেকে, কিন্তু পারেনি; আশ্রমের নিয়মশৃংখলা মেনেই ত' সে চলতে চেয়েছিল—কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, বৃহত্তর জীবনের হাতছানিতে অধীর হচ্ছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজেকে তৈরী করে তুলছে, পরীক্ষার জন্যে খাটছে, ম্যানেজারের বদখেয়ালের রূঢ়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে—একি জীবন নিষ্ঠার পরিচয় নয?

আচ্ছা সে যদি ম্যানেজারকে বশ করে রাখত, ম্যানেজারের বাধ্য হয়ে নিজের ভাগ্যকে আর একটু সমৃদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল করে তুলে অন্য কোনো শিকার ধরে চলে যেতো কোলকাতা ছেড়ে, সেখান থেকে আরো দূরে—তাহলে বাঁচার জন্যে লড়াই করছে বলা যেত না তাকে? সে চেষ্টা কি জীবননিষ্ঠা নয়?

আসলে সত্তার সংগে টিঁকে থাকার জন্যে যে যুদ্ধ করতে হয় মানুষকে, তাই যখন সে করে—তাকেই জীবননিষ্ঠা বলা চলে। মিথ্যার খোলস এঁটে নয়, সত্যের বর্ম চড়িয়ে যুদ্ধ করার নামই জীবননিষ্ঠা।

এই সমিতিতে এ জাতীয় নিষ্ঠার পরিচয় পাখি খুব বেশী পায়নি। অশ্বিনীবাবু মুখোস পরা অসাধু, গেনুমাসি মিষ্টভাষী খোলসপরা, কামিনী পাগল। ললিতা অবশ্য জীবন পথের একটা লক্ষ্য বা আদর্শ ঠিক করে নিয়েছে—সেই পথেই সে চলেছে, সনাতন রীতির ধার সে ধারে না।

সত্যি সত্যিই একদিন কামিনী অশ্বিনীভক্ত হয়ে উঠলে। এই রকম রটনাও শোনা গেল যে ওরা দুজনে ট্যাক্সি চেপে সিনেমা শো দেখে এসেছে, রেষ্টুরেণ্টের নিভৃত কক্ষে হৃদয় বিনিময়ের কথাবার্তা বলেছে। ললিতা যত সহজে পাখিকে সতর্ক করতে পেরেছে, কামিনীকে তা পারেনি। এমন কি অশ্বিনীবাবু সম্পর্কে চোখ ফুটিয়ে দিতেও পারেনি। কামিনী ধীরে ধীরে অশ্বিনীবাবুর মিষ্টি ব্যবহারে, আরো মিষ্টি কথাবার্তার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কামিনী বললে—দেখুন ম্যানেজারবাবু, শুনেছি আপনি ত' খুব পণ্ডিত। বলতে পারেন এ জীবনটা কি? এই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য কি? চিরদিন কোনটা বেঁচে থাকে?

তুমি যে প্রশ্নের ঝড় তুললে—কামিনী, আর সে—সে প্রশ্নগুলি যে এক জাতের নয়, তা আশা করি বুঝতে পারছো। এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে কেন শুনতে চাচ্ছো কামিনী,—এসব জিজ্ঞাসার জবাব প্রিয়জনের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। বলে অশ্বিনীবাবু কামিনীর আয়ত চোখ দুটির দিকে এমন বোকা বোকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—যাতে কামিনীই লজ্জা পেয়ে নিজের চোখ দুটি নামিয়ে নিলে।

কামিনী দৃপ্ত কণ্ঠে বললে—অপ্রিয়জন হিসাবেই না হয় জবাবটা দিতেন।

তাতে যে মুস্কিল আছে কামিনী। আমি এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের একজন কর্তা আমার সংগে এই জাতীয় আলোচনা যে করতে নেই। তবে তুমি যখন জানতে চাইছ তখন জবাব দিতে হবে বৈ কী তোমাকে ত' আর বিমুখ করতে পারি না। বলে একটু থামলেন অশ্বিনীবাবু।

কামিনা বললেন—জীবন যে কি সে প্রশ্নের একটা জবাব যে

আমি নিজে ঠিক করে নিইনি—তা নয়, কিন্তু আমার হয়তো ভুল হচ্ছে, সেই ভেবেই সকলকে জিজ্ঞাসা করছি।

কি মীমাংসা তুমি ঠিক করেছ ?

জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে প্রেম। ভালবাসাই হচেছ জীবনের ধ্রুবতারা। যে কখনো ভালবাসেনি কাউকে, ভালবাসা যে পায়নি কখনো—সে বড় দুর্ভাগা। ঠিক কিনা বলুন ?

অশ্বিনীবাবু কোনো কথা না বলে অর্থপূর্ণভাবে একবার কামিনীর দিকে তাকালেন।

আজ একটু বেড়াতে যাবেন ম্যানেজারবাবু—সন্ধ্যের পর চলুন না গড়ের মাঠের দিকে একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক। যাবেন ?

আমার ত' আজ সময় হবে না কামিনী। কাল যাওয়া যাবে'খন। তা ছাড়া আজ সন্ধ্যায় ললিতা চলে যাচ্চে আমাদের কাছ ছেড়ে—আমরা সবাই থাকবো তখন বলেছি। পাখি নাকি ওর একটা ফেয়ার ওয়েল মিটিং পর্যন্ত করার ব্যবস্থা করে ফেলছে।

কামিনী কোনো কথা বললে না, শুধু 'ও' বলে চুপ করে গেল।

অশ্বিনীবাবুই বলে চল্লেন—তুমি হয়তো রাগ করলে, কিন্তু সৌজন্য বা শোভনতা থেকে সরে যাওয়াও ত' জীবন নয় কামিনী। এতদিন ললিতা ছিল আমাদের মধ্যে, আজ সে বিবাহিত, নিজের ঘর সংসারের জন্যে চলে যাচ্চে আমাদের কাছ ছেড়ে, এদিনে কি অনুপস্থিত থাকা চলে। তা ছাড়া বেড়ানো ত' পালাচ্চে না। তুমি অকারণ রাগ করছ কামিনী। —বলে অশ্বিনীবাবু কামিনীর হাত দুটো তুলে ধরলেন।

কামিনী একটু রাগত স্বরে আর একটু জোরের সংগেই বললে—ললিতা সম্পর্কে আপনার দুর্বলতার কথা শুনেছিলাম,—কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এখন যেন কি রকম মনে হচ্ছে। আমাকে মাপ করবেন ম্যানেজারবাবু, আমিও বেড়াতে যেতে চাই না—বলে দ্রুত পদবিক্ষেপে কামিনী বেরিয়ে গেল। অশ্বিনীবাবু কামিনীর যাওয়ার পদরেখার দিকে

বক্রদৃষ্টি মেলে ধরলেন। তারপর সামনের একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালেন একটা। ললিতার বিদায়-দিনে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় কামিনী—এই ঘটনাটী পরিষ্কার হয়ে যেতেই অশ্বিনীবাবুর মুখে অর্থপূর্ণ একটা হাসির ঝিলিক দেখা গেল। পাখির বদলে কামিনীকেই যদি শিকার হিসেবে কোথাও দিয়ে আসা যায়—মন্দ কি! বঁড়শিতে টোপ যখন গিলেছে একবার, খেলিয়ে তুলতেই হবে একে। অনেকগুলি টাকা অনেকের কাছ থেকে আগাম খেয়ে বসে আছেন অশ্বিনীবাবু, গেন্নুমাসিকে লাগিয়েও কোনো কাজ হচ্ছিল না; ললিতা ফস্কালে, পাখিকে নোয়ানো গেল না, কামিনী শিকারের বাইরে ছিল, সে যখন স্বেচ্ছায় পা দিয়েছে, তখন তাকে ছাড়া চলে না।

কামিনীর রাগ কিন্তু পড়তে বেশীক্ষণ দেরী হল না। পরের বার অশ্বিনীবাবুর সংগে চোখাচোখি হতেই সে ঈষৎ হেসে ফেললে।

অশ্বিনীবাবু বললেন—আমি জানি কামিনী, তুমি আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না।

কেন?

কেন তা আমি হয়ত বলতে পারবো না, কিন্তু তোমার মনটা এমনই কোমল যে, তুমি তোমার প্রিয়জনদের প্রতি কখনো রুষ্ট হতে জানো না।

আপনি বুঝি আমার প্রিয়জন? এই বিশ্বসংসার পড়ে থাকতে আপনাকে যাবো আমি ভালবাসতে? আপনার এ কথাটা ভাবতে একটু লজ্জা পর্যন্ত হলো না—উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কামিনী। ম্যানেজার বলে কি! তাকে—তার মতো একজনকে ভালবাসবে?

অশ্বিনীবাবুর কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি খুব শান্ত আর সংযতভাবেই জবাব দিলেন—প্রিয়জন আজ হয়তো নই, কিন্তু হতে কতক্ষণ। কামিনী, আমি বলি কি, এখন এসব প্রসংগ থাক। ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার আজ নয়। কাল থেকে আবার সুরু হবে। আজ ললিতা চলে যাচ্ছে।

কামিনী বুঝতে পারলে তাকে খোঁচা দেবার জন্যেই যেন ললিতার নামটি ইচ্ছে করে ম্যানেজারবাবু উল্লেখ করলেন। কামিনী আর কি বলবে, চুপ করে সরে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালে।

যাবার সময় দেখতে পেল গেনুমাসিকে। তিনি যেন অশ্বিনীবাবুর ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন, কামিনীকে দেখে অন্যমন হয়ে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু একটু পরে পিছন ফিরে দেখতে পেল যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মতো গেনুমাসি অশ্বিনীবাবুর ঘরে ঢুকে পড়লেন।

কামিনী ওপরে উঠে এসে দেখলে, পাখি ঘরে বসে বই পড়ছে। সে ঘরে ঢুকেই জানালে যে, সে গেনুমাসিকে ম্যানেজারে ঘরে ঢুকতে দেখেছে। তাঁর সংগে ম্যানেজারের কি এমন গোপন পরামর্শ থাকতে পারে—কামিনী তা ভেবে উঠতে পারে না।

পাখি গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের একটা বই পড়ছিল, সে দুচোখ তুলে কামিনীকে দেখলে। কামিনীর মুখচোখ ক্রমেই যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন রুক্ষতা তার বাড়ছে, উগ্র হয়ে উঠছে কি রকম। জীবন সম্পর্কে বিশ্রী অপরিচ্ছন্ন একটা ধারণা তার জন্মাচ্ছে।

কি হয়েছে—সরলভাবে কামিনীকে পাখি জিজ্ঞাসা করলে।

মানে ওদের মধ্যেও কি ইয়ে আছে নাকি ?

ইয়ে মানে ?

মানে প্রেম ? দিন দুপুরে যেমন ওরা মেলামেশা করেন—তাতে মনে হয় তাই।

তোমার আজকাল দেখি সব কিছুকেই প্রেমের ব্যাপার মনে হয়। তুমি আসলে সত্যিকারের প্রেমিক, প্রেম ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না। হয়তো সমিতির কোনো দরকারেই গেছেন গেনুমাসি—

কামিনী হো হো করে হেসে উঠলো—এলোমেলো হাসি।

গেনুমাসি আর অশ্বিনীবাবু সম্পর্কে পাখির একটা স্থির প্রত্যয় ধীরে ধীরে ঘটছিল। ললিতা অশ্বিনীবাবুর মুখোস খুলে দিয়েছিল, কিন্তু গেনুমাসিকে ধরতে ছুঁতে পারেনি। কামিনীও না। সংশয় করেছে সে, গেনুমাসি সম্পর্কে তার মন বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু গেনুমাসির যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করা তারও সাধ্যের বাইরে ছিল। গেনুমাসি সম্পর্কে যে যা বলেছে, পাখি সে সব শুনেছে, কিন্তু তার মনে হয়েছে, গেনুমাসি সে সবের চেয়েও সাংঘাতিক। অথচ যথার্থ যে কি—তার আবিষ্কারের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হয়েছে। আজকাল গেনুমাসির সংগে তার মেলামেশাটা একটু বেশীই হয় বটে, সেটা অন্য কোনো কারণে নয়, শুধু পাখি তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর মুখোস খুলে নেবে—এই নেশার টানে সে গেনুমাসিকে আমল দেয়।

অশ্বিনীবাবুর সংগে সেদিনের পর থেকে এক রকম বোঝাপড়া হয়ে গেছে—তিনি এখন কেমন আত্মীয়তাপূর্ণ হৃদ্য ব্যবহার করতে আসেন। গেনুমাসির সংগে মেলামেশার পর থেকেই অশ্বিনীবাবুর এই পরিবর্তন একটু আশ্চর্যজনক ঠেকে পাখির কাছে। কিন্তু কারণটা সহজে টের পাওয়া যায় না। তবে বোঝা যায়—কোথায় কোন্ সুদূরে, কোথায় কোন্ গভীরে এই দুই শক্তির—অশ্বিনীবাবু আর গেনুমাসির যোগসাজস আছে। কোন্ অনন্ত অসীমলোকে এই দুই সমান্তরাল রেখার যেন মিল ঘটেছে, পাখি সেই জায়গাটা খোঁজ করতে চায়।

গেনুমাসি বা অশ্বিনীবাবু—যেই আসুক না পাখির কাছে, পাখির তাতে ক্ষতি নেই। এই সমিতির সকলকে দেখে সে এটুকু শিখেছে যে প্রথমে নিজেকে বাঁচতে হবে, এবং সেই অধিকারকে যদি সে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে, তবে তার জীবনের কোনো অর্থ হয় না।

পাখি ক্লান্ত বোধ করে আর ভাবে—সে কি পারবে এই কলুষিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে? হাঁফ ধরে পাখির।

॥ ছয় ॥

ললিতা চলে যাবার পর দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জানতে পাখি গেল বইয়ের দোকানে। আজকাল পুস্তিকার সাহায্য ছাড়া রেজাল্ট জানার উপায় নেই। পাখি পরীক্ষা দিয়েছে ভালই—তবু সংশয়ান্বিত একটা কৌতূহল। গেনুমাসির সাহায্যে পাখি তপেনবাবুর সান্নিধ্যে এসে নিজেকে বাইরের জগতে সংগ্রামশীল করার দীক্ষা নিতে পেরেছে। এই একটা বছরে অনেকটা জল বয়ে গেছে গংগা দিয়ে।

পাখি অশ্বিনীবাবুর ভরসায় বসেছিল। তিনি রোল নম্বর নিয়েছিলেন, কিন্তু পাকা খবর কিছুই দিতে পারেন নি, একবার বললেন, তুমি সব বিষয়েই পাশ করেছো পাখি, শুধু ইংরেজিটায় একটু যা কম আছে, তবে আমি যাকে ধরেছি, সে ঠিক করে দেবে। তুমি আমাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করো।

প্রথমে পাখি বিশ্বাস করেছিল অশ্বিনীবাবুর কথা, যুক্তিতে উজ্জ্বলও হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দুদিন পরেই এই অশ্বিনীবাবু বলেছিলেন—তোমার নম্বরটা কি বলো ত? আমি যাকে দিয়েছিলাম জানতে, সে বলছে যে হারিয়ে ফেলেছে রোল নাম্বার।

আবার এরও দুদিন পরে অন্য আরেক রকম কথা বলেছিলেন অশ্বিনীবাবু।

সুতরাং ম্যানেজারের ধাপ্পা সে বুঝতে পেরেছিল।

গেনুমাসিকে পাখি বলেছিল ব্যাপারটা। মিথ্যে কথা বলার কোন্‌দেশী ধরণ এ—তা জানবার উদ্দেশ্যেই অশ্বিনীবাবু সম্পর্কে গেনুমাসিকে খোলাখুলি প্রশ্ন করলে—ম্যানেজারবাবু খুব মিথ্যুক—না মাসি?

গেনুমাসি চমকে উঠলেন—তার মানে ?

আমাকে রোজ এক এক রকমের কথা বলেন আমার পরীক্ষা পাশের সম্পর্কে।

—ও। তাই বলো, আমি ভাবলাম বুঝি অন্য কিছু। তা পাখি, তুই কি তোর খবর আগে থেকে জানতে চাস্ ? আমাকে বলিস নি কেন—তোকে ত' তপেনবাবু সাহায্য করতে পারেন। তপেনবাবুর সংগে কার না জানাশোনা আছে—জজ-ম্যাজিস্ট্রেট্ থেকে আরম্ভ করে রাস্তার লোক পর্যন্ত।

পরীক্ষার রেজাল্ট জানার ব্যাপারে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্য লাগে না মাসি। নীচু গলায় পাখি বললে।

তা আমি জানি, মুখখ্যু বলে কি একটুও জানতে নেই ? তবে তপেনবাবু পারেন না, এমন কাজ নেই। আর কি জানিস—ওঁর মতো দয়ার শরীর ত' আমি কাউকে দেখিনি। তুইও বোধ হয় টের পেয়েছিস। যখনই বিপন্ন হয়ে গিয়ে পড়েছিস, অমনি নিজে ঘাড়ে পেতে নিয়েছেন তোর কাজ ; নিজে করুক কি অন্যকে দিয়ে করিয়ে দিক্—কখনো বিমুখ করেন না।

কিন্তু কি জানো মাসিমা—কখনো কখনো বড্ড বিশ্রীভাবে তাকায়। আর মাঝে মাঝে এমন আমতা আমতা করে কথা বলে—তখনই সব চেয়ে খারাপ লাগে।

ধমকে উঠলেন গেনুমাসি—তা তোর মতো ভরযৌবন মেয়ের দিকেও যদি না তাকায়—তবে দেখবে কোন দিকে লা ? তুই বুঝিস না তোর দর কত, কিন্তু তা বলে লোকেও তার দাম দেবে না। পুরুষ মানুষ অমন একটু আধটু চেয়েই থাকে। আর সোমত্ত মেয়েদের সামনে ল্যা ল্যা করে না—এমন পুরুষও খুব কম আছে। তপেনবাবুর মনে কোনো পাপ নেই, তিনি ত' আর ছক্কাই-পাঞ্জাই জানেন না যে মনে এক রকম আর মুখে এক রকম ভাব দেখাবেন।

কখনো খুব সুন্দর ঠেকে, উপকারী বন্ধু বলে মনে হয়, আবার

কখনো বোকা বোকা কথা বলে, ড্যাব ড্যাব করে তাকায়—একটা হাত হয়তো নাড়ছি—তাও এমন মদিরভাবে চেয়ে দেখে। ওর কাছে যেতে আমার এক একবার ভয় করে। তাই ভাবছি আমি আর ওখানে যাবো না।

তা যাবি কেন? দায় উদ্ধার করে দিয়েছে বুঝি? এত পড়া দেখিয়ে দিলে, বই কিনে দিলে, ফর্মে সই জোগাড় করে দিলে,—ভেবো না যে সব শেষ হয়ে গেল। আরো ত' পড়া আছে—চাকরী আছে, এখান থেকে বাঁচতে হলে—তপেনবাবুকে চটালে চলবে না। সমিতির নদী পেরোতে গেলে তপেনের নৌকাকেই সার করতে হবে—তা তুমি জেনে রেখো পাখি। তপেনবাবুর শেখানো কথাই গেনুমাসি বলেন।

মুরুব্বিয়ানার চালে পাখি জবাব দিলে—কিন্তু তপেনবাবুর নৌকো ত' ডাঙার দিকে চলছে না—মাঝ দরিয়ায় নিয়ে না ডুবিয়ে দেয়।

দেখ পাখি রাগাস নি আমাকে। কথার ওপর ফুটকাটা আমি পছন্দ করি না। যদি মাঝ দরিয়ায় সে তোকে ডোবায় ত'—জানবি তোর ভাগ্য ভালো। মুখপুড়ি, তোকে বেরোতে হবে এখান থেকে। কিন্তু একটা অবলম্বন ধরে ত' বের হবি। আমি তোর ভালই করেছি রে—কোনো কষ্ট হবে না। নিজে যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবি, সব বুঝতে শিখবি—সেদিন মনে করিস একবার। তোর লক্ষ্মীশ্রীর কথা একবার ভেবে ছাখ না—

পাখি স্পষ্ট করে তবু ধরতে পারে না—গেনুমাসি কি ইংগিত করছেন। একটা পংকিল আবর্তের থিতিয়ে পড়া জলের পরিচ্ছন্ন উপরিভাগ বলে গেনুমাসিকে মনে হতো—কিন্তু এ তিনি কি ইংগিত করছেন! জল যে ঘুলিয়ে উঠতে চায়, মালিন্যের ফেনা ভেসে ওঠে—

আজ পাখির মনে স্পষ্টই মনে পড়ে—তপেনবাবুর কাছে গেনু মাসি যখন তাকে নিয়ে যান গোপনে, তখন এই তপেনবাবু অশ্বিনীবাবুর কথা বলেছিলেন, পাখিকেই খুব ভালো শিকার বলে গেনুমাসিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গেনুমাসি দুদশ টাকা নিতেন তপেনবাবুর কাছে,

পড়া বুঝিয়ে দেবার ছল করে তপেনবাবুও পাখির সংগে নরম সুরে ফষ্টিনষ্টি করার তাই সাহস পেয়েছেন। গেনুমাসি তা জানতেন।

গেনুমাসি বলেন—পাখি, যদি ডুবতেই হয়, তবে অতল দীঘির পরিষ্কার জলেই ডুবে মরা ভালো। আর শরীরে মনে যখন জ্বালাপোড়া ধরে, গরমে যখন পচে মরতে হয়—তখন ঠাণ্ডাজলে শরীর মন ধুয়ে নিলে দোষের কিছু হয় না। আর যদি নামতেই হয় জলে, তখন পরিষ্কার জলেই ঝাঁপ দিতে হয়। আমি তোর কিছু অকল্যাণ করবো না পাখি, তোকে বড় জীবনের খবরটুকু পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি মাত্র।

বড় জীবন? এ কোন্ বড় জীবন?

তপেনবাবু অবশ্য গেনুমাসির মতো এতটা খোলাখুলি ব্যবহার পছন্দ করেন না। অবশ্য তিনি চান না মন দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে একটা মেয়ে তাঁর কাছে ধরা দেবে কিম্বা মান অভিমানের খাদে তাঁর প্রেমের মলিনতা ধুয়ে পবিত্র হয়ে উঠবে—এসব দুর্বুদ্ধি তিনি বহুদিনই জলাঞ্জলি দিয়েছেন। কয়েকজনে মিলে আমোদ আহ্লাদ করেন,, ধনীদের আনন্দ ভোগের পণ্য কিছু সংগ্রহ করেন, বাইরে থেকে অন্ততঃ তাই মনে হয়। পাখির মতো একটা শিকারের জন্যে গেনু মাসিকে পারিশ্রমিক দিতে হয় মন্দ নয়, তাঁর এই রকম একটি শিকারের প্রয়োজন ছিল—বহুদিন থেকেই তিনি তীব্র ভাবে চেষ্টা করছেন। শুধু খেলার বা খেলানোর জন্যে এ শিকার তাঁর দরকার নেই, আরো গভীরতর কোন প্রয়োজনেই পাখির মতো একটি চঞ্চল প্রাণবতী মেয়েকে দরকার।

পাখি ধীরে ধীরে এদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছিল। সাজানো সহর কোলকাতা। যে দিকে তাকাও—সুন্দর পরিচ্ছন্ন, ধবধবে, তকতকে। কোথাও কোনো মালিন্য নেই, কোথাও যেন কোনো

গ্লানি নেই। কি উজ্জ্বল দীপ্তিময় হাস্যমুখর এই সহর। কিন্তু ওপরে যার এতো মাজাঘসা—তার ভেতরটা এমন নোংরা? গেনুমাসির উজ্জ্বল কপালে রক্তরঙের মতো উজ্জ্বলতর সিঁদুর টিপের মধ্যে এত কলংক? অশ্বিনীবাবুর তরল হাসির ফেনায় এ রকম পংকিলতা!

গেনুমাসি বলেন—ওরে, তাইত' এই সহরকে স্টেজ বলে। নেপথ্য এক জিনিষ—আর মঞ্চ অন্য জিনিষ, বাইরের বসবার ঘর আর খাবার কি শোবার ঘর—যেখানে সব সময় বাস করতে হয়—তা কি এক রে। বুঝবি, মা,—সব বুঝবি। এই ভব নাটমঞ্চের লীলে সবই বুঝবি পাখি—আর একটু বয়স হোক আর একটু দোল খা, টোল খা।

আজ মনে পড়ে গেনুমাসির এ কথা শুনে প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রোহ-বহ্নি পাখির মনে বাসা বেঁধেছিল।

তাতেও গেনুমাসির সান্ত্বনা আছে—বক্তব্য আছে, অনুরোধ আছে —যে জমির ফুল ফোটানোর শক্তি আছে, ফল ধরানোর ক্ষমতা আছে—সে যদি অকারণে বিদ্রোহ করে বসে—আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে—তবে তাকে ব্যর্থ হতে হবে, কেননা আগ্নেয়গিরি গড়বার ক্ষেত্র ত' সেটা নয়। বরং ব্যর্থ হবে ফুল, নষ্ট হবে ফসল। তুই গান করবি, হাওয়ায় ভাসবি, আকাশের নীলে নীলে উড়বি,—তা না করে তুই যদি শুকনাস সেজে তত্ত্বকথা আওড়াস—লোকে যে তোকে গ্রাহ্য করবে না। পাগল বলে তোর প্রতি অনাদর দেখাবে, অমর্যাদা করবে।'

এ কথাও পাখির মনকে তুষ্ট করতে পারিনি। তবু পাখি ধীরে ধীরে একের খপ্পরেই ধরা পড়ছে, গেনুমাসির প্ররোচনায়, অশ্বিনীবাবুর পীড়াপীড়িতে তপেনবাবুকেই তার আত্মীয় বলে ভাবতে শিখেছে।

নির্দিষ্ট একটি দোকানে বই কিনতে কিনতে পাখির সেই বইয়ের দোকানের মালিকের সংগে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সেই মালিকের নাম রবীনবাবু। যেমন অমায়িক, তেমন মিষ্টি আর পরোপ-

কারী। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে কোনো বিচার সে আর সহসা করবে না—এই প্রতিজ্ঞাই করেছে। তবু এই রবীনবাবুর কাছ থেকে কিছু বই তাকে নিতে হয়েছিল পড়ার জন্যে, কিছু চেয়ে চিন্তে, কিছু বাকীতে—সেজন্যে ত' একটা ধন্যবাদ অন্ততঃ ভদ্রলোকের পাওনা হয়েছে। তাই রবীনবাবুর সংগে দেখা করে সৌজন্য রক্ষা করার ইচ্ছে আছে এবং ঐ ফাঁকে পুস্তিকার সাহায্যেই হোক বা রবীনবাবুর চেষ্টাতেই হোক পাশের খবরটা যদি পাওয়া যায়!

অনেক দিন পরে বইয়ের দোকানে যেতেও যেন কেমন সংকোচ হলো পাখির। পরীক্ষার সময় ভদ্রলোক অনেক নোট বই, হেল্প বই দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা শেষ হলে একদিন সেই বই-গুলি ফেরৎ দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর একবারও এখানে মাড়ায়নি সে,—আর বইগুলি ফেরৎ দেবার সময় মালিক যখন ছিল না দোকানে, তখন পরে একবার অন্ততঃ এসে রবীন বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়ার সৌজন্যটুকু না দেখানো তার পক্ষে অন্যায় হয়ে গেছে অবশ্যই। সমিতি থেকে বেরনোর বাধা কিছু নেই এখন—তবু সে আসতে পারে নি।

অথচ রবীনবাবুর সংগে দেখা করতে যে তার কোনরকম অনিচ্ছা তা নয়। আজ যাই কাল যাই করেই দেরী হয়ে গেছে, ট্রামে চেপে এখান দিয়ে যে কয়েকবার গেছে, উঁকি দিয়ে দোকানের দিকে তাকায়নি এমন নয়, কিন্তু সব সময়ই সে কর্মচারীদের বসে থাকতে দেখছে, রবীন-বাবুকে দেখতেই পায়নি যে পরের ষ্টপেজে নেমে এসে দেখা করবে।

তবু লজ্জা জড়িত সংকোচ ভরা মন নিয়ে দোকানে গিয়ে উঠলো পখি, কিন্তু রবীনবাবুর দেখা পাওয়া গেল'না। এরই মধ্যে কর্মচারী বদল হয়েছে; এখন যে কাজ করে—তার নাম গণেশ, বেশ চটপটে ছেলে, কাজে কথায় ভীষণ স্মার্ট। সে বললে—রবীনবাবুর ত' দেখা পাবেন না এখন, আপনি আমায় বলে যান, কেন তাঁকে খোঁজ করছেন?

তার সংগেই আমার দরকার। পাখি বললো। আচ্ছা শুনুন—কখন এলে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে? সকালের দিকে যদি আসি?

তাঁর দেখা পাবেন না এখন, কিছুদিন ত' নিশ্চয়ই।

কেন?

গণেশ চুপ করে রইলো, মনে কি যেন চিন্তা করছে।

কেন? তিনি কি কোলকাতার বাইরে গেছেন?—পাখি একটু উৎকণ্ঠিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলো।

না।

তবে?

তবে আবার কি, দোকানে আসেন না—এইটুকুই খবর, গণেশ বললে। ইতি মধ্যে য়্যামেচার ক্লাবে অভিনয়েচ্ছু একদল যুবক এসে এ-নাটক সে-নাটক চেয়ে বসলো, গণেশ তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো; পাখি আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবলো রবীনবাবুর বাসার ঠিকানাটা নিয়ে সেখানেই না হয় যাবে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে। কিন্তু দোকানের কাউণ্টারে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না, যুবকের দল তার দিকে কদর্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো—শুধু তা নয়, তাকে উদ্দেশ করে দুচার কথা বলতেও ছাড়লো না। পাখির ইচ্ছে ছিল রবীনবাবু সম্পর্কে আর একটু খোঁজ করে। তবু ওই ভীড়ের মধ্যেই গণেশকে জিজ্ঞাসা করে বসলো রবীনবাবুর বাড়ীর ঠিকানাটা।

কিছুটা বিরক্ত হয়ে কিছুটা বিস্মিত হয়ে গণেশ জিজ্ঞাসা করলে—আপনার দরকার কি আমাকে বলুন।

পাখি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললে—তিনি আমার কাছে কিছু টাকা পান, এখান থেকে বাকীতে বই কিনেছিলাম, সেই টাকা শোধ দিতে চাই। টাকাটা তাঁর হাতেই দিতে হবে—এই রকম নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন।

গণেশও বুঝলে যে ওই নাটুকে যুবকদের নাটকীয় ইংগিতের সামনে পাখি বিব্রত বোধ করছিল, তাই পাখির করুণ মুখের দিকে চেয়ে অগত্যা সে মালিকের বাসার ঠিকানাটা দিতে বাধ্য হলো।

পাখির অবশ্য যে খুব অসুবিধা হচ্ছিল দাঁড়াতে—ঠিক তা নয়।

এখন এই ক্ষুধার্ত সহরের লোভী নাগরিকেদের নগ্ন দৃষ্টির সংগে চেনা পরিচয় হয়ে গেছে। ওই কদর্য দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে কি করে ঘৃণা আর অপমান ছড়াতে হয়—তাও সে একটু একটু করে রপ্ত করে নিয়েছে।

রবীনবাবুর বাসার ঠিকানাটা পেয়ে পাখি কি যেন ভেবে নিলে—তারপর রাস্তায় নেমে পড়লো।

আষাঢ় মাস এখনো পড়েনি, তবু এরই মধ্যে দুচার পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে ধূলো ওড়ার জের কমেছে, একটানা দুঃসহ গরমের অত্যাচারও যেন একটু প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু পথ হাঁটলে ঘাম ত' কমে না। দোকান থেকে প্রায় আধ মাইল কি তার একটু বেশী দূর হবে রবীনবাবুর বাসা, তবে ট্রাম-বাসের পথ নয়, এ পথে হয় রিক্সায় যেতে হবে না হয় পায়ে চলতে হবে। রিক্সায় যাওয়ার মধ্যে একটা বিলাসিতা আছে। বিকাল গড়িয়ে গেছে, সূর্য আকাশ পরিক্রমা শেষ করে পশ্চিম দিগন্তের সর্বত্র আশ্চর্য বর্ণবিভংগের আবির ছড়িয়েছেন, নীলাভ আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে বর্ণচ্ছটা কি অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত হয়েছে, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে দিতে মাইলখানেক পথ হেঁটে যেতে তার কোনো কষ্ট হবে না, কিন্তু যদি এই পথে একা রিক্সায় বসে যায়—মনটা তার কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠবে। হেঁটেই সে যেতে সুরু করলো।

তবু রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের পাশ দিয়ে যেতেই একজন রিক্সাওয়ালা এমন অনুনয়ের সুরে তাকে ছেঁকে ধরলে আইয়ে মাইজী, আইয়ে মাইজী, বলে, পাখি আর তার অনুরোধ এড়িয়ে যেতে পারল না। কিন্তু রিক্সায় উঠলেই যত রাজ্যের ভাবনা তার মনে এসে জোটে।

আজো রবীন বাবুর বাড়ীতে বলা নেই কওয়া নেই—এমন আচমকা যাওয়া কি ঠিক হবে? রবীন বাবু মনে করবেন কি? তাঁর সদয় মিষ্টি ভদ্র ব্যবহারের মধ্যে কোন দূরের ইংগিত কি পাখি দেখতে পেয়েছে নাকি—যাতে বাড়া বয়ে সে চলেছে অন্তরের অভিনন্দন জানাবার জন্যে?

আর রবীনবাবুর পত্নীই বা ভাববেন কি? তিনি কি বিবাহিতা নাকি? বিবাহিতা নিশ্চিত, নইলে অমন ধীর স্থির নিশ্চিন্ত চাহনি হয় কারো? রবীনবাবুর স্ত্রী যদি কলুষিত কিছু ভেবে বসেন?

রিক্সাওয়ালার ডাকে চমক ভাঙলো—মাইজী কিধার জায়গী, সিধা য়্যা ডাইনা?

পাখিই বা তার কি জানে? রিক্সাকে থামাতে বলে পাশের দোকানের একজনের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিলে ডাইনে রাস্তায় শেষের দোতলা বাড়ীটিই রবীন্দ্রনাথ চৌধুরীর—যার বইয়ের দোকান আছে কালীঘাটে। হ্যাঁ ওই বাড়ীই।

বাড়ীতে ঢোকার আগে পাখি রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ মুছে নিলে, ইতস্ততঃ ছড়ানো কাপড়টা ঠিক করে নিলে, কপালে উড়ে আসা চুলগুলিও হাত দিয়ে যথাসম্ভব সরিয়ে দিয়ে নীচু শব্দ করে কড়া নাড়ল।

কিন্তু কোনো শব্দ নেই, একটু অপেক্ষা করে আবার কড়া নাড়ল—এবার অপেক্ষাকৃত জোরে, কিন্তু তবুও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না। মিনিট খানেক অপেক্ষা করেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না কারুর—তখন পাখি ঠিক করলে ফিরেই যাবে। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হতো—ঠিক এই বাড়ীটাই রবীনবাবুর কিনা। কিন্তু গণেশের দেওয়া ঠিকানার সংগে মিলে ত' যাচ্ছে এই বাড়ীর নম্বর। ভেতর থেকে খিল-আঁটা দরজা, অথচ কারুর সাড়া নেই। দোতলা থেকে রাস্তায় পাখিকে আসতে দেখে কি রবীনবাবু চুপ করে গেলেন নাকি?

আর একবার জোরে কড়া নেড়ে পাখি একটুখানি অপেক্ষা করলে, কিন্তু পাশের বাড়ির খিল খুলে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন—কাকে চাও বাছা, অনেকক্ষণ থেকে খড় খড় করছো দেখছি।

নরম সুরে পাখি বললে—আচ্ছা, এখানে কি রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী থাকেন—এই বাড়ীতে?

হ্যাঁ। তা তোমার কি চোখ অন্ধ নাকি? মাথার কাছে কলিং বেল

রয়েছে—টেপ· না বাপু, কড়া নেড়ে পাড়াশুদ্ধ মাৎ করছো কেন? বলে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সত্যিই ত', পাখির মাথার ওপর দরজার ডান দিকের ওপরের কোণে কলিং বেলের বোতাম একটা রয়েছে! পাখি বোতামটি টিপে দিলে।

মিনিট খানেক পরে একজন নার্স নীচে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কাকে চান আপনি? রবীনবাবু মানে রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী কি এই বাসায় থাকেন? অত্যন্ত সংকোচ ও শংকাজড়িত কণ্ঠে পাখি জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ—তিনি থাকেন এ বাসায়—নার্সটি জবাব দিলে—তিনি ত' খুব অসুস্থ!

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পাখি জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে?

নার্সটি পাখির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললে—আপনি কোথা থেকে আসছেন? আর আপনার দরকার কি যদি জানান,—আসুন না ভেতরে, এই ঘরে বসুন আমি ওঁকে গিয়ে আপনার কথা জানাচ্ছি।

পাখি সংকুচিত হলো—যদি বেশীরকম অসুস্থ থাকেন, থাক আজ, আমি না হয় পরে একদিন এসে দেখা করে যাবো'খন। আপনি শুধু বলবেন যে পাখি এসেছিল দেখা করতে।

আপনি না হয় একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ওঁকে খবরটা দিচ্ছি। আগের চেয়ে এখন উনি অনেকটা সুস্থ, বোধহয় দেখা করতেও পারেন। —বলে নার্সটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সামনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

পাখি চুপ করে বসে রইলো, রবীনবাবু কি ভাববেন? আচ্ছা, রবীনবাবুর স্ত্রী যদি থাকেন, তবে নার্স কেন বাড়িতে? কি অসুখ হলো যে বাড়িতে লোক দেখা করতে এলেও অনুমতি চাইতে হয়?

দোতলার বারান্দা থেকে নার্সটি পাখিকে ডেকে বললো—আপনি দয়া করে এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসুন। উনি আপনাকে ডাকছেন।

পাখি কি রকম যেন হতচকিত হয়ে গিয়েছিল, তবু আঁকাবাঁকা পদক্ষেপে নিজেকে সামলে নিয়ে ওপরে উঠে গেল। নার্স টি তাকে রবীনবাবুর ঘরে পৌঁছে দিল।

অত্যন্ত পরিষ্কার বিছানার ওপরে পাৎলা একটা চাদরে ঢাকা অবস্থায় রবীনবাবু শায়িত ছিলেন। তিনি নার্সকে লক্ষ্য করে বললেন —ডলি, একটা চেয়ার এনে এ কে বসতে দাও।

পাখি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে প্রথমে রবীনবাবুকে পরে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে, পরে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে— নমস্কার !

ইসারায় রবীনবাবুও প্রতিনমস্কার জানালেন। ডলি ততক্ষণে চেয়ার নিয়ে এসেছে, রবীনবাবুর সামনা সামনি চেয়ারে বসে পাখি লক্ষ্য করলে—রবীনবাবু কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন, কপালে কুঞ্চন দেখা দিয়াছে, কথার মধ্যে বা অংগ সঞ্চালনে কি স্পষ্ট দুর্বলতা।

ঘরের দিকে তাকিয়ে পাখির খুব সুন্দর লাগলো। কত মনোরম করে, কত পরিপাটি করে সাজানো ঘরটি। বেশ বড় চৌকো ঘর। কারুকার্য খচিত খাট, খাটে কত মোটা গদি, কি অপূর্ব ফর্সা চাদর পাতা, রবীনবাবুর গায়ে চাদর, তাও কত সুন্দর, কত ফর্সা। খাটের ঠিক ওপরে দেওয়ালে একটা হরিণের মাথা শিং শুদ্ধ রয়েছে, কি অদ্ভুত দেখতে। ঘরের একদিকে বুককেশ, কত দামী দামী, সুন্দর সুন্দর চামড়ায় বাঁধানো বই থাকে থাকে সাজানো। তার পাশে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটা গদি আঁটা হাতলওয়ালা চেয়ার। দেওয়ালে বিলিতি শিল্পীর আঁকা ছবি। রঙ করা ঘর। শিলিংয়ে নিঃশব্দে একটা বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে। জানালায় জানালায় আকাশী রঙের পর্দা ঝোলানো, পর্দার ওপরে নীচে কাঁচা হলুদের মতো রঙে কি অপূর্ব চিত্রবিচিত্র অংকন। পাখির মনে হলো সে যেন স্বর্গে এসেছে। জীবনে সে এরকম পরিষ্কার সাজানো ঘর দেখেছে বলে স্মরণ হলো না। কোলকাতার সব মানুষ এই রকম ভাবে বাস করে নাকি ?

রবীনবাবু বললেন—হঠাৎ কি মনে করে, পাখি? কেমন আছো?

পাখি ঘরের পরিবেশ থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে রবীনবাবুর রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে, তারপর বললে—আমি ত আছি ভালো। আপনি এখন কেমন আছেন বলুন?

জবাব দিলে ডলি—রবীনবাবুর মাথার কাছ-বরাবর সে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন উনি ভালই আছেন, তবে ডাক্তার রেস্ট নিতে বলেছেন।

পাখি বললে—আপনার যে অসুখ আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি; আজ অনেক কষ্ট করে দোকান থেকে ঠিকানা জেনে এসেছি। কি হয়েছিল আপনার?

রবীনবাবু আর ডলির চোখাচোখি হ'লো একবার, তারপর রবীন বাবু বললেন—এবার শিকার থেকে ফিরে বুঝলাম ব্যাধি ঢুকেছে। ভারি শক্ত অসুখ, প্লুরিসি। মাসখানেক ভুগে উঠলাম।

আমি এসেছিলাম দোকানে—আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে, শুনলাম আপনি বাড়ীতে আছেন, দোকানে এখন কিছুদিন ধরে যাচ্ছেন না বা আর কিছুদিন যাবেনও না, তাই একরকম জোর করে বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে এসেছি; আমি ত জানি না আপনার অসুখ। এখানে এসে ওঁর মুখে শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। আপনি যে এবারেও শিকারে গিছলেন শুনিনি! গত দু বছর গেছেন, জানতাম। এবারের খবর পাইনি।

এদের দুজনের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে ডলি বলে উঠলো—আপনার ওভালটিন খাবার সময় হয়েছে, আমি রেডি করি গে—

রবীনবাবু বললেন—ডলি, অমনি পাখির জন্যে এক কাপ চা করে এনো, আর যা হোক কিছু খাবার।

পাখি বাধা দিয়ে বলে উঠলো—না, না, মিস্টার চৌধুরী, আমি কিছু খাবো না, শুধু এক গেলাস জল পেলেই আমার চলবে।

কিন্তু আমার যে চলবে না, পাখি। অতিথিকে কিছু না খাওয়ালে গেরস্থের অকল্যাণ হবে! রবীনবাবু বললেন।

গেরস্থের যে কোনো লক্ষণ দেখছি না মিষ্টার চৌধুরী—বলে পাখি এদিক ওদিক তাকালে। ডলি ততক্ষণ চলে গেছে অন্য ঘরে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

পাখির কথা শুনে রবীনবাবুর মুখ বিষাদে মলিন হয়ে উঠলো; হঠাৎ যেন কে বিষণ্ণতার একটি চাবুক কষিয়ে দিলে তার চোখে মুখে, মনে প্রাণে। অত্যন্ত কাতরভাবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—চিহ্ন একদা ছিল, আজ আর তা নেই। বছর দুই হলো আমার সংসার অন্ধকার হয়েছে, তোমাদের মিসেস চৌধুরী মারা গেছেন।

কথাটা বোকার মতো বলে ফেলে আর তার এই জবাব শুনে পাখি নিজেও কম ব্যথিত হলো না। রবীনবাবুর মনে তা হলে একটা গভীর বেদনা স্রোত এখনো বহমান রয়েছে। পাখি সেই বিষণ্ণতার ঘূর্ণাবর্তেই একটা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সে ত' এ সবের কিছুই জানতো না।

মুহূর্তের মধ্যে রবীনবাবু নিজের বেদনাকে জয় করে নিলেন। অন্য কথা পেড়ে পাখিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—দোকান থেকে বুঝি আমার ঠিকানা পেলে ?

ডলি জল নিয়ে এল পাৎলা সরু একটি কাঁচের গ্লাসে করে,—একটা বিচিত্র চিত্র-লাঞ্ছিত প্লেটের ওপর গ্লাসটি বসানো, আর গ্লাসের ওপর বোধহয় প্লাস্টিকের তৈরী সৌখীন ছোট্ট একটি থালা চাপা।

রবীনবাবুর প্রশ্নের জবার দেবার আগেই পাখি ডলির হাত থেকে জলের গেলাসটা ধরলে। ডলি বললে—এই নিন জল, চা খাবার আনছি ভাই।

জল দেবার কায়দাটা ভারী ভালো লাগলো পাখির, ওঘর থেকে এঘরে জল নিয়ে এসেছে এক গ্লাস—কিন্তু তার মধ্যে কত না সন্তর্পণ, কত না যত্ন, কত না সৌজন্যের বিনীত স্বীকৃতি।

জলে চুমুক দিয়ে দেখলো কি সাংঘাতিক রকম ঠাণ্ডা জল, পাখি

জিজ্ঞাসা করলো রবীনবাবুকে—বরফ দেওয়া জল বুঝি, এত ঠাণ্ডা—

কেন ঠাণ্ডা জল পছন্দ করো না? এই গরমে ঠাণ্ডা জলই ত' ভালো। ফ্রিজিডেয়ারে রাখা জল, বরফ টরফ দেওয়া নয়।—রবীনবাবু পাখির মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসলেন।

ফ্রিজিডেয়ার যে কী—তা পাখির ধারণায় এলো না, কিন্তু মুখ ফুটে তা জিজ্ঞাসাও করতে বাধলো। সে নীরবে জলটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

রবীনবাবু বললেন—বোধহয় ফ্রিজিডেয়ারের ব্যাপারটা বুঝলে না—কেমন না? সব জিনিষ পত্র ঠাণ্ডা করে রাখার একটা বিরাট যন্ত্র, যাবার আগে ওই ঘরে গিয়ে দেখে এসো—ডলির সংগে।

খাবার দাবার এল। ছোট দুটো হাফ বয়েল করা ডিম, পাৎলা একটা স্যাণ্ডউইচ, আর তাল শাঁস সন্দেশ একটা,—আধ গেলাস ওভালটীন। রবীনবাবুর সন্ধ্যাকালীন আহার। কয়েক টুকুরো পেঁপে, সন্দেশ, একটা সাণ্ডউইচ, কাজুবাদাম আর এক কাপ কোল্ড কফি—পাখির জন্যে এল। ডলিরও ঐ পাখির মতো ব্যবস্থা। তিন জনে আহার পর্ব শেষ করে উঠলো।

এই রকম শান্ত নির্জন পরিবেশে এমন ধারা রুচিকর খাদ্য-সম্ভার সে আর কখনো খায়নি! রবীনবাবুর বাড়ীতে এসে যেন একটা নতুন জগতের খোঁজ পেলে। দেশ গাঁয়ে সে জীবন ধারণ করেছে এক রকম করে, কোলকাতা মহানগরীতে এসে সমিতির শৃঙ্খলার মধ্যে তার আরেক জীবন। সেখানে অভাব নেই, দুবেলা দুমুঠো খাবার বা সামান্য ধরণের একখানা শাড়ি পড়ে কাটাবার কষ্ট হয়তো নেই, কিন্তু রবীন বাবুর এখানে এই স্বর্গের আশীর্বাদপূত এমন স্নিগ্ধ সুখময় জীবন-চেতনা নেই, এমন মুক্ত সুস্থ আবহাওয়া নেই। এই ভাবেও ত মানুষ বাঁচতে পারে।

পাখি রবীনবাবুর খুব কাছে চেয়ারখানা টেনে বসলো। বহু রকমে বহুবার চেষ্টা করেও পাখি রবীনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে।ক

মাথাটা একটু টিপে দিতে পারলো না—মনের ইচ্ছাকে শোভনতার বেড়াজালে বেঁধেই রাখতে হলো দেখে সে নিজেকে খুব কুণ্ঠিত মনে করলো।

রবীনবাবু কেমনভাবে যেন তাকিয়ে ছিলেন পাখির দিকে, পাখির মনের কষ্ট তিনি বুঝতে পেরেছেন কি না কে জানে ;—তবে এটা ঠিক পাখি তার ইচ্ছাকে দুটি চোখে প্রতিফলিত করে মূর্ত করে তুলতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।

রবীনবাবু মুখর হয়ে উঠলেন। দোকানের কথা থেকে সুরু করে বর্তমান কোলকাতা সহর এবং সেখানকার জীবন-যাত্রা, এমন কি স্ত্রী স্বাধীনতার গুণাগুণ বিচার পর্যন্ত সুরু হলো।

অবশেষে ডলি রবীনবাবুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন—আপনি আজ বড্ড বেশী কথা বলছেন মিষ্টার চৌধুরী। ডাক্তারের নিষেধবাণী আশা করি স্মরণ রাখবেন।

লজ্জিত হলো পাখি। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলো।

রবীনবাবু ইশারায় তাকে বসতে বললেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—ডাক্তারের সব নিষেধ শুনলে মানুষের পাগল হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। তুমি বসো পাখি। কতদিন তোমার সংগে দেখা নেই।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, আজ যাই, আবার একদিন আসবো। কেমন? চলি ভাই ডলি। আপনার সংগেও আলাপ হলো—এটা আমার বাড়তি লাভ। নমস্কার!—পাখি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তর তর করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ছেয়ে গেছে ঘন হয়ে, কিন্তু সহরের সন্ধ্যাকে কেমন যেন পরাধীন মনে হয় পাখির। এখানে ওখানে আলো জ্বলছে, রাস্তায় দোকানের আলো, সাইনবোর্ডের আলো, পথের মোড়ে নীল বাতির জোরালো আলো—সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঠেলে সরিয়ে

দেবার চেষ্টা হচ্ছে যেন। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যেই সন্ধ্যার রূপ, সেই অন্ধকারকেই যারা তাড়াতে চায়—তারা সন্ধ্যার আত্মীয় নয়, রাত্রিকে তারা চেনে না।

নীচের পথ থেকে যেন আগুনের তাপ উঠছে একটা। গ্রীষ্মের শেষেও কোলকাতায় গরম যায় না। পথের হাওয়া কেমন যেন গুমট, অথচ রবীন বাবুর ঘরটি কত স্নিগ্ধ, শান্ত, কত নির্মল, পরিচ্ছন্ন।

একটা কথা ভেবে পাখিব ভারি দুঃখ আব বেদনা বোধ হচ্ছিল। সে কেন রবীনবাবুর সংসারের কথা তুলতে গেল, তাঁর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করতে গেল? অসুখ শুনে সে কেন অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সংগে. রবীন বাবুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে না? বোধহয় কোনোরকম বিসদৃশ দেখাতো না। সব যেন কি রকম হয়ে গেল, মানুষ ভাবে এক, হয়ে যায় আরেক।

দিন তিনেক পবে আবার পাখিকে দেখা গেল রবীনবাবুর বাড়ীতে। ডলি নেই। একটা আরাম কেদারায় শায়িত অবস্থায় ববীনবাবু পাখার নীচে বিশ্রাম করছিলেন। ডান পাশে ছোট, গোল তেপায়া টেবিলে একটি বই ওল্টানো বয়েছে।

সদর দরজা খোলা থাকায় সেদিন আর কলিং বেল টেপার দরকার হয়নি, সটান দোতলায় উঠে গিয়ে পাখি রবীনবাবুর ঘরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ভেতরে আসতে পারি?

কে? পাখি? আরে—এসো, এসো। হঠাৎ যে—

বারে—আসতে নেই বুঝি? আজ কেমন আছেন? শয্যা ছেড়ে যে উঠে পড়েছেন!

অনুমতি হয়েছে ডাক্তারবাবুর। আসছে সপ্তাহ থেকে ত' ভাবছি দোকানে বের হবো।

এরই মধ্যে দোকানে বেরবেন কেন? আরো কিছুদিন বিশ্রাম নিন।

ঘরে শুয়ে থাকলে কি আমাদের দোকানদারের চলে ?

তা বলে শরীরটা নষ্ট করবেন ? না, তা হবে না, সম্পূর্ণ না সেরে উঠে আপনি কিছুতেই বেরোতে পারবেন না। পাখির কণ্ঠে আব্দারের সুর বাজলো।

রবীনবাবু বললেন—জোর করছো পাখি ?

খুব নরম হয়ে এল পাখি, বেদনাহত কোমল কণ্ঠে সে বলল—না, না, জোর নয়, অনুরোধ।

অনুরোধ কেন পাখি, না হয় জোরই করলে।—বলে রবীনবাবু একটু হাসলেন।

পাখি বরাবর লক্ষ্য করে এসেছে যে যখনই রবীনবাবু হাসেন—তখনই সেই হাসির জৌলুস কেমন যেন ম্লান হয়ে ওঠে, বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া নিষ্প্রভ হাসির আড়ালে যেন কি একটা বেদনা ঝরে পড়ছে।

পাখি কোমল সুরে বললে—আপনাকে একটা খবর দেবার জন্যে এসেছি, আমি পাশ করে গেছি।

পাশ করে গেছ—গুড্। কিন্তু আমাদের খাবার কই ? খাওয়াও একদিন, শুভ সংবাদ কি শুধু দিতে আছে ? রবীনবাবু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

পাখি খুব লজ্জিত হয়ে উঠলো, সে ভেবেছে অসুস্থ রবীনবাবুর জন্যে কিছু ফলমূল কিনে আনবে, শুধু হাতে রোগীকে দেখতে আসার কোনো মানে হয় না, অন্তত রবীনবাবুর মতো একজন অতি নিকট আত্মীয়কল্প শুভাকাংখীর মত রোগীকে, তার ওপর রবীনবাবুর এই ঠাট্টা বা আব্দার যেন পাখীকে আরো পীড়িত করে তুললো, লজ্জিত করে তুললো।

কত কষ্ট করে যে সে ট্রাম বাসের সামান্য দু'চার আনা পয়সা সংগ্রহ করে রেখেছিল, তার ইতিহাস ত' কেউ জানে না। হাতে দু' গাছা চুড়ি ছিল—বিক্রী করতে হয়েছে। ললিতা ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফির টাকা ক'টা ধার দিয়েই খালাস হয়েছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার ক'দিনের রাহা-

খরচের জন্যে পাখি তার শেষ সম্বল কানের দুটো ঝুমকো বিক্রী করে বসেছে। সেই সময়কার কিছু অবশেষ, আনা চোদ্দ পনেরোর মত আছে এখনো—তাই দিয়েই চলছে।

পাখি তবুও যথাসম্ভব সহজভাবে বললে—খাওয়াবো একদিন, নিশ্চয়ই খাওয়াবো। আপনি আগে সম্পূর্ণ সেরে উঠুন, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবো—যা খেতে চান।

যা খেতে চাই? সহজ সংহত সুরে রবীনবাবু বললেন—বেশ তাই হবে।

অবশ্য আমার হাতে খেতে আপনার যদি আপত্তি না থাকে,—পাখি সংকুচিত হয়ে জানালে।

কেন? তুমি কি মুচি না চাঁড়াল? না মুসলমান?—যে ঘেন্না করবো তোমাকে?

একটুখানি বিচলিত হল পাখি, কিন্তু দ্রুততায় সেই বিচলিত ভাব কাটিয়ে নিতান্ত সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি বুঝি চণ্ডাল বা মুসলমানকে মানুষ বলে গণ্য করেন না? ঘেন্না করেন তাদের?

হোটেল রেস্টুরেণ্টে খাওয়া লোক আমি, মুসলমানের হাতে রান্না না খেলে আমার চলেই না,—চণ্ডালেও আপত্তি নেই। ওটা কথার কথা, এমনি বললাম।

ও—বলে পাখি চুপ করে রইল।

এমন সময় ডলি এসে হাজির। নার্সেস ইউনিয়নে গিয়েছিল সে, সেখানে কি একটা জরুরী মিটিং ছিল।

রবীনবাবু বললেন—তোমাদের মিটিং শেষ হলো ডলি?

হ্যাঁ—বলে ডলি পাখার তলায় এসে দাঁড়ালো। মাথার ঘাম তার দু'রগ বেয়ে কপোল দেশকে ভিজিয়ে দিয়েছে। বাইরের তুলনায় ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা।

ঐ মোড়াটা টেনে এনে বসো এখানে, একটু ঠাণ্ডা হও—তারপর এক কাপ চা খাওয়াও পাখিকে, পাখি পাশ করেছে।

শুনে ডলি কিন্তু খুব খুশি হলো, বেশী আলাপ নেই পাখির সংগে, তবু স্বল্প দু' একটি কথার মধ্যে দিয়েই যেন পাখিকে সে ভালবেসেছে। সে বললে—এইবার ত' ভাই ছাড়া হবে না, আমাদের মিষ্টি কোথায়?

পাখির লজ্জাকরুণ মুখ দেখে ডলি নিজেকে সংশোধন করে বলে চললো—কলেজে কিন্তু পড়া চাই, আই-এ, বি-এ, এম-এ পাশ করা চাই। আমার পড়া হয়নি বেশী দূর, আই-এ পরীক্ষায় ফেল করেই ক্ষান্ত দিয়েছি।

ডলির সংগে পাখিও সেই সন্ধ্যায় রবীনবাবুর জন্যে চা, খাবার তৈরী করতে গেল। সব ব্যবস্থা কেমন আলাদা ধরণের, এই রকম জীবন-ধারণ পদ্ধতি ত' সে দেখেনি কখনো। নারকোলের ছোবড়া কেটে শুকিয়ে নিয়ে কিংবা ঘুঁটে জ্বেলে উনুন ধরাতে সে জানে, ইলেট্রিক প্লাগ লাগিয়ে উনুনের সংগে তার পরিচয় এই প্রথম। ধোঁয়া নেই, বাজে কোন সাজ সরঞ্জামের বালাই নেই—অথচ চমৎকার রান্না হয় ত'! ফ্রিজিডেয়ার খুলে ঠাণ্ডা খাবার দাবার বের হলো, হাতের কাছে কলের জল, পাশেই জল বের হবার পাইপ! পাখির যেন কেমন মাথা ঘুরে গেল! রূপকথার আজব দেশের গল্প কাহিনীর মতো সব ব্যবস্থা!

ডলি বললে—আমিও যখন প্রথম গ্রাম থেকে সহরে আসি ভাই, আমারও এমন দশা হয়েছিল, ট্রাম দেখে ত' অবাক। এত লোকজন, ছুটোছুটি, দোকানপাট সব কিছুই আমাকে অভিভূত করেছিল প্রথমটা। কিন্তু এখন আর করে না, বুঝেছি সহরের জীবনে এই হচ্চে স্বাভাবিক। তোমাকে ভাই সহর যতটা ধাক্কা না দিক, সহরের সহজ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা দেখেই তুমি চমকে উঠেছো, এসব বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞান আমাদের জীবনকে খুঁশি করবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু গরীব মানুষদের কাছে সেই দানের আশীর্বাদ এখনো পৌঁছয় নি।

অন্যদিনের মতো চা খাবার খেয়েই কিন্তু পাখি উঠতে চাইলো না। ডলির সংগে সে কয়েকটা কথা বলতে চায়।

ডলি বললে—আমার সংগে তোমার আবার কি কথা, পাখি?

অনেকদিন থেকেই বলবো বলবো মনে করে আসি—কিন্তু সুযোগ হয় না, ফিরে যাই। শুধু যে রবীনবাবুকে দেখতে আসি—সে কথা ভেবো না, তোমার সংগে আলাপ করারও একটা উদ্দেশ্য থাকে।

সে আমার সৌভাগ্য।—ডলি একটু হেসে বললে। কিন্তু কি কথা—তা ত' এখনো শোনা হলো না।

একটু ইতস্ততঃ করে পাখি ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—জানো ত' ভাই, আমি একটা সমিতিতে পড়ে আছি, সেখানে থেকে বেরোতে চাই। নিজের পায়ের জোরে—যাতে দাঁড়াতে পারি—তার কোনো ব্যবস্থা করার জন্যেই তোমাকে অনুরোধ করছি। আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দাও। তোমাদের মতো নার্সের কাজও যদি দাও আমাকে—আমি তা পারবো।

আজকাল নার্সের কাজও এমনি পাওয়া যায় না, ওর জন্যে আলাদা পাশ দিতে হয়।

দাওনা আমাকে সে ব্যবস্থা করে—আমি পাশ দেব।

সে ত' সংগে সংগে হবে না। ওতে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার চেয়ে যদি অফিস-টফিসে কোনো কাজ জোটাতে পারো—মাইনেও ভালো, খাটুনিও কম। ম্যাট্রিক পাশ করেছো যখন—তখন এ লাইনে কেন ভাই আসবে।—ডলি উপদেশ দিলে যেন।

কাজ? কোথায় পাবো কাজ? অফিস কোথাও যে আমার চেনা জানা নেই। সরলভাবে পাখি জানালে।

চেনা জানা ত' এমনি হয় না, চেনা করে নিতে হয়। তাছাড়া খবরের কাগজে রোজ ওয়ান্টেড্ কলম দেখে দরখাস্ত ছাড়ো—কোথাও না কোথাও একটা লেগে যেতে পারে।

অফিস ত' পুরুষদের জন্যে।

না, আজ আর সে কথা বলা চলে না। মেয়েরাও আজ বেশ চান্স পাচ্ছে। পুরুষদের সংগে সমানভাবেই প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে।

তুমিও সে প্রতিযোগিতায় এন্‌ট্রি করো, দৌড় লাগাও, বাজী জেতো। বাঁচতে পাবে। যদি না পারো, পথ দেখো, সরে পড়ো। আজকাল কতকটা এই রকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডলির জবাবটা পাখিকে বিদ্ধ করে তোলে। পুরুষের সংগে পাল্লা দেবার কথাই যখন উঠলো—তখন সে প্রত্যুত্তরে কি বলবে? সে ত' চায়নি মেয়ে হয়ে জন্মে পুরুষের সংগে পাল্লা দিতে, চেয়েছিল স্বামীপুত্র-ঘেরা ছোট্ট একটি সংসারকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। সহরও সে চায়নি। পল্লীর নিভৃত নিরালায় বনজংগলের পাশে আশস্যাওড়া কাঁটা ঝোপ রাঙচিতার ডাল দিয়ে বেড়া দেওয়া ছোট্ট পরিসরের একটি গৃহস্থ জীবনের জন্যেই লালায়িত ছিল। সবুজ ভেলভেটের গ্রাম। কচি কলাপাতা রঙের টিয়ে হয়তো ডেকে যাবে খড়ের চালের ওপর দিয়ে, বাঁশের আগল টপকে পরের গরু কি ছাগল এসে উঠোনের কোণে বুনে-রাখা পুঁইয়ের চারা খেয়ে যাবে আর ব্যস্ত হয়ে হেট হেট করে পাখি তাড়াতে যাবে সেই গরু কি ছাগলকে। স্বামী কর্মক্লান্ত শরীরটাকে টেনে রোয়াকে তুলে দেবে—হাত পাখা নিয়ে বাতাস করবে পাখি, বাঁশ বনের বাতাসের শব্দ ভেসে আসবে, মনে হবে বুঝি কার গান ভেসে আসছে। বন তুলসীর গাছকে ভুল হবে শিউলীর চারা বলে, ঘেঁটু ফুলের সুরভি ভেসে আসবে আশপাশের ঝোপ থেকে—এই জীবনই সে চেয়েছিল কল্পনায়। আজও ত' সে স্বামী চায়, পুত্র চায়! একটি পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়ে, বউ হয়ে, মা হয়ে, বাঙ্গালী সংসারের সমস্ত আনন্দ-দুঃখ-বেদনাকে সে বহন করতে চায়।

একটু ভেবে পাখি বললে—প্রতিযোগিতাকে আমি ভয় করি, তাই এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু যদি প্রতিযোগিতায় নামতেই হয়—তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ডলি সস্নেহে বললে—বোন বলে ডেকেছো যখন তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। এত ভাববার কি আছে?

না ভাবছি না। বলে পাখি উঠে দাঁড়াল। ওপরে রবীনবাবুর

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডলিকে আবার চাকরীর কথা বলে সে পথে বার হলো।

খুব বেশী রাত হয়নি বটে, কিন্তু অন্ধকারটা জেঁকে বসেছে। খুব ধীরে ধীরে একটানা বাতাসের একটা রেশ রয়েছে বাইরে, ওপরে আকাশে মিটমিট করে জ্বলছে দু চারটে তারা। চারিদিকে থমথমে ভাব। সে যে রবীনবাবুর বাড়ীতে বিকেল আর সন্ধ্যাটা কাটিয়ে এল—সহরের সমস্ত লোক যেন সেই ব্যাপারটির পর্যালোচনা করে খুশি হতে পারছে না—এমনই গম্ভীর চাল যেন সর্বত্র ফুটে উঠেছে। দরজা খুলে রাস্তায় বের হতেই সামনের দর্জির দোকানের ছেলেটা অমন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকালো কেন পাখির দিকে? কলের ধারে উঁচু একটা রোয়াকে গ্যাসের আলোয় ক'জন প্রৌঢ় দাবা খেলছিল—দাবার চাল না ভেবে তার দিকে একযোগে সকলে হাঁ করে তাকাল কেন? কি নোংরা চাহনি ওদের! না—রবীনবাবুর বাসায় ঘন ঘন আসা যাওয়া করতে পারা যাবে না—পাখিই সকলের দৃষ্টিগোচর লক্ষ্য বস্তু! এই সব লোকের দৃষ্টিতে আজ নিজেকে এমন অপরাধী মনে করছে—মা বসুন্ধরার কোলে প্রবিষ্ট হলেই যেন তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়! অথচ বাঁচতে হলে এই জাতীয় পুরুষদের সংগে একই প্রতিযোগিতায় নেমে পাল্লা দিতে হবে—বাঁচার জন্যে জীবন ভোগের জন্যে। পাখির সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। এক একবার সে কিছু গ্রাহ্য করে না, আবার এক একবার কমনীয় নমনীয় নারীত্বের স্নেহরসে বিগলিত হয়ে পড়ে।

সাত

গেনুমাসি পাখিরই কাছ থেকে খবরটা জানলেন যে পাখি নার্সের কাজের জন্যে চেষ্টায় ঘুরছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে কোন একটা উপায় পেলেই সে এই সমিতি ছেড়ে চলে যেতে পারে। নিজে ত' সে তাহলে খুসি হবেই—এমনকি গেনুমাসিরও খুসি হওয়ার কথা। কেননা তিনিই ত' সর্বদা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কথা ব্যক্ত করেন।

মুখে যাই বলুন না কেন—মনে মনে তিনি খুসি হতে পারেন না। লোকের কল্যাণ হোক—এ তিনি যে চান না, এমন কথা তাঁর পরম শত্রুও রটনা করতে পারবে না, কিন্তু সেই কল্যাণ তাঁর দ্বারা যেন করিয়ে নেওয়া হয়। গেনুমাসিকে বাদ দিয়ে কোনো উটকো মংগল হয়েছে কারুর—তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। গেনুমাসির সাহায্যে পাখির কাজ হোক—তিনি দশজনের কাছে বুক বাজিয়ে ঘোষণা করে বেড়াবেন। অন্যের সাহায্যে পাখি বিপদ উৎরেছে—এটা তাঁর প্রাণে বাজে। তিনি ত' স্পষ্টই বলেন—যে হাঁড়ির ভাত আমি খেতে পেলাম না—তা কুকুরে খাক। যে কল্যেণের পুরুত আমি হতে পারি না,—তা জাহান্নামে যাক।

গেনুমাসি একটু দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পাখি যদি সত্যিই কোনো কাজ নিয়ে চলে যায়—তা হলে তপেনবাবুর শীকার ফস্কাবে। বেশ মোটা রেস্ত বাজী আছে অশ্বিনীবাবুর সংগে, সেটাও যাবে। তাছাড়া আগাম যে টাকা খেয়ে বসে আছেন—তা যদি ফেরৎ দিতে হয়? তপেনবাবুর কাছে দৌড়তে লাগলেন ঘন ঘন।—এর একটা বিহিত করতে হবে।

তপেনবাবু বললেন—সে কি! এ ত' হতে পারে না। মাঝ গাঙে যে ভরাডুবির দাখিল হলো।

গেনুমাসির অসহায়তার সুরে বললেন—কিন্তু তীরে যে একে আনতেই হলে তপেনবাবু।

যদি তীরের কাছে এসেও তরী ডোবে—তাহলেও ত ওই একই হাল গেনুদি। সে শ্রমটুকু আর গোড়ায় করি কেন?

কিন্তু তীরে এসে তরী ডুবলে যে উপায় থাকে তপেনবাবু, লাফিয়ে তীরে উঠে নিরাপদ হওয়া যাবে। তাই ভাবছি যে কোন রকমেই হোক, ছুঁড়িটাকে ত' হাত ছাড়া করা যায় না। আপনি ওর একটা ব্যবস্থা করুন না।

কি করা যায় বলো ত' দিদি?

ছুঁড়িটা বিয়ের নামে পাগল। এমন কেউ নেই পাখিকে একটু ভুলিয়ে রাখতে পারে, অন্ততঃ বিয়ে করছি বলে, কদিন আশায় আশায় টেনে ধরতে পারে?

গেনুমাসি উত্তরের জন্যে তপেনবাবু দিকে তাকালেন। তপেনবাবুর গেনুমাসির প্রশ্নে আদৌ বিহ্বল হলেন না, বরঞ্চ গেনুমাসিকে দেখতে লাগলেন, পরে বললেন—তোমার বয়স গড়ালে কি হবে দিদি, এখনো যদি সাজগোজ করে একবার চোখ তুলে তাকাও আমাদের দিকে, সব কাজ ভুলে যাবো।

যাক—আর ন্যাকামি করতে হবে না—দিন দিন আপনার ভীমরতি ধরেছে।

ভীমরতি নয় গেনুদি—মাইরি বলছি। এই ধর না—এখন যা আপনাকে দেখাচ্ছে—

ধ্যেৎ—বলে গেনুদি মদিরভাবে তাকালেন তপেনবাবুর দিকে। তপেনবাবু নেশা করেছেন বলে মনে হলো, নইলে এমন মৌতাতে তিনি গেনুমাসিকে রঙীন দেখেছেন।

গেনুমাসির মারফৎ অশ্বিনীবাবু তপেনবাবুর মতিভ্রমের কথা শুনে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। এসে বললেন—তপেন, ব্রাদার, তুমি কিন্তু বুঝছোনা, গেনুমাসির সম্পর্কে তোমার মনোভাবটা ঠিক হয়নি।

রেখে দাও তোমার গেনুমাসি—চিরটাকাল যে করে পয়সা উপায় করেছে—তা আর জানতে বাকী নেই; শেষ বয়সে এদের একটু শিক্ষা দিতে হবে। তাই আর কি—

সে কি। এ যে ভূতের মুখে রাম নাম।

বরং রামের মুখে ভূতের নাম বলতে পারো। আমি বদ মেজাজের মানুষ, নেশাভাঙও করি, পুলিশকে লুকিয়ে ভালোটা মন্দটা কাজ করে বেড়াই; কিন্তু বাইরে সাধু সেজে বেড়াই না। গেনুদা যে মেয়েদের আড়কাঠি—সেটা কেন সে স্বীকার করে না। আমার ত' তাই রাগ। তাছাড়া নেশার ঘোরে যদি একটু ভালই লাগে ওকে—

গেনু মাসিকে হাতে রাখা ত' গেনু মাসির জন্যে নয়, ব্রাদার, পাখি পুষতে গেলে—

পাখির কথা বলো না। পাখিকে আমি চিনতে পেরেছি। ভুয়ো নীতির মুখোস এঁটে চলার মেয়ে সে নয়, কিন্তু দুটো পয়সার জন্যে চোখে সুর্মা এঁকে হেসে কথাও বলতে আসবে না কখনো। তবু ও আমার কাছে ধরা দিয়েছে।

ব্র্যাভো, ব্র্যাভো—ব্রাদার। কিন্তু ঘটনাটা কি আনুপূর্বিক শুনতে পারি?—অশ্বিনীবাবু আনন্দ-ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে তপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জানবে—তবে সময় হলে। আমের মুকুল ধরা থেকে সুরু করে পেকে ফলে রূপ পেতে কিছু সময়ের দরকার—আগে পাখি আমার খাঁচায় ধরা পড়ুক—তখন সব কিছুই জানতে পারবে।—বিজ্ঞজনোচিত ঔদাসীন্য নিয়েই যেন তপেনবাবু কথা কটা বললেন।

অশ্বিনীবাবু অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—তবু যদি একটু জানতে পারতাম—

তপেনবাবু ঈষৎ তাকালেন অশ্বিনীবাবুর দিকে; কেমন যেন কড়া বিদ্রূপের আঘাত করা সেই দৃষ্টি; বললেন—কেন তুমি জানতে চাও বলতে পারো?

না, মানে এমনিই ; মেয়েটা হাজার হোক আমাদেরই ত'। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

মায়া? তপেনবাবু আশ্বিনীবাবুর কণ্ঠস্বরকে নকল করে উচ্চারণ করে বলে উঠলেন—মায়া পড়ে গেছে—না অশ্বিনী?

হঠাৎ যেন তুমি সাধু সাধু ব্যবহার করছো ব্রাদার—কি ব্যাপার? পাখির প্রেমে পড়েছো নাকি?

তপেনবাবু শুধু অশ্বিনীবাবুর দিকে তাকালেন।

আমিও পড়েছিলাম ব্রাদার ; ওই দুটো টানা চোখের একটা মাদকতা আছে, পাখির দেহের একটা নেশা আছে—কিন্তু ওই আগুনে ঝাঁপ দিও না, পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

না, ঝাঁপ দিতে চাই না—তেমন বোকা আমাকে ভেবো না, তবে এও ঠিক ওকে নিয়ে তোমরা যে অর্থ উপায়ের পথ খুঁজবে—সেটাও হতে দেব না।

অর্থাৎ?

আজ এখন ঠিক বলতে পারি না অশ্বিনী, আর এক সময় এসো, এ বিষয়ে তোমার সংগে বিস্তারিত পরামর্শ করতে হবে। গেনুদিকেও এনো ; বলো তপেনের ঘাড়ের ভূত নেমেছে, এখন আর ওর ভয় নেই। ওকেও দরকার একবার।—বলে তপেনবাবু উঠে পড়লেন। অশ্বিনীবাবুও বেরিয়ে পড়লেন পথে।

পাখির সংগেই দেখা করতে হবে তপেনবাবুর—তাই তাঁকে বের হতে হলো। অশ্বিনীবাবু ব্যাপারটা জানতে পারলেন না, তিনি সেজন্যে সোজা সমিতিতে ফিরলেন। পাখি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মাঠে তপেনবাবুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—এ আর অশ্বিনীবাবু জানতে পারলেন না। কিন্তু পাখিকে নিয়ে তপেনবাবু যে একটা কিছু করবেন—এ সম্পর্কে তার আর কোনো সংশয় রইলো না। কিন্তু সেই একটা কিছু কি—তা আবিষ্কার করার জন্যেও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পাখির সংগে তপেনবাবুর দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হয়। তপেনবাবু ইংগিত করেছেন—পাখিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন সমাজে। পাখি অনেকটা সহজে একেবারে কাছে এসেছে তপেনবাবুর। এখানে সেখানে দেখা করায় আর কোনো বাধা নেই। আজ যে ভিক্টোরিয়ায় এসে দাঁড়াবার কথা আছে—পাখি ঠিক সে কথা রাখার জন্যে আসবে—তপেনবাবু তা জানেন—তাই তিনি উঠে গেলেন।

সারা দুপুর পাখি তপেনবাবুর কথা ভেবেছে, নিজের সম্পর্কেও ভেবেছে। কি আছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে? তার মনটা খাঁ খাঁ করছে—অসীম শূন্য আকাশের মতই ফাঁকা। কেউ নেই তাকে কাছে ডেকে আদর করে, স্নেহস্পর্শে আদর জানায়। সে লতিয়ে উঠতে চায়—একটা অবলম্বন হলে বেড়ে উঠতে পারে। গৃহকপোতীর মতো তার মনটা নীড় বাঁধবার জন্যে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। ললিতা কত সুন্দরভাবে পতিত জীবন থেকে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে গুটিয়ে নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে গিয়ে উঠেছে, কোথা থেকে কোথায় উঠে গিয়ে সে আবার নারীত্বের আস্বাদে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পেরেছে।

পাখিও তাই চায়। সে ঘর বাঁধতে চায়। ঘর করতে চায়, স্বামীর কর্তৃত্বের মধ্যে বাঁধা পড়ে থেকে নিজেকে গড়ে তুলতে চায়। তার স্বামী চাই। ললিতা সে সমস্যার সহজ সমাধান করে নিতে পেরেছে, সেও তাই চায়। স্বামীকে বেঁধে রাখার জন্যে চাই বিয়ে; বিয়েকে স্থায়ী করার জন্যে চাই ঘর, পুত্রকন্যা। সব মেয়ের মনেই বোধ হয় এই রূপ। কিন্তু গেনুমাসি তবে ঘর-বর ছেলে-মেয়ে ছেড়ে সমিতিতে আশ্রয় নেন কেন? বিশ্রী পথে টাকা উপায় করে দুঃস্থ সংসারের অভাব দূর করার জন্যে? নারী জীবনের মধ্যে গেনুমাসি ব্যতিক্রম। ললিতা, কামিনী—এমন কি ডলি—সবাই ঘর চায়, বর চায়।—এই রকম কত কি এলোমেলো ভেবে মনটা ভারী করে ফেলেছে পাখি।

তবু বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে আসার সময় মনকে

হাল্কা আর খুসী করার জন্যে একটু সাজগোজ করার চেষ্টা করলে পাখি।

স্নো পাউডারের বালাই ছিল না। ললিতা চলে যাবার পর থেকে সে আর পাউডার মাখে নি,—আজ যেন পাউডারের অভাবটা বড় মনে হলো। মনে হলো কপালে ছোট্ট একটা টিপ আঁকে। চৌকো গলা আকাশী রংএর ব্লাউজটা পরে—কিন্তু ঐ জামাটির সংগে মানানসই কোনো শাড়ী নেই বলেই সে ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হলো। কুঁচি দিয়ে যে কতদিন কাপড় পরে নি সে !

কিন্তু দরিদ্র মেয়ের যে সাধ শোভা পায় না। তাই সাধারণ বেশেই আসতে হয়েছে। আর এসেছে সে একটু আগেই। তপেনবাবু সম্পর্কে তার যেন কেমনধারা মোহ জেগে উঠেছে। কোন্ একটা মনের মানুষকে সে বোধহয় আবিষ্কার করতে পেরেছে তপেনবাবুর মধ্যে। তাই সে তপেনবাবুর সামনে নিজের রিক্ত রূপ পরিমার্জনা করতে চায়, সুন্দর সাজতে চায়।

নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু আগেই এসে পড়েছে পাখি। ঘড়িরও একটা দরকার থাকতে পারে মেয়েদের—সে কথা তার এই প্রথম মনে পড়লো। সময়নিষ্ঠা মেয়েদের ত' বিলাস নয়।

.... নির্দিষ্ট জায়গায় এসে তপেনবাবুকে পাওয়া গেল না। পাখি এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো। কি রকম মনে হচ্ছে ওর। একটি নির্দিষ্ট লোকের জন্যে সে আজ অপেক্ষমান হয়ে গোপনে কাতর হচ্ছে। জীবনের গতি বিচিত্র—পাখি ত' কখনো এমন করে নিজের বিচিত্র জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে নি।

তপেনবাবুর দেখা পাওয়া গেল। অন্যদিনের চেয়ে ভদ্রলোক যে একটু বিশেষ সাজগোজ না করেছেন—এমন নয়। সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, তার তলায় ফুট ফুট গেঞ্জি। পরিচ্ছন্ন ধুতি পায়ের পাতা পর্যন্ত ডুবে গেছে। মসৃণ চকচকে জুতো। চোখে দামী চশমা। পাঞ্জাবীর হাতা কি সুন্দর করে কোঁচানো। ব্যাকব্রাস চুল ছাঁটা।

দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ। কি রকম আশ্চর্য আর কি রকম সুন্দর মনে হতে লাগলো তপেনবাবুকে; বিভিন্ন পরিধানে এই একই পুরুষকে কত অন্য রকম দেখায়। লুব্ধ, ধূর্ত শয়তান বলেও পাখির মনে হয়েছিল এক দিন এই তপেনবাবুকে।

সেদিন গেনুমাসির হাতে টাকা দিতে দেখেছিল সে, হয়তো পাখির সান্নিধ্যলাভের ঘুষ কিম্বা পারিশ্রমিক। সেদিনের চাহনির মধ্যে পাখিও দেখেছিল তপেনবাবুর এক ক্ষুধার্ত শয়তানী মূর্তি—হয়তো তার ভুল হতে পারে। কিন্তু আজ আর সে-বিচারের নিরিখ প্রয়োগ করা চলে না।

তপেনবাবুকে এখন তার ভালই লাগে। পাখি ত' বলেই যে—ওঁর দয়াতেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পেরেছি, আই, এ ক্লাশে ভর্তি হতে পেরেছি। তাছাড়া—

তপেনবাবু কাছে এগিয়ে এলেন। একটু হেসে বললেন—কতক্ষণ এসেছো পাখি? চলো ওদিকটায় গিয়ে বসি—একটু ফাঁকা জায়গায়।

ফাঁকা জায়গায় সরে এসে খুব কাছাকাছি বসলো দুজন। পাখি মাঠের ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিল, তপেনবাবু চুপ করে ছিলেন।

অবশেষে পাখিই কথা বললে প্রথম—কি ভাবছেন?

না, এমন কিছু নয়। তোমার বিষয়েই ভাবছি।

আমার বিষয়? সে কি? পাখির চোখে এক জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো।

চিনি না শুনি না কোথা থেকে তোমার সংগে জড়িয়ে গেলাম বলো ত? এখন কি করি তাই ভাবছি।

কি আবার করবেন?

আচ্ছা পাখি, আজো তুমি সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারলে না—আমাকে কেন এত দূরে সরিয়ে রেখেছো?

অর্থাৎ—মহারাজের বক্তব্য ধরতে পারলাম না।

পাখি ইদানীং তপেনবাবুকে মাঝে মাঝে খুসি হয়ে মহারাজ বলে ডাকতো।

তুমি ত' আজো আপনিত্বের বেড়ার ওপারে রাখলে। তুমির আগল খুলে দিতে পারলে কই?

ও—এই কথা? পাখি একটুখানি হাসল ঠোঁট টিপে। শ্যামশ্রী দুটি ঠোঁটে, তার উপর দিনাবসানের সায়ং প্রভা সেই শ্যামলতাকে সজীব করে দিল। তপেনবাবু সে হাসি দেখে পাগল হয়ে গেলেন। মদির ভাবে শুধু উচ্চারণ করলেন—পাখি!

সংকোচ কাটিয়ে পাখিও আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে জবাব দিলে—বলো।

এই ত চাই। পাখি—জীবনে আমিও বড় হতভাগ্য, নানা ঝড় ঝাপটায় মানুষ, একটু সান্ত্বনা—একটু আদর, একটু সোহাগের বড় কাঙাল।—পাখির দিকে চাইলেন তপেনবাবু, কেমন যেন দুষ্টু দৃষ্টি হেনে।

পাখি আশ্চর্য হয়ে গেল। তপেনবাবু চাইছেন—তাব সোহাগ! এ কি বিড়ম্বনা? যে নারী গোটা পৃথিবীব বিনিময়ে, জীবনেব সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়ে একটি মাত্র পুরুষের স্নেহ-প্রেম যাচ্ঞা করে এসেছে—তার কাছে তারই বাঞ্ছিত বল্লভ এমন ভাবে অনুনযের মধ্যে করুণার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসেছে। পাখি চমকে উঠলো! এযে বিশ্বাসের বাইরে। অভিনয় করছেন না তো তপেনবাবু? পাখিকে আরো বিপদে ফেলার জন্যে, আরো দূরে ঠেলে দেবাব জন্যে?—জীবন-পাগল একটি সরল মেয়েকে ঝানু চরিত্রের ঘুঘু তপেনবাবু খেলার পুতুল মনে করেছেন নাকি?

কাঙাল আমিও। পাখি বলতে লাগলো—আমিও সংসার চাই, স্বামী চাই। একটা অবলম্বন চাই, দাঁড়াবার একটা আশ্রয় চাই। কতটুকুই বা আমার জীবন—তার মধ্যে কত বৈচিত্র্যই না দেখলাম। কত মানুষের সংস্পর্শে এলাম। কিন্তু যখন থেকে তোমাকে দেখলাম—

বাধা দিয়ে তপেনবাবু বললেন—আমার কথা থাক না পাখি, তোমার জীবনের অধ্যায়টুকুই আজ হোক।

মুখস্থ হয়ে গেছে আমার—বার বার নানান জনের কাছে আউড়ে

আউড়ে কিন্তু তোমাকে শোনানোর যে আলাদা একটা উদ্দেশ্য আছে।

দম নিয়ে পাখি আবার সুরু করলে—যখন তোমাকে দেখলাম প্রথম, সত্যিকথা বলতে কি, একসংগে তোমাকে নিয়ে আমার ভয় আর ভাবনা সুরু হয়ে গেল।

ভয় আর ভাবনা? একসংগে—সে কি? তপেনবাবু ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন।

ভয় হবে না? কি বলো তুমি? চেনা নেই, জানা নেই—এরকম একজনের সংগে আলাপ হলো আর আলাপ হলো এক বিচিত্র চরিত্রের মেয়ে-লোকের সাহায্যে—গেনুমাসীর মাধ্যমে, এবং প্রথম আলাপের দিন দেখলাম যে গেনুমাসি পুরস্কৃত হলেন—ভয় হলো, কোথায় আনা হলো আমাকে, কার সংগেই বা আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো।

সে ভয় আশা করি ভেঙেছে।

বলার দরকার আছে কি? ভয়ের সংগে ভাবনাও মেশানো ছিল। যদি সত্যিই গেনুমাসি আমার কল্যাণ করার জন্যে তোমার হাতে আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন—তা হলে ভাবনা হলো তোমাকে ধরেই আমি উঠি না কেন? তাই তোমার সুখ-দুঃখ, কল্যাণ-অকল্যাণ, আনন্দ-বেদনা—সব কিছুকে নিজের বলেই ভাবতে শিখলাম। তোমাকে কেন্দ্র করে আমি জীবনের অন্য এক সাধনায় দীক্ষা নিলাম।

তপেনবাবু অলক্ষ্যে চমকে উঠলেন, মেয়েটা বলে কি? পাখিকে তার মন্দ লাগে নি। তবু নিজের সুখ সুবিধার জন্যে, নিজের মোহ নিবৃত্তির জন্যে, নারীর রূপ সৌন্দর্য উপভোগের জন্যে পাখিকে তিনি কাছে টানেন নি। তা তিনি জানেন। সমাজের গোপন পথে তাঁর বিচরণ। চুরি ডাকাতি প্রকাশ্যে করেন না, নারী নিয়ে ব্যবসায়ও তাঁর কাজ নয়, কিন্তু রাহাজানির আবিষ্কর্তা হিসেবে গুণ্ডামহলে জোচ্চরদের কাছে তাঁর কিছু খ্যাতি আছে। নিজেও বহু ব্যাপারে বহু অভিনব পন্থা বাৎলে দিয়ে থাকেন—এবং সেই জন্যে কিছু মোটা অংকের পারিশ্রমিক আসে—যা তার বর্তমান কালে উপজীব্য।

পাখিকে কাছে টেনেছেন অন্য এক গূঢ় প্রয়োজনে, কোন্ এক নিভৃত উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। কিন্তু প্রেমের ছলাকলার মাধ্যমে এই মেয়েটির মন জয় করতে হয়—নইলে ত' সে ধরা দেবে না। পাখি টাকা চাক—তপেনবাবু দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সমগ্র জীবনের একনিষ্ঠ সাধনার বিনিময়ে পাখি তপেনবাবুকে জয় করতে চায়।

এই একাগ্র সাধনার ক্ষেত্রে তপেনবাবু মিথ্যে প্রেমিকের অভিনয়ে পাখির অন্তরকে কি করে ফাঁকি দেবে? এই তপস্যাকে চূর্ণ করবে কি করে, ভস্মীভূত করবে কোন প্রাণে?

কিন্তু যে তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে দাঁড়িয়েছে—তার জন্যে এই নিষ্ঠা অপচয়, পাখি।—তপেনবাবু অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন।

নিষ্ঠা দিয়ে জয় করবো—আমার শুধু এ বাসনা নয়। আমি যে তাকে ধরে রাখতে চাই, আমার করে নিতে চাই। স্বার্থপর মেয়ের মতো সকলের চোখের ওপর থেকে আড়াল করতে চাই।

কেন এ সংশয় পাখি? যে স্বেচ্ছায় তোমার প্রেমের আশ্রয়ে নীড় বাঁধতে চায়—সে কি অন্য কোথাও চলে যাবার জন্যে ইচ্ছুক?

আমি যে শুধু হারাবার বরাত করে এসেছি। জমিয়ে রেখে, ধীরে ধীরে তা ব্যবহার করবো—সে কপাল ত' করে আসিনি—তপেন-বাবুর দুটি হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে পাখি কথা কটি বলে চুপ করলো। তপেনবাবু বললেন—কি দেখছো অমন করে, আমার চোখের দিকে চেয়ে? বাঁ চোখের ভুরুর তলায় এই কাটা দাগটা দেখছো? শান্ত ছেলে ছিলাম ছোট বয়সে,—এ তারই চিহ্ন।

না, না—তা দেখিনি আমি, পাখি লজ্জিত হয়ে বললে, এমনি দেখছিলাম তোমায়, ভাল করে।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। চারিদিকে অন্ধকার থম থম করছে। দূরে পিচের পথে আলো জ্বলছে। দমকা এলোমেলো হাওয়া বইছে —সেই হাওয়ায় পাখির বিস্রস্ত চুল এলোমেলো উড়তে লাগলো। কপালে গালে অর্ধবৃত্তাকারে বুকে এসে পড়ে, দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। নতুন শোভনদৃশ্য সমৃদ্ধ দোতলা বাড়ির ছাদে উঠে-যাওয়া পাতাবাহারের গাছে বসন্তের মাতন লাগার মতো এ যেন চঞ্চল খেলা।

তপেনবাবু চিন্তিত হলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য থেকে কি পাখি তাকে সরিয়ে আনবে নাকি?

কি ভাবছো তুমি? পাখি প্রশ্ন করে।

কি যে ভাবছি—আর কি যে ভাবছি না—পাখি, আজ ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন যেন ছন্দ পতনের মতো সব গোলমেলে ঠেকছে। আজ নয়, আর একদিন সব খুলে বলবো। বলবো, তোমাকে সবই বলবো।—চল, আজ উঠি। তপেনবাবু কেমনধারা ত্বরিত গতিতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

পাখিকেও উঠতে হলো। একটা গোড়ের বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে পাখি ফিরে এল—সেই সন্ধ্যাটাকে স্মরণীয় করার জন্যে।

॥ আট ॥

মনটা খুসিতে ভরপুর ছিল পাখির। রেডিওয় শেখা একটা গানের আরম্ভটুকু সে গুণ গুণ করে ভাঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। ললিতা নেই—নিজের মনের এই রোমাণ্টিক উজ্জ্বল দীপ্তিটুকুর প্রকাশ নিয়ে কেই বা তাকে ঠাট্টা করবে, কেই বা দুটো কথা শুনে যাবে?

ধীরে ধীরে নিজের মনকে পাখি বিশ্লেষণ করতে বসে। তপেন-বাবুকে সে ভালইবেসে ফেলেছে। সে চায় তপোনবাবুকে ঘিরে নিজের মনের সমস্ত সাধ আহ্লাদকে পূর্ণ করে নিতে। দিন দিন তার কাঙালপণা যেন বাড়ছে।

প্রেমে পড়লে শুধু হয় না—নতুন প্রেমের লক্ষণ হলো তার গতি, প্রকৃতি, বিন্যাস—যত বেশীবার বেশী লোকের কাছে রঙীন করে ব্যক্ত করা যায়—ততই আনন্দ জমে ভালো। পাখি স্পষ্ট করে আজ তা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

গেনুমাসিকে এ সব বলা চলে না; বিশেষ করে ডুলির সাহায্যে একটা নার্সিং বা ঐ জাতীয় কোনো কাজের জোগাড় করার জন্যে ব্যস্ত হওয়ায় তিনি পাখির ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাই তপেনবাবুর সংগে গ্রীষ্মের একটি মধুময় সন্ধ্যা যাপনের আখ্যান তাকে শোনানো যায় না।

হঠাৎ কামিনীর কথা মনে পড়লো। এই মেয়েটি ত' একদিন তার কাছে একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিল –জীবনে সে কাকে কখনো ভালবাসে কি না। সেদিন তার উত্তর দেবার কোনো পুঁজি ছিল না—আজ ত' হয়েছে। সুতরাং খবরটা তাকে দেওয়া যায়!

কামিনীর ঘরে গিয়ে পাখি কড়া নাড়লে। ভেতর থেকে দরজায় খিল দেওয়া রয়েছে। প্রথমটা কোনো সাড়াশব্দ নেই। পাখি জোরেই কড়া নাড়লে—এমন অসময়ে ত' কামিনী ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

একটু পরে পাখির মনে হলো ঘরের মধ্যে গুণ গুণ ধ্বনি যেন শোনা যাচ্ছে। কামিনীরই গলা বটে, তবে সে কাঁদছে না গান করছে বোঝা গেল না। পাখির একটু কৌতূহলও হলো।

ইদানীং কামিনীর সংগে দেখা হতো কম। কামিনীও বড় একটা কথা বলতো না কারুর সংগে, পাখিরও যেটুকু উদ্বৃত্ত সময় থাকতো, তা খরচ হতো তপেনবাবুর পেছনে।

কামিনী দরজা খুলে দিলে, চোখ দুটো তার মোরগ ফুলের মতো লাল হয়ে গেছে। তাহলে কামিনী কাঁদছিল! কিন্তু কেন?

পাখি সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করলো—কামিনী, কি হয়েছে ভাই? তোকে ত' কখনো বিহ্বল হতে দেখিনি—তোর চোখে যে জল—

হতাশ, বিস্ফারিত দৃষ্টিমাখা দুটি চোখ তুলে কামিনী তাকালে পাখির দিকে। পাখি স্পষ্ট দেখতে পেলে সেই চোখ দুটিতে যেন একটা ঘোলা দৃষ্টি। পিছনের ফেলে আসা জীবনের জন্যে বেদনা ধ্বনিত না আশু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল জীবনের জন্যে আশ্বাসখচিত, তা বোঝাবার উপায় নেই।

কামিনী ইসারায় পাখিকে কাছে ডাকলে। একটু সামলে নিয়ে বললে—হঠাৎ যে, কি মনে করে পাখি?

পাখি নিজের রঙীন মনের খুসির সুরকে বিকীর্ণ করতে এসেছে, একথা বলতে পারলো না। একটুখানি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললে—এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোর গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম। তুই কাঁদছিস না গান করছিস—তা বোঝবার জন্যেই তোকে ডাকা। তোর পক্ষে দুটোই যে অস্বাভাবিক।

অল্প সুস্থ হবার পর কামিনী পাখিকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা পাখি, তুই ত' আজকাল কলেজে পড়ছিস—বলতে পারিস মেয়ে-জীবনে ভালবাসার জন্যে একজন পুরুষের দরকার, না জীবন-পথের দুর্গমতা পার হবার জন্যে সহায় হিসেবে একজন মানুষের দরকার? এর কোনটা ঠিক?

এ যে বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন, ভাই। এক কথায় কি এর জবাব হয়?

শুনতে সাংঘাতিক বটে, ভাবতে গেলে কিন্তু কিছু নয়।—কামিনী বললে।

পাখি দেখলে সে যে কারণে এখানে এসেছে—তা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কামিনীর বেদনা কি—তা জানাও তার কর্তব্য-বিশেষ, কিন্তু কামিনীকে প্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না, তাই ওকে ঘাঁটাতে আর সাহস হলো না পাখির।

পাখি নিজে এখন ত' বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারে যে প্রত্যেক মেয়ের জীবনে একজন না একজন পুরুষের প্রয়োজন হয়, যাকে ভালবেসে নারীর জীবন ধন্য হয়। মেয়ে-জীবন তখনই সার্থক, যখন সে নিঃস্বার্থভাবে একজন পুরুষেব কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু কামিনীর জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের, একটা সমস্যার কথাই যেন বেশী করে প্রাধান্য লাভ করে। নিছক ভালবাসার জন্যেই কি একজন পুরুষের সংগ দরকার, না জীবনের পথে ভয় বা বিপদকে জয় করার জন্যে তার কাছ থেকে মন্ত্রও দরকার। কামিনীব এই প্রশ্নটা একেবারে খেয়ালী মনের কথা নয়। মেয়ে পুরুষের পারস্পরিক ভালবাসা নিয়ে সুখের একটা স্বর্গ রচনা করা যায় বটে, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যদি —একে অন্যকে চালিয়ে নিতে পারে—তবেই সে স্বর্গধাম অক্ষয় হয়ে ওঠে।

হঠাৎ পাখির চোখ পড়লো—কামিনীর নাকে যেন কিসের ঘা হয়েছে, কপালেও সেই রকম ঘায়ের দাগ। একবার মনে হলো জিজ্ঞাসা করে, আবার ভয় পেয়ে গেল। কি বলতে কি জানাবে কামিনী—কে জানে?

একটু বেয়াড়াভাবে কথার মধ্যে জোর দিয়ে কামিনী বললে—পাখি, জানিনা তুই ইতিমধ্যে কাউকে ভাল বাসিস কিনা, যদি ভালবেসে থাকিস—তার থেকে নিশ্চিত ভালবাসা পেলে তবেই তোর হাতের মুঠো খুলবি, নইলে কিছুতেই মাথা নোয়াবি না মিষ্টি কথার কাছে, কপট

প্রেমের অভিনয়ের কাছে। বুঝলি? তাহলে তোকে আর ঠকতে হবে না?

অশ্বিনীবাবু কামিনীকে বিদেয় করে দিয়েছেন—এই রকম একটা কথা পাখি শুনেছিল বটে। তাই কি আজ কামিনী এ কথা বলছে?

এ কথা কেন বলছিস ভাই? পাখি জিজ্ঞাসা করলে।

প্রত্যুত্তরে কামিনী ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা ব্যক্ত করলে—যার নায়ক হচ্ছেন অশ্বিনীবাবু। কোথায় কেমন করে মেয়ে ধরার ফাঁদ পেতে বসে আছেন তিনি, এখানে ওখানে মেয়েদের বিক্রি করার জন্যে কুচক্রী গেনুমাসির সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, বাইরে বাবু ধরে বেড়ান ওরা দুজনেই, আর বলি হয় নিরীহ মেয়েরা। কামিনী ওদের এই রকম এক বলি। আজ যে তার সারা শরীর দূষিত, সমস্ত মন কলুষিত সে যে প্রেম ভালবাসা সমস্ত স্বর্গীয় চিন্তাকে পেছনে ফেলে ইতর জীবন পথে অবতরণ করেছে—তার খবর সে ছাড়া আর ত' কেউ জানে না।

এ সব খবর শুনে পাখি স্তম্ভিত হয়ে গেল। পুরুষ মানুষের স্বার্থপর রূপের সংগে তারও যে কিছু পরিচয় নেই—তা নয়। সে নিজে কখনো ধরা দিয়েছে, কখনো ধরতে গেছে।

জীবন সংগ্রামের এক ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত সৈনিকের মতো কামিনী নারী-জীবনের এক মোক্ষম কথা ঘোষণা করে বসলো—পাখি, তোকে আজ আমার একটা অনুরোধ। জীবনে আমি যে ভুল করছি—সে ভুল যেন তুই করে বসিস নি। বিয়ে না করে কোনো পুরুষের সংগে মেলামেশা করা উচিত নয়। এইটুকু তোকে আমার আজ বলবার। আমরা পুরুষের হাতের পুতুল নই। একটা বাঁধনের মধ্যে দিয়ে না এলে তাদের সংগে মেলামেশা করা উচিত নয়। খুব সাবধানে থাকিস পাখি। তুই সরল মেয়ে—আমাদের মত ঠকিস নি যেন।

বেদনাহত হলে মানুষ উপদেশপ্রবণ হয়ে ওঠে। পাখি নীরবে সব কথাই শুনে গেল। কিন্তু মন্দ বলে নি কামিনী। নারী জীবনের চরম সার্থকতা হলো স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরকরা, যত দরিদ্র আর দুঃস্থতার

জীবনই হোক্ না সে—তবু গৃহ জীবনের স্নিগ্ধ সহজ পরিবেশের মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করতে পারাই নারীর নারীত্ব! মা হয়ে ছেলের সেবা করতে না পারলে মেয়ে জীবনের আর মাধুর্য রইলো কোথায়? কামিনী সুরটা ঠিকই ধরেছে, ঠিক কথা বলেছে। পাখির মনের একান্ত ইচ্ছাকে বাণী দিয়ে মূর্তিমতী করে তুলেছে যেন!

দরজা ঠেলে গেনুমাসি ঘরে ঢুকলেন, যেমন অবিচলিত আর মন্থর গতিতে প্রবেশ করলেন—তাতে মনে হলো যেন তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে এদের কথাবার্তা শুনছিলেন।

কি গো, কি পাঁচা হচ্ছে? পাঁচা না পরচর্চা?—গেনুমাসির প্রশ্ন হলো।

পাখি জিজ্ঞাসা করলে—পাঁচা কি মাসি?

পাঁচা বোঝ না? দু পাঁচ জনে বসে আলোচনা করলেই আমরা পাঁচা করা বলি। তা, কামিনীর সংগে কি আলোচনা হচ্ছিল?

কামিনীদির মনটা বড় খারাপ—তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম আর কি!

তা বেশ—মা। তোরাই মানুষ। এই ছাখনা—আমিও নীচের তলায় থাকি, শুনেছি কামিনীর অসুখ—কবার আর খোঁজ নিতে পারি?

এ তোমার—কি বলবো মাসি, আলস্য না অনাদর? পাখি লঘু চপলতার সংগে বললে।

মুখ টিপে গেনুমাসি একবার হাসলেন। কাপড়ের আঁচল দিয়ে সেই হাসিটুকু মুছে নিয়ে বক্রভাবে একবার পাখির দিকে আর একবার কামিনীর দিকে তাকিয়ে বেশ মোলায়েম টানা সুরে বললেন—ওরে মুখপুড়ি, এ আলস্যও না, অনাদরও না। মাণিকে মাণিক চেনে। জলে যে পদ্ম ফোটে—সেখানে ত ব্যাঙ বাস করে, আসে তার কাছে? কোথা থেকে খবর পেয়ে মধুকর ছুটে আসে, গান বাজায়, প্রাণমন ঢেলে দেয়। তোরা দুটি হলি সোমত্ত বয়সের মেয়ে; হাসবি, খেলবি, ঢলাঢলি করবি, তোদের কত খুসি, কত হাসি—তার মধ্যে ছন্দ পতনের মতো আমি কেন হাজির হতে যাবো—না?

কামিনী বললে—আমি বড় অসুস্থ মাসি, আজ কোনো তর্ক বা ঝগড়া করো না, দোহাই তোমার।

তর্ক করেন গেনুমাসি—সে কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু কখনো রাগ করেছেন তিনি—একথা তার শত্রুও কখনো বলে না। তিনি বললেন—তা আমি কি ঝগড়া নিয়েই থাকি রে? গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে বেড়াবার মতো কুশিক্ষা আমার নয়।

পাখি আর কামিনী উভয়েই পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো দেখে গেনুমাসি আর কিছু বললেন না, উভয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাখিও ওপরে উঠে গেল।

কিন্তু কামিনী কাঁদে কেন? কেন পাখির কাছে কামিনী তার অন্তরের নিগূঢ় বেদনাকে ব্যক্ত করতে পারে না—পাখি ভেবে পায় না। একদিন পাখিও অবশ্য বারুর কাছে তার নিজের জীবনকে তুলে ধরতে পারেনি, ব্যক্ত করতে পারেনি নিজের দুঃখ দুর্দশা, কিন্তু আজ যেমন সহজ হয়েছে পাখি—সকলের কাছে, ললিতা, গেনুমাসি, কামিনী, অশ্বিনীবাবু, এমন কি তপেনবাবু কি রবীনবাবুকেও, সে আজ অকপটে তার সঙ্গীত বর্ত্তমান ব্যক্ত করতে পারে,—আর কামিনীর কি এমন মর্মবেদনা যা সে একান্ত নিভৃতে পাখিকে বলতে পারে না।

মুখের সেই দাগগুলো বেড়েই উঠলো কামিনীর! পাখি সান্ত্বনা দেয়, চিকিৎসার কথা বলে। কামিনী কাতর ভাবে তাকিয়ে থাকে পাখির দিকে, অবশেষে বলে—তুই জানিস না বোন্—এ আমি কোন্ দূষিত ব্যাধিতে ভুগছি? তুই সরলপ্রাণ, জানিস না এখানকার হাল-চাল, তাই বুঝছিস না আমি কোন পাপের পথে নেমে গেছি।—কোন্ সর্বনাশের দিকে আমাকে ঠেলে দিয়েছে এরা, এই সব ভাল মানুষের মুখোস-আঁটা স্বার্থপর লোকেরা।

চিকিৎসা করাও না কেন বোন, আমি ত' চাকরী পেয়ে যাবো শীগ্‌গির ; টাকার খুব অভাব থাকবে না। যদি তোমার সংকোচ না হয়—আমি চিকিৎসার ভার নিতে পারি।

চিকিৎসা অবশ্য সুরু হয়েছে—ইন্‌জেক্‌শন নিয়েছি, দাগ মিলিয়ে যাবে শীগ্‌গির, কিন্তু রোগ অত তাড়াতাড়ি সারবে না। আমার কিছু গহনা ছিল—গেনুমাসির মারফৎ তা বাঁধা দিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছি--

অর্ধেক কথা বলে কামিনী এমন উদাস হয়ে বিস্ফারিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলে পাখির দিকে তাকিয়ে রইলো, পাখি কিছুটা ঘাবড়ে গেল, ভয় পেয়ে গেল।

পাখি ডাকলে—কামিনী, কি দেখছো ?

ও হ্যাঁ। কি বলছিলাম না,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, টাকা আমার আছে। টাকা ? টাকা আর চাই না বোন। গেনুমাসি টাকা রোজগারের পথ বাৎলে দিয়েছেন—হাঃ হাঃ হাঃ—বলে কামিনী উদ্দামভাবে হেসে উঠলো।

এ রকম একদিন নয়, বার বার কামিনীকে এই ভাবে বিস্ফারিত-দৃষ্টি বিচলিতবুদ্ধি হতে দেখেছে। পাখি ভয় পেয়ে যায়। চমকে ওঠে।

গেনুমাসি পাখিকে সতর্ক করে দেন—তোদের ভালোর জন্যেই মরি, তাই না আমার বলা। কামিনী পাগল হয়ে যাচ্ছে—ওর সংগে বেশী ঢলানি করতে যেয়ো না। তুমিও মরবে।

কি ভাষাই না গেনুমাসি ব্যবহার করেন আজকাল, এতটুকু সৌজন্য, সম্ভ্রম বা ভদ্রতা না দেখিয়েই অশিক্ষিত মনের একি উলংগ প্রকাশ ! গেনুমাসি এখনই এমন হয়েছেন না প্রথম থেকেই এমন ধারা—পাখি আজ আর তা স্মরণ করতে পারে না। তখন পাখির বোঝার ক্ষমতা ছিল না, কোলকাতার জীবনের সংগে—বিশেষ করে এই সমিতির জীবনধারার সংগে পরিচয় না থাকার জন্যে গেনুমাসিকে চিনতেও সে পারে নি। আজ জীবনের একটা সংকেত সে দেখতে পেয়েছে, নিজের

ঈপ্সিত জীবনকে সে নিজেই রচনা করে নেবার জন্যে সংগ্রাম করতে পারবে—তাই গেনুমাসির ব্যবহারকে গ্রাম্য ঠেকে, সে রুষ্ট হয়, সে পালাতে চেষ্টা করে গেনুমাসির কবল থেকে।

কিন্তু সে কথা যাক। গেনুমাসি বলেন কি? কামিনী পাগল হচ্ছে ধীরে ধীরে। আয়তাক্ষি স্নিগ্ধ আঁটো সাঁটো চেহারার শান্ত ধীর একটি মেয়ে—এই সেদিনও ঠোঁটে তার হাসি, চোখে তার প্রাণের সংকেত ছিল—সেই মেয়েটা পাগল হয়ে যাচ্ছে? পাগল হয়ে যাবার ব্যাধিই নাকি তার ঢুকেছে! কি কথা শোনালেন গেনুমাসি? পাখি চমকে ওঠে। ভীত হয়। মনের মধ্যে ছট ফট করতে থাকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে হাবুডুবু খেতে খেতে সে অধীর হয়ে ওঠে, তার হাঁফ ধরে। সে বেরিয়ে পড়ে পথে, ফাঁকা জায়গার হাওয়ায় মনটাকে একটু সুস্থ করতে চায়।

গেনু মাসি সম্পর্কে পাখির মনে একটা প্রত্যয় একটা বিশ্বাস যেন জেগেছে। এই সমিতির মেয়েদের কল্যাণ করবার ছদ্মবেশের আড়ালে নিজের অর্থ উপায়ের একটা মতলব নিহিত আছে। নইলে একটি মেয়েকে অন্য একটি মেয়ের কাছ থেকে আড়াল করে রাখেন কেন? আর অনূঢ়া তরুণীর সব গোপন খবর গোপনে রেখেও ওপরে না জানার ভাণ করেন কেন? একের সম্পর্কে অন্যকে আড়ালে কেন বলেন? ললিতা বুঝেছিল গেনুমাসির চরিত্রকে, পাখি এখন যেন একটু একটু বুঝতে পারছে! কিন্তু কত পারে! এইখানেই ললিতার সংগে পাখির তফাৎ। ললিতা তাই সমস্ত পাঁক সরিয়ে ফেলে দাঁড়াতে পেরেছে পরিষ্কার হয়ে, কাঁটা গাছ উপড়ে ফুলের চাষ করতে পেরেছে; আর পাখি এখনো ঠিক পথের হদিস পাচ্ছে না খুঁজে!

॥ নয় ॥

ডলির মাধ্যমে নয়, গেনুমাসির চেষ্টাতে তপেনবাবুর সাহায্যেই পাখির একটি চাকরি জুটেছে অফিসে। তপেনবাবু একটি চিঠি দিয়েছেন কোন্ এক ছোট্ট অফিসের বড়বাবুকে—সেখানে পাখির চাকরির ব্যবস্থা করে। কথাবার্তা হয়ে গেছে—এখন পাখি সেই অফিসে গিয়ে যোগ দিলেই হয়।

যেদিন প্রথম যাবার কথা, পাখি সংকোচ ভরে সেদিন যেতে পারলো না। তপেনবাবু খোঁজ নিয়ে জানলেন পাখি আসে নি। তিনি রাগ করলেন,—আবার টেলিফোন করে চিঠি লিখে পাখির চাকরীটা বজায় রাখলেন এবং পাখিকে ধমকে দিলেন ঠিক দিনে অফিসে যাবার জন্যে।

গেনুমাসিও পিছু লেগে থাকলেন—নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই সিঁড়িটা তুই কি করে ত্যাগ করবি মা? যা, নইলে এবার তপেনবাবু তোকে আস্ত রাখবেন না।

চাকরি করার এক একবার ইচ্ছে হয় মাসি, আবার ভাবি—যদি তপেনবাবুই আমাকে নেন, তাহলে এই পোড়া পেটে দুমুঠো ভাত কি দুবেলা দিতে পারবেন না?

তর্কের কথা সিকেয় তুলে আজ তুই যা দেখি মুখপুড়ি। যাচা অন্ন পায়ে দলতে নেই—গেনুমাসি ধমক দিয়ে উঠলেন।

শুধু গেনুমাসির ধমকে নয়, নিজের অন্তরেরও স্বল্প তাগিদ আছে। তাকে যেতে হবে অফিসে, বিচিত্র জীবন পথের মধ্যে দিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হবে—লক্ষ্য যদি স্থির থাকে—তবে সে সব বাধাই অতিক্রম করবে। চাকরী পেতে যত কাঠ খড় পোড়াতে হয়, চাকরী ছেড়ে দিতে ত' তার দেরী লাগবে না।

সেও অফিস যাবার জন্যে মন বেঁধে নিলে, সকালে উঠে তৈরী হতে লাগলো। বেশভূষার আড়ম্বর নেই—নানান্‌খানা শাড়ী ব্লাউজের বাহুল্য নেই, স্নো পাউডারের হাংগামা নেই বিশেষ। এলো করে দিলে চুল, সাদা একটি জামা পরলে—কালোপাড়ের সূতোয় দুহাতে দুটো প্রজাপতি আঁকা, কালো ভেলভেট পাড়ের একটা সাদা শাড়ী। ঘরে কাচা—ইস্ত্রি করা ছিল না—তবু পাট করে বিছানার তলায় রেখে তার ওপর কিছুক্ষণ বসে তাকে কিছুটা ভদ্র করে নিলে। রুমালে কয়েক আনা পয়সা বেঁধে নিয়ে যখন ড্যালাউসিতে এসেছে—তখন সেখানে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। কিছু আগেই এসেছে সে—জি, পি, ওর বড় ঘড়িটায় দেখা গেল—তখন প্রায় নটা বাজে-বাজে।

দেরী করার চেয়ে বরং আগে আসা অনেক ভালো—এ পাখির স্বভাব। তাছাড়া প্রথম দিনেই যদি অফিসে ঢুকতে লেট হয়, তাহলে লজ্জার শেষ থাকবে না। আর পাখিত' জানেও না অফিসটা ঠিক কোন্‌ জায়গায় পড়বে। একে তাকে জিজ্ঞাসা করে নিতেও কিছু সময় খরচ হবে।

জি, পি, ওর ধারে মিনিট দুয়েক চুপ করে দাঁড়ালো পাখি।

এ ভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে তার ভারি লজ্জা করতে লাগলো। পাখি তখন এক আধজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলো বিমানবাবুর নামের চিঠি আর ঠিকানাটা দেখিয়ে। কেউ কেউ উর্ধশ্বাসে দৌড় দেন—পাখির কথা শোনার সময় নেই তাঁদের, কেউ বা একবার দাঁড়ান। একজন পাখির হাতের চিঠিতে যে ঠিকানা লেখা রয়েছে—তা দেখে বললে—এ দিকে ত' নয়। স্টেসনারী বিল্ডিংয়ের ঠিকানা দেখছি। তার হদিস না দিয়েই সে হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে গেল।

মানুষগুলো এ রকম দৌড়চ্ছে কেন? সবাই এত বেশী ব্যস্ত? মানুষ যে ট্রেন ধরার জন্যেও এ রকম দৌড়দৌড়ি করে না।

কি করবে পাখি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? কতলোক যে তার দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে, একটু দূরে সরে গিয়ে আবার দু একজন হাঁ-করা

লোক তাকিয়ে থাকছে কিছুক্ষণ—কাছ ঘেঁসে প্রায় গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েও বা কেউ কেউ।—পাখির এ সব ভালো লাগলো না। ফিরে যাবে নাকি সে ?

আরো দু একজনকে পাখি জিজ্ঞাসা করলে, কারুর কারুর কথা থেকে সামান্য রকম যেন পথের হদিস পাওয়া গেল, ওই লম্বা লাল বাড়িটার একেবারে পূব পাশে যেতে হবে।

ভীড় জমে উঠছে এ অঞ্চলের, গরম হয়ে উঠছে ড্যালাউসি। কত লোক, মেয়ে পুরুষের কি বিরাট মিছিল! পাখি বিস্ফারিত চোখ মেলে সব দেখে। কি অদ্ভুত দ্রুততা, কি অমানুষিক ব্যস্ততা, তরুণ, যুবক, প্রৌঢ় বৃদ্ধ—বাদ ত' নেই কেউ! এত দৌড়োদৌড়ি কিসের ? না হয় দু পাঁচমিনিট দেরী হবে, এর জন্যে একি মর্মান্তিক শ্রম-স্বীকার ? এখানে সময় এই রকম মহার্ঘ নাকি !

অনেককেই জিজ্ঞাসা করতে হলো, অনেককেই খোসামোদ করতে হলো,—তবু ঠিক নির্দেশ মিললো না। অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ফিটফাট একজন যুবককে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে—আসুন আমার সংগে, আমি ত' ওই দিকেই যাবো।

যুবকটি দু তিনবার তাকালো পাখির দিকে, কি জানি কি ভাবলে সে। কেমন যেন নরম আর আলতো ভাবে কথা জুড়ে দিলে—এখানে চাকরীর জন্যে যাচ্ছেন বুঝি ? না, অন্য কোনো দরকারে ?

এ প্রশ্নের উত্তরটি পাখি এড়িয়ে গেল। কিন্তু যুবকটি নাছোড়বান্দা, আবার ঐ জাতীয় কি একটা প্রশ্ন করলে। পাখি বললে দরকার আছে। এই বিমানবাবুর সংগেই দরকার।

এ ত' দেখলাম জেনারেল অর্ডার এণ্ড সাপ্লাইয়ের অপিস,—আপনি কি কোনো জিনিস কিনতে চান ? অর্ডার দিতে চান ? আমাকে দিতে পারেন—আমাদেরও এ রকম অফিস আছে মিটার এণ্ড মিটার, আমরাও মালপত্তর সাপ্লাই করে থাকি। একটা কার্ড রেখে দিন—আমার ঠিকানা ওতে আছে।

যুবকটি একখানা কার্ড গছিয়ে দিলে পাখির হাতে, কার্ডটা দেবার সময় ইচ্ছে করেই হাতে হাত ঠেকিয়ে দিলে যুবকটি।

পাখির কেমন যেন বিশ্রী লাগলো। তবু ভদ্রতার খাতিরে কার্ড-খানা হাত বাড়িয়ে নিতে হলো। কার্ড থেকেই বোঝা গেল যুবকটির নাম অশোক মিত্র,' কোম্পানীর একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অর্ডার নিয়ে সেই অনুযায়ী জিনিস জুগিয়ে দেওয়ার অফিস।

অশোক মিত্র বললে—আমার কাছে সংকোচ করবেন না কিছু, বলুন না আপনার প্রয়োজন কি? আমরা ক'জনে ব্যবসা খুলেছি এই। যদি কোনো কাজের—

আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস্টার মিত্র, বাধা দিয়ে পাখি জানাল—আমি নিজেই চাকরীর চেষ্টায় চলেছি।

চাকরী করতে যাচ্ছেন? আপনি? পাখির সেই সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে অশোকের যেন বলতে ইচ্ছে হলো—আপনার এই চেহারা—এমন সুন্দর চোখ,—কিন্তু নীরব ভৎর্সনার একটা হল্কা যেন পাখির টানা টানা দুটো চোখকে উগ্র করে তুলেছিল, অশোক পাখির চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন থতোমতো খেয়ে গেল।

আপনার গন্তব্যস্থল এসে পড়লো এইবার—সামনের ওই মস্ত বাড়ীটাতে যান, ডাঁন দিকের সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে যাবেন সোজা, সেখানে গিয়ে কাউকে বরং জিজ্ঞাসা করবেন ৪৯২ নম্বর ঘরটা কোন্ দিকে পড়বে। আমি এখন চলি, পরে আবার হয়তো দেখা হবে, কেমন? আর—হ্যাঁ, আপনাকে একটু ঘুর পথেই নিয়ে এলাম—এ জন্যে কিছু মনে করবেন না। যখন অবশ্য পথ চিনবেন, তখন হয়তো রাগ করতে পারেন আমার ওপরে, তাই আগাম মার্জনা চেয়ে রাখলাম। এলাম একটু ঘুরে—দুটো বেশী রাস্তা ধরে—আপনার সংগে কথা বলতে বলতে—নমস্কার।

অশোক পাখিকে ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে গেল—তা দেখে পাখির কেমন যেন বিরক্তি আর ঘেন্নায় মনটা বিষিয়ে উঠলো।

এই নাকি কোলকাতার শিক্ষিত জনমণ্ডলী ? একা কোন মেয়েকে পথ চলতে দেখলে তার সংগ লাভ করার জন্যে আকুলি বিকুলি করে, ভুল পথে নিয়ে গিয়ে হয়রাণ করে, ভিক্ষে চাওয়ার ছলে অবান্তর প্রশ্ন পাড়ে! ছি ছি।

খুঁজে খুঁজে অবশ্য ৪৯২ নম্বরের ঘর বের হলো। তেতলায় নয়, ঘরটি চারতলায়। সিঁড়ির একপাশে লিফট্ আছে, পাখি সেটা লক্ষ্য করছিল, কিন্তু তাকে হয়তো লিফট্‌ম্যান অনুমতি দেবে না, কিম্বা একাই তুলে নিয়ে কিছুদূর ওপরে উঠে যাবে—এই আশংকায় সে অমানুষিক ধৈর্য আর পরিশ্রম স্বীকার করে ওপরে উঠেছে।

দশটা বেজে মিনিট বিশেক হয়েছে। এই রকম অনিবার্যভাবে দেরী হয়ে যাওয়ার জন্যে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এতে তার কিছু করার নেই। বিমানবাবুকে তার আজকের অভিজ্ঞতার কথা বললে আশা করা যায় তিনি কিছু বলবেন না। আর প্রথমদিন হিসাবে তিনি হয়তো ক্ষমাও করতে পারেন।

অফিস ঘর খোলা। দুখানা ঘরের ছোট্ট একটু ফ্ল্যাট মতো নিয়ে অফিস। সামনের ঘরে একটি কেরাণী বসে আছে, কুড়ি একুশ বছরের একটি ছেলে। তার দরজার সামনে ডান পাশে টুলে খাকি পোষাক-আঁটা একজন বেয়ারা গোছের লোক। পাখি সেখানে ঢুকেই বিমান-বাবুর কার্ডখানা বের করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এইটেই ত' এই অফিস ?

হ্যাঁ—কি চাই আপনার বলুন ?

কেরাণী ছেলেটীর টেবিলের সামনে খান দুয়েক চেয়ার ছড়ানো রয়েছে—পাখি একবার ভাবলো আগে সেখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে তারপর আসল কারণটি ব্যক্ত করে, সকাল ৯টা থেকে এই ঘণ্টা দেড়েক—তার যা পরিশ্রম গেছে, আর তার ওপর আজ আবার যে রকম

রোদের তাত। কিন্তু ছোকরা কেরাণীটি একটু সন্দিগ্ধ হয়েই ফের ওই একই প্রশ্ন করলে।

পাখি বললে—আমি বিমানবাবুর সংগে দেখা করতে চাই।

তিনি ত' এখন নেই, এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

তিনি বেরিয়ে গেলেন ? সচকিত অথচ নিরাশ কণ্ঠে পাখি প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ। আপনার কি দরকার বলুন। নির্ভয়ে আপনি বলে যেতে পারেন।

আমি তাঁর সংগেই দেখা করতে চাই। চাকরী বাকরীর ব্যাপার কিনা—

ও—। এতক্ষণে যেন ছোকরা কেরাণীটির সম্বিৎ ফিরে এল।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গতকাল সার আপনার কথা বলছিলেন বটে। তা আপনি একটু দেরী করে ফেলেছেন, উনি আপনার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে এই মাত্র গেলেন,—একটা বিশেষ কাজে। আপনি ওই ঘরে অপেক্ষা করুন। পদ্মলোচন, এঁকে ও ঘরে নিয়ে যাও, বসতে দাও।

কেন, এইখানে বসি না।

না, না,—এখানে এখন নানা রকম খদ্দেরপাতি আসবে, আপনি তার মধ্যে বসে থাকতে পারবেন না। এই পাশেই সারের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন না।

পদ্মলোচন পাখিকে পাশের ঘরে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘর একটাই—তবে কাঠের পার্টিশন দিয়ে দুটো করা হয়েছে। লম্বা একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ওপরের সমস্ত অংশটুকু কাঁচে মোড়া। স্টিলের ছোট্ট একটা আলমারি, অন্যদিকে জাম রঙের ঝকঝকে পালিশের একটা কাঠের র‍্যাক, র‍্যাকের তাকে তাকে ফাইল সাজানো। টেবিলের ওপরে এক পাশে বেতের চৌকো ঝুড়িতে সাজানো গোছানো কতকগুলি কাগজপত্র, ডানদিকে গোল চামড়ার ওপর একটি লালচে কাঁচের গেলাস,

ওপরে প্লাস্টিকের ঢাকনায় মুখ বন্ধ করা, একগ্লাস জল টলটল করছে তার মধ্যে। কয়েকটা কাঁচের পেপার ওয়েটের তলায় কি সব কাগজপত্র। বিমানবাবুর বসবার চেয়ারটি বেশী দামী বলেই মনে হলো, গদি আঁটা, আরামদায়কও খুব। টেবিলের এপাশে অর্থাৎ সামনে আরও খান তিনেক হাতলহীন সরু সরু চেয়ার। তারই একটা চেয়ারে বসেছে সে।

কি বিশ্রী রকমের গরম হচ্ছিল পাখির, সেই সকাল নটা থেকেই তার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, যদিও বা অফিসের খোঁজ মিললো, মালিকের দেখা মিললো না। অর্থাৎ দুর্ভোগের পালা এখনো শেষ হয় নি; তাও যা ওই কেরাণী ছেলেটার ঘরে বসতে চাইলে পাখি, কিন্তু সেখান থেকেও তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো। ও ঘরে তবু পাখা ঘুরছিল, ঘরটা বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। এখানেও পাখা রয়েছে—কিন্তু তা বন্ধ। তার ওপর জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল পাখির। সামনে টেবিলের ওপর নীলমতন ওই কাঁচের গেলাসের জলটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলে কেমন হয়? কিন্তু বিমানবাবু যদি কিছু বলেন? যদি রাগ করেন? যদি চাকরী না দেন?

ললিতা হলে ঠিক পারতো ওই জলটুকু সাবাড় করে দিতে। জলের শূন্য গেলাসের দিকে মালিকের চোখ পড়লে ললিতা আভিনয়িক কায়দায় মোলায়েম এক ঝলক হেসে হয়তো বলতো—তৃষিত চাতকের মতোই ওই জলটুকু নিঃশেষ করেছি—আশা করি কিছু মনে করবেন না। এতদূর শক্তি পাখির নেই, এইখানেও ললিতার সংগে তার তফাৎ। ললিতাই ত' এই বিদ্যে শেখাবার জন্যে কত যে আখড়াই দিয়েছে তবু পাখি হার মেনে গেছে, পারে নি শিখতে। ললিতা বলতো—হাসলে তোর গালে কি রকম টোল পড়ে; ওই রকম গর্ত যদি আমার মুখে হতো, দেখতিস বিশ্বজয় করে ফেলতাম। নিজের কাজ আদায় করার অস্ত্র হিসেবে একটু যদি হাসিস, এক আধটা মিষ্টি কথা যদি বলিস যদি বা মস্করাও করে ফেলিস দু একটা—তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

পাখি বলেছিল—আমি এখনো তা শিখিনি ললিতাদি। চেষ্টা করে দেখেছি, পারিনি। ভেবে দেখেছি—এ আমার দ্বারা হবে না। মনে এক রকম, মুখে আর এক রকম—এ আমি পারবো না ললিতেদি।

তুই মর মুখপুড়ি—বলে ললিতার সেই তিরস্কারটুকু আজো পাখির স্পষ্ট মনে পড়ে।

যেমন তেষ্টায় কষ্ট হচ্ছে, তেমনি গরমেও প্রাণ বেরিয়ে যাবার মতো হচ্ছে। কপাল বেয়ে কপোল বেয়ে দরদর করে ঘাম নামছে। ব্লাউসের গলা ভিজে গেছে। মাথার চুল দেখলে মনে হবে পাখি বুঝি সদ্যঃ স্নান করে এল। ছোট্ট রুমাল রয়েছে, সেটাও ভিজে গেছে—হাতের ঘামেই! তা দিয়ে মুখ মোছা যায় না। এদিক ওদিক তাকিয়ে পাখি শাড়ির আঁচল দিয়ে হাত মাথা মুখ একবার পরিষ্কার করে মুছে নিলে—কিন্তু শাড়ির কোনটা গেল ভিজে, পাট ভাঙা শাড়ীর ইস্ত্রি গেল কুঁচকে। পাখির মনে যেন কাঁটা ফুটলো।

পাশের ঘরের ছোকরা কেরাণীটি নিশ্চয়ই এই অফিসের লোক। কত অল্প বয়স থেকেই জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েছে সে; কথাবার্তায় ত' বেশ স্মার্ট বলেই মনে হলো, ভদ্রও বটে। তবে পদ্মলোচন বেয়ারাটি সুবিধের নয়, কেমন ভাবে তার দিকে শুধু তাকিয়ে গেল—তা নয়, ভদ্র মহিলা বসেছে এসে, সৌজন্যের খাতিরে পাখাটা একটু খুলে দিতেও কি সে পারতো না? পাখি ত' আর নিজের জন্যে প্রথম দিন এসেই মুখ ফুটে বলতে পারে না—পদ্মলোচন, পাখাটা খুলে দাও, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেলা একটা আন্দাজ বিমান এল অফিসে। অফিসে ঢোকার সময় পদ্মলোচন টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো দেখে পাখিও বিমানকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিমান পাখিকে দেখে বললে—তুমি, আই মীন তপেন পাঠিয়েছে বোধ হয়?

হ্যাঁ। খুব সংকোচ আর বিনয়ের সংগে পাখি জবাব করলে।

বসো, বসো—দাঁড়িয়েরইলে কেন? তারপর পাখির আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বিমান বললে—ঈস, ঘেমে যে একেবারে নেয়ে গেছো। তপেনের কাছ থেকে তুমি এসেছো যখন—তখন তোমাকে প্রথম থেকেই আর সৌজন্যসূচক—আপনি, মিস—এ সবের মধ্যে না গিয়ে একেবারে সরাসরি তুমিই বললাম।

ইতিমধ্যে পদ্মলোচন এসে পাখা ছেড়ে দিয়ে গেছে।

বিমান হাঁক পাড়লে—পদ্মলোচন, যাও এর হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দাও।

একটু পরে ঈষৎ ভব্য হয়ে পাখি ফিরে এল।

বিমান জিজ্ঞাসা করলে—কতক্ষণ এসেছো?

সামনের চেয়ারে বসতে বসতেই পাখি জবাব দিলে—দশটার পরই, —আমি প্রায় নটা থেকে ড্যালাউসি স্কোয়ারে ঘুরছি, কেউ আর এই অফিসের সন্ধান বলে দিতে পারে না।

কৈফিয়ৎ বিমান চায়নি; পাখিকে দেখে তার পছন্দ হয়েছে, তবে বিদ্যে বুদ্ধির দৌড় কতদূর—সেটা একটু বাজিয়ে নিতে হবে, নইলে সাপ্লাই অফিসের কাজ ত' চালাতে পারবে না। কিন্তু কি ভাবে লেখা পড়ার কথাটা তোলা যায়—তাই নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়ে গেল বিমান।

প্রথম দর্শনে পাখির বিমানকে বিশেষ ভালো লাগলো না। চেনা নেই, শোনা নেই—একেবারে প্রথম ডাকেই তুমি সম্বোধনটা যেন পাখির বুকে খচ করে গিয়ে বিঁধলো। রবীনবাবু কতদিন পরে তাকে আপনি থেকে তুমি বলতে সুরু করেছেন, সমিতির ম্যানেজার পর্যন্ত আপনি সম্বোধনের পর তুমি বলার অধিকার পেয়েছেন। খাস তপেনবাবুও প্রথম কদিন পাখিকে আপনি বলেছেন।

বিমান যেন কী রকমের। ঝড়ের মতো উদ্দাম গতিতে একেবারে ঘনিষ্ঠতার পরিমণ্ডলে জেঁকে বসতে চায়। কিম্বা, এই সব অফিসের

বড়বাবুরা এই রকমই হয়। অধিকার বিস্তারের দাবীতেই তারা আত্মীয়তা গড়ে নেয় না—এই 'তুমি' সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে দান-গ্রহীতাকে করুণা-কনা ভিক্ষা দেওয়ার প্রচ্ছন্ন দম্ভ প্রকাশ করে? অথবা কোটপ্যান্ট পরা বিমানের সাহেবি-কায়দা-দুরস্ত মনে তুমি ডাকই স্বাভাবিক?

চুপ করে বসলে কেন? কিছু বলো, তোমার কি ধরণের কাজ হলে সুবিধে হয়, কখন আসতে পারবে, কতক্ষণ থাকতে পারবে—বলো সে সব।—বিমান জানতে চাইলে বটে, কিন্তু এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলো কি একটা ফাইলের জন্যে, পাখির উত্তর শোনার কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না।

তবু পাখিকে জবাব দিতেই হয়, মালিক যখন হুকুম করেছেন—যখন বলবেন আসতে পারবো, আর যতক্ষণ প্রয়োজন হবে—থাকবো। তবে, প্রাইভেটে আই, এ, পড়ছি তাই, একটু সকাল সকাল ছুটি হলে ভালো হয়।

ও—বলে বিমান ফাইল খুঁজতে লাগলো।

পাখিও চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ।

বিমান তারপর হঠাৎ খাপছাড়াভাবে জিজ্ঞাসা করে উঠলো—চা-টা খেয়েছো?

না। আমি খেয়ে দেয়েই বেরিয়েছি নম্রভাবে পাখি জানালে।

খেয়ে দেয়ে মানে? সে ত' কোন্ সকালে—বোধ হয় আটটা-সাড়ে আটটায়। তারপর থেকে নো টী নর্ টিফিন? পদ্মলোচন—

পদ্মলোচন এসে সেলাম জানালো।

বিমান হুকুম করলে—এই মাইজীর জন্যে, আর আমার জন্যে চা, টোস্ট আর অমলেট।

পদ্মলোচন চলে গেল। বিমান আসার পর থেকে কিন্তু পদ্মলোচনের কাজকর্ম খুব তৎপরতার সংগে হচ্ছে। আগে পদ্মলোচনকে যতটা

অসভ্য মনে হয়েছিল, এখন কিন্তু ততটা খারাপ লাগছে না পাখির। মানুষের সংগে মানুষের প্রথম পরিচয়টাই যে সব নয়, আর একটা প্রমাণ বোধহয় পাওয়া গেল। পাখিও কতদিন ভেবেছে প্রথম আলাপেই বা প্রথম দর্শনেই কারুর সম্পর্কে কোনো কিছু ধারণা করে নিতে নেই। বিমানের সম্বন্ধেও হয়তো সে এমন ভুলই করতে চলেছে আর তুমি সম্বোধনের পেছনে কোনো তাৎপর্য আরোপ করে হয়তো বিচারের ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে না বসে—পাখির শুধু সেই ভয়!

ধীরে ধীরে অফিস জীবনও অভ্যস্ত হয়ে গেল পাখির। ছোকরা কেরাণীর সংগে একটু হাসি ঠাট্টার কথা পর্যন্ত বলতে বাধলো না। নির্দিষ্ট খদ্দেরদের মধ্যে যে কজন প্রতি সপ্তাহেই দু চার বার আসে—তাদের সংগেও একটু তামাসার চাতুরী চলে।

বিমান খুসি হয়, বলে—ছ্যাটস্ গুড্ পাখি।

কিন্তু কেমন ধারা কুটিল দৃষ্টি দিয়ে সে নিজে যেন পাখিকে ঘিরে রাখে। প্রথম প্রথম পাখি বাইরের ঘরে কাজ করতো, ইদানীং বিমান নিজের কামরায় তার সামনে পাখির বসার ব্যবস্থা করেছে।

বিমান হাসে পাখির দিকে চেয়ে। অধিকারের বাইরে—এমন সব কথা বার্তা বলে, অশোভন মস্করা করে—মাঝে মাঝে পাখির গা রী রী করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু আজকাল সেও যেন কেমন ধারা নিস্তেজ হয়ে গেছে, গতানুগতিক জীবন-স্রোতের ধরণটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে আর প্রতিবাদ করে না।

বিমানকে গোড়ায় যেমন ভাবা গিয়েছিল—ঠিক তেমন নয়। পাখিকে চা খাওয়ায়, এক সংগে অফিস থেকে বেরিয়ে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, যায়ও বা কখনো কখনো, এলোমেলো কথা বলে। আগে ত' পাখি ভয়েই জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়তো, এখন ধীরে ধীরে সহজ হবার চেষ্টা করে। চাকরী করতে এসে মালিককে চটানো সমীচীন কি?

॥ দশ ॥

সমিতির নিয়ম অনুসারে পাখিকে চলে আসতে হয়েছে সমিতি থেকে। কোনো চাকরী করা মেয়ে সেখানে থাকতে পারবে না, শুধু অনাথ হতভাগিনীদের জন্যেই সমিতির দরজা খোলা। তবু চাকরী জীবনের গোড়ার কয়েক মাসেব দিকে সে ছিল সমিতিতে—অশ্বিনীবাবু বলেন, সেটি দয়ায় সম্ভব হয়েছে। গেনুমাসিরও নাকি অনুরোধ ছিল পেছনে।

সমিতি ছাড়তে হবে জেনে পাখির মন দ্বিধা আর ভয়ে মুষড়ে পড়েছিল। আবার কোন্ এক নতুন খেলা? কোন এক নতুন পর্যায়?

রবীনবাবুর কাছে আশ্রয় চাইবার কথা প্রথমেই মনে হয়েছিল, কিন্তু বিপত্নীক এক যৌবনোত্তর সুপুরুষ ব্যক্তির সংগে মস্ত বড় অথচ ফাঁকা বাড়ীতে একত্রে বাস করা যায় না। আবার তাঁকে পাখির জন্যে আশ্রয় বা ডেরা খুঁজে দেবার কথা বলাও চলে না। তিনি এত ভাল মানুষ যে জোর করে তাকে তিনি নিজের বাড়ীতে এনে রাখবেন—পাখি তখন না করতে পারবে না, নিষেধ ব্যর্থ হবে।

তার চেয়ে একে তাকে ধরে একখানা ঘর কি কোনো মেসে একটা সীট জোগাড় করে নিতে হবে।

অশোক মিত্রের সংগে অনেকদিনই দেখা হয় পাখির! অশোক চেষ্টা করে পাখির সময়টা আন্দাজ করে ট্রামে উঠতে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পূব পাশে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে পাখিকে দেখে নিতে। অধ্যবসায়ের ফল ফলে কোনো দিন, কোনো দিন বা পাখি আগে চলে যায়, নয়তো পরে।

পাখি এড়িয়ে চলে অশোককে। কেমন যেন অসভ্য মনে হয়, গায়ে পড়া বলে নয়, কেমন ধারা দূষিত দৃষ্টি যেন ওর চাহনির মধ্যে ধরা পড়ে। কখনো বা বিকেলের দিকে ফেরার সময় পাকড়াও করে পাখিকে, পিছু পিছু আসে, চোখে চোখ পড়ে গেলে দেখা যায় কি করুণ কাঙালের মতো তাকিয়ে আছে, পাখির হয় হাসি পায়, না হয় কখনো কখনো গায়ে জ্বালা ধরে।

অশোক চেষ্টা করে কথা বলতে, ভাব জমাতে। সে বলে, নমস্কার। মিস—দেখুন আজো দেখা হয়ে গেল।

পাখি চুপ করে থাকে।

অফিস আসার সময় হয়তো অশোক পাখিকে লক্ষ্য করেই ভিড় বোঝাই এক ট্রাম ধরে। পাখি আড়চোখে তাকায় একবার, আবার ভয়ও করে কি জানি যেভাবে হাতল ধরে ঝুলে রয়েছে অশোক, কোনো দৈব দুর্বিপাক না ঘটে। একটুখানি মমতাও যেন হয়।

ড্যালাউসিতে নেমে অশোক যদি বা কথা বলতো—পাখি চুপ করে থাকতো। অশোক না-ছোড় বান্দার মতই লেগে থাকে, ফেরার সময় আবার দেখা করে, বলে—দেখুন জীবনের এই সড়কের সন্ধান আমিই আপনাকে প্রথমে দিই। চাকরীর হদিস দিই নি বটে, অফিস ডেরা চিনিয়ে 'দিয়েছি। অথচ সামান্য একটা ভদ্রতা বা সৌজন্য পর্যন্ত আপনি দেখান না! এতো দেমাক ভাল নয়—

দেমাকের প্রশ্ন নয়—সার, আমি ত' বেশী কথা বলতে পারি না। আপনি প্রথম দিনে যে উপকার করেছেন—তা যে কখনোই ভোলা যায় না সার। আমার আজো তা স্পষ্ট মনে আছে।

সার নই, আমার নাম অশোক মিত্র।

ও, নমস্কার, অশোক বাবু।

আমার যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

ক্ষমা? ছি ছি ছি—জিভ কেটে অশোক মিত্র বললে—ক্ষমার কথা বলছেন কি মিস—। ও হ্যাঁ, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

পাখি লঘুগতিতে এগোচ্ছিল। সন্ধ্যা নামছে, আলতো অন্ধকারের আস্তরণে ওপরের আকাশ বাতাস ঢেকে পড়ছে। পাখির মনে আছে পাখি অনুচ্চকণ্ঠে অশোককে জানিয়েছিল—আমার নাম পাখি।

পাখি? বাঃ, দিব্যি মিষ্টি নাম ত'!

এইভাবেই আলাপের সূত্রপাত। তারপর ট্রামে বাসে দেখা হলে কথা হয়েছে। অফিসের পর ছুটির সময় নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখা হয়েছে, একত্রে রেস্তোরাঁর পর্দাঘেরা কুঠরীতে চা খেয়েছে।

কিন্তু কদিন থেকে পাখি অশোককে খুঁজে বেড়াচ্ছিল যদি সে একটা আস্তানা জোগাড় করে দেয় পাখিকে। ললিতার মতো অতটা না হলেও—হেসে কাজ বাগিয়ে নেবার বিদ্যেটা কিছু কিছু রপ্ত হয়েছে পাখির। ব্যাপারটা ত' শক্ত নয় মুখ ফুটে বলতেও হবে না—শুধু একবার ইংগিত করলেই হয়—অমনি কতকগুলি পুরুষ মানুষ আছে—যারা সেই কাজটুকু করে দিয়ে ধন্য হবে।

দরকারের সময় আর অশোককে পাওয়া যায় না। একটু আগে আগে অফিসে গেছে পাখি, কোনদিন বা ঈষৎ দেরীও করেছে, কখনো বা বিকেলে, সন্ধ্যার আগে বা পরে ধর্মতলায় নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করেছে—অশোককে ধরতে পারে নি। একটা ঘরের চেষ্টা তাকে করতে হবে, অশোকের সাহায্য পেলে ব্যাপারটা সহজ হতো ভেবেই সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে।

মাঝে মাঝে গেনুমাসি খোঁজ করতেন—কি লা, ঘর পেলি। একটু চেষ্টা কর। বলিসত' আমি দেখি।

পাখি নিজেই একটা ঘর কি কোনো মেয়ে-মেসের একটা সীট খোঁজ করে নেবে এ রকম ইচ্ছা ছিল। বিশেষ করে সে গেনুমাসির সাহায্য নিয়ে মেস বা ঘর খুঁজতে বা পেতে চায় না। ধীরে ধীরে এই নারী-চরিত্র সম্পর্কে তার দৃষ্টি খুলে গেছে।

পাখি বলতো—চেষ্টা ত' করছি মাসি, দেখি কতদূর কি হয়।

গেনুমাসি হাসতেন, বলতেন—ওরে তোর সব চেষ্টা শেষ হলে আমি আছি জানবি। তোর ব্যবস্থা যে করেই রেখেছি!

পাখির গা শিউরে উঠতো, মুখে কিছু বলতো না। এই আপাত সদাশয় মহিলা করতে পারে না—এমন কোনো কাজ নেই। অতি ভালো-মানুষের মুখোস এঁটে সে যে নরকের পথে খুব সহজেই যাতায়াত করেন। তাই পাখি অশোকের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে।

কিছুদিন পরেই অশোক মিত্রের সংগে দেখা। অফিস থেকে ফেরবার সময়। দেখা হলো। অশোককে দেখে পাখি তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পাখিকে লক্ষ্য করে অশোকই বললে—নমস্কার। ভালো আছেন? অনেকদিন আপনার সংগে দেখা হয় নি।

দেখা হবে কি করে বলুন? আপনি বোধহয় ক'দিন আসেন নি অফিসে—তাই না? আকস্মিক হাসির উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করে পাখি কমনীয় কণ্ঠে জানায়।

তাজ্জব বনে যায় অশোক, হাত গুনতে জানে নাকি পাখি? ভারি আশ্চর্য ঠেকে অশোকের, সে বোম্বে গিয়েছিল অফিসের কাজে, কিন্তু পাখি তা জানলো কেমন করে। সে বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আপনি জানলেন কি করে? আপনি কি গোয়েন্দাগিরি সুরু করেছেন নাকি?

না, কদিন দেখিনি কিনা আপনাকে। পাখি জবাব দিলে।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে উন্মত্ততায় অশোকের হৃদয় নেচে উঠলো, মেঘ দেখলে ময়ূরের প্রাণ কি এর চেয়ে বেশী উদ্বেল হয় নাকি? পাখিও তা হলে তার খোঁজ রাখে? আমতা আমতা করে অশোক জানায়—মানে, আপনি তা হলে লক্ষ্য করেছেন?

হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল আপনার সংগে।

দরকার? আমার সংগে আপনার দরকার? উত্তেজনায় অশোকের কান, চোখ, নাক, মুখ লাল হয়ে ওঠে। বলুন।

চলুন না, এগোবেন ত' এদিকে, যেতে যেতেই বলি।

অশোকের হৃদয় অশান্ত হয়ে ওঠে। খুব সংযত কণ্ঠে সে বলতে চেষ্টা করলো—চলুন গড়ের মাঠের একটা নিরালা অংশে না হয় কিছুক্ষণ বসে থাকি।

দুজনে তাই গিয়ে বসে। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বহু মানুষই এই মাঠের বিরাট চত্বরে বসে রয়েছে। পাখি আর অশোকও সামনাসামনি বসলো।

পাখিই প্রথমে কথা বললে—আমাকে একটা মেস দেখে দিতে পারেন—মেয়েদের মেস? কিম্বা ছোট্ট একটা একানে ঘর? আমি থাকবো সেখানে।

অশোক যেন অনেকটা ভরসা পেয়েছে। কাছাকাছি এই সুনিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে পাখিকে পেয়ে সে যেন বিশেষভাবে আশ্বস্ত হয়ে উঠেছে, সেই রকম পরম নির্ভরতার সুরেই সে আলোচনাকে দীর্ঘতর করার জন্যে বললে—আমি আপনাকে চিনি মাত্র, পথেই আলাপ আমাদের দুজনের, কিন্তু কেউ কাউকে খুব ভালো করে জানি না। আপনার পেছনের কথা বা অতীতে জীবন সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। এ সম্পর্কে যদি দু চারটে প্রশ্নের জবাব দেন—আমি আপনার অনুরোধ রাখার কথা বিবেচনা করে দেখব।

পাখি ভাঙে তবু মচকায় না; সে বলে—ও, ভেবেছিলাম, প্রথম দিনের মতোই আমার এই উপকারটুকুও করবেন। বড্ড বেশী দাবী করে ফেলেছি অশোকবাবু—না বুঝতে পারিনি। আমি আমার অনুরোধ প্রত্যাহার করছি।

না, না, তা নয়। মানে,—আচ্ছা, আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব মেস, না হয় ঘর—দেব, নিশ্চয়ই দেব।—বলে অশোক নিজের বোকামির জন্যে লজ্জিত হয়, দুঃখিত হয়।

—তাহলে বড় উপকার হয় আমার। এজন্যে আমি আপনাকে আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখলাম। চলুন উঠি এখন।—পাখি প্রায় উঠেই দাঁড়ালো।

অগত্যা অশোককেও উঠতে হলো। তবুও সে না বলে ছাড়লো না,—দেখুন, মানে আজকের সন্ধ্যেটা বড় মধুর ঠেকছে। এখুনি আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। বসুন না আর একটু।

আজ নয়--অশোকবাবু। আমার যে পড়াশুনা রয়েছে—সামনে আই এ পরীক্ষা।

ও—একটু আহত হয়েই অশোক বল্লে—আচ্ছা বেশ, চলুন একটা রিক্সা করে ফিরি দুজনে। সামনে পর্দার আড়াল থাকবে—আপনার লজ্জার কোনো কারণ থাকবে না, আমারও নয়।

অশোক নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল, মনের নিভৃত ইচ্ছাকেও সে পাখির সামনে কি ভাবে রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারলো।

পাখি কি ভাবলো চুপ করে, তারপরে সম্মতি দিয়ে বললে—বেশ চলুন।

এত বড় কোলকাতা, জন মানবের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠা কোলকাতা। তারই মধ্যে গতিমান একটি রিক্সার স্বল্প পরিসর জায়গাটা সত্যিই ত নির্জন। অশোকের বুক কাঁপতে থাকে। সে পাখির একখানা নবনীত-কোমল হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে ধরে। পাখিও অশোকের হাতে যেন একটু চাপ দেয়। অশোক আত্মহারা হয়ে যায়। সে পাখির হাত খানিকে নিজের বুকের মধ্যে তুলে নেয়। পাখির ঠোঁটে হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়। পর্দাঢাকা অন্ধকার রিক্সার মধ্যে বসে অশোক সে হাসির ঝলক দেখতে পায় না ; সে শুধু তন্ময় হয়ে ওঠে।

উত্তরখণ্ড

॥ এক ॥

অশোকের সাহায্যে নয়, গেনুমাসির ব্যবস্থাপনাতেই তপেন পাখিকে নিজের কাছে রাখতে রাজী হলো! পাখিরও তাতে অমত নেই।

পাখি ভেবেছিল সমিতি যেদিন ছেড়ে যাবে—সেদিনটা তার কাছে খুব বেশী বেদনার মনে হবে। গ্রাম ছেড়ে এসেছে সে যখন—পিছনের জীবনের, কিশোর বয়সের সমস্ত স্মৃতিকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যখন সে এসেছে—তখন বেদনার কোনো উপলব্ধিকে মনে জাগিয়ে রাখার অবস্থা ছিল না। তাই সমিতি থেকে যাবার সময়টা পাখি কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারে নি! তখনকার বেদনাকে জাগরুক করার ব্যাকুলতা তার ছিল।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়—নিতান্ত সাধারণভাবে পাখিকে চলে আসতে হলো। অশ্বিনীবাবু শুধু মন্তব্য করলেন—এক যায় আর আসে সাগর তরংগ যথা!

যার কাছেই গেল পাখি—সবাই যেন আগে থেকেই তৈরী পাখিকে বিদায় দেবার জন্যে। মানুষ এত নিস্পৃহ, এমন নির্লিপ্তভাবে কাছের মানুষকে ছেড়ে দিতে পারে—পাখি বিস্মিত বোধ করে, ব্যথিত বোধ করে।

গেনুমাসি বললেন। যখন যেখানে বসে মানুষ, তখন সেটি ছেড়ে যাবার জন্যে কস্ট পায়। পরিমণ্ডল হলো বড় ব্যথার জিনিস। মোটরে তুই ধর বসেছিস কাৎ হয়ে, গদিতে যে খোঁদলটা হলো—তাতেই তোর আরাম হবে। সেটা ছেড়ে উঠতে তোর মন কেমন করবে। আবার অন্য রকমের ঢঙে তুই বোস—তোর চেহারার সেই ঢঙেই খোঁদল

তৈরী হবে। তাও তুই সহজে ছাড়তে পারবি না। আসলে পরিমণ্ডলটাই বড়। তুই ছিলি সমিতিতে—এক রকম ছিলি, নিজেকে এই পরিবেশে খাপ খাইয়েছিলি ; হয়তো একটু দুঃখ পাচ্ছিস। কিন্তু দেখবি যখন আবার নতুন জায়গার আস্বাদ পাবি, সেখানেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবি। আর তোর ত' অন্য ব্যাপার। তপেনবাবুর বউ হয়ে তার সংসার আলো করবি—এই আশীর্বাদই করি।

যদিও পাখি মুখে বললো—তাই করো মাসি, তাই করো,—ওঁর জীবন যেন সুখী করতে পারি, কিন্তু মনে মনে গেনুমাসির এই আশীর্বাদকে অকল্যাণের বলে ভাবলো।

·

তপেনের আশ্রয়েই পাখিকে যেতে হলো। অশোক চেষ্টা করেও ঘরের সন্ধান দিতে পারেনি,—তার উপকার করার দিকে মন যতটা না থাক, ব্যাকুল প্রেমের উত্তপ্ত আবেগকে বিকীর্ণ করার দিকেই নজর বেশী। কিন্তু তপেন সে রকমের লোক নয়। পাখিকে পড়িয়ে দিয়েছে, কলেজে ভর্তি হবার সব ব্যবস্থা করেছে। আই এ পরীক্ষা পর্যন্ত টেনে এনেছে। পাখি নিজেকে ধীরে ধীরে আলগা করে দিয়েছে তার কাছে—কিন্তু সে সংযমের কঠোর লাগাম দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কোথায় একটা মতলব আছে মনে করে পাখি সন্ত্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তার সে ভয়ও কেটেছে। তার কাছেই পাখি এক রকম আত্মসমর্পণ করেছে। সে বলেছে—আপনার বলিষ্ঠ বাহুতেই আমি আশ্রয় নিলাম। চাকরী দিয়েছেন আপনি, পড়িয়েছেন আপনি, আপনি আমাকে মুক্ত করুন। সংসার-স্বাদ চাই। আপনাকে আমার তাই বড় প্রয়োজন।

তপেন একটু হেসেছিল মনে, নিস্তেজ এক পশলা হাসি।

কত সন্ধ্যায় পাখি নিজেকে বিতত বেদনায় কাতর করে রেখেছে—তপেনের কথার প্রলেপে সেই যন্ত্রণার লাঘব ঘটাবে। সে আশা চূর্ণ হয়েছে। কখনো ভেবেছে তপেনও তার হৃদয় বেদনার ভারটা পাখির

সেবায় লাঘব করিয়ে নেবেও বা, সেজন্যে তৈরী হয়ে পাখি গেছে—তপেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আকারে ইংগিতে পাখি বুঝিয়ে দিয়েছে যে তপেনকেই সে স্বামিত্বে বরণ করতে চায়।

মেয়ে জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতা কিসে? কর্মক্লান্ত একটি পুরুষের সেবার জন্যে নিজেকে তৈরী করে রাখা—তার ছেলে মেয়েকে ঘিরে নিজের সমস্ত মাতৃত্বকে নিংড়ে বিলিয়ে দেওয়া! এই না? ব্রততী যেমন যষ্টিনির্ভর, লতানে গাছের যেমন মাচার প্রয়োজন, তেমনই মেয়েদের প্রয়োজন একটি পুরুষকে; যাকে কেন্দ্র করে সে তার হৃদয়ের সমস্ত কমনীয়তাকে উজাড় করে দেবে।

পাখি সেটা মর্মে মর্মে বুঝেছে। তাছাড়া তপেনের আস্কারাও আছে। সে-ও মদির কণ্ঠে আবেগ-উদ্বেল উত্তেজনার সংগে পাখিকে বলেছে—তোমাকে দেখার পর থেকে, তোমার কথা শোনার পর থেকে, তোমার চলার ছন্দ দেখে—তোমাকে নীরবে উপলব্ধি করার পর থেকে তোমাকেই ভালবেসে ফেলেছি। প্রেম ত' স্থান কাল পাত্র বিচার করে আসে না, প্রত্যাশার অপেক্ষাও রাখে না। তোমার মতো একটি মেয়েই আমার জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারবে, উজ্জ্বল করে তুলতে পারবে। তাই তোমাকে আমি আমার সব কিছু নিবেদন করলাম।

তপেনের নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যায়; সেই মুহূর্তে সে তার বুকের সমস্ত উত্তাপ, প্রাণের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিতে চায়। পাখির নিরুত্তর এবং লজ্জারাঙা মুখ দেখে সে আবার সুরু করে—গেনুমাসি একথা জানেন। তাকে পারিশ্রমিকও দিয়েছি খুসি করে। তিনি তোমার নীরবতা শুনে. বললেন—তপেনবাবু, ঘাবড়াবেন না। জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। এই ভাবুন না—পাখিকে পেলেন, অমনি মনটা খুসি হলো, ভাবুন পেলেন না—মনে দুঃখ পাবেন। তাহলে মনেই সব, আসলটা তত নয়। তাছাড়া মহাভারতের আদর্শটা দেখুন। একলব্য গুরুর কাছে তাড়া খেয়ে সব চেয়ে সেরা তীরন্দাজ হলো। কিছু এসে যায় না, কে কার সাধনা গ্রহণ করছে কি অবহেলা করছে।

—পাখি, একলব্যের মতো আমারও নীরব সাধনা,—দেখি সিদ্ধিলাভ হয় কিনা।

পাখির স্মৃতির ভাণ্ডারে প্রেমনিবেদনের এই কটি কথা তোলা আছে।

ধীরে ধীরে পাখিকে বিচার করতে হয়েছে, যাচাই বাছাই করতে হয়েছে। পুরুষ জাতের সম্পর্কে পাখির যে ঘৃণা গড়ে উঠছিল—সেই জুগুপ্সিত ঘৃণাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে তপেনের সম্পর্কে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

তপেন পাখিকে ভালবেসেছে কি? পাখির সন্দেহ হতো মাঝে মাঝে। তপেন প্রেমের প্রত্যর্পণ চায়নি; প্রতিদান কামনা করে না—সেই জন্যে কেমন সংশয় হয়। পাখির চলনবলনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে, দেহ লাবণ্যের স্নিগ্ধ সৌরভে তার মন প্রাণ ভরপুর হয়েছে, কিন্তু যখন ধীরে ধীরে পাখি গেছে তপেনের কাছে, ধরা দিতে গেছে তার বলিষ্ঠ বাহুর বীতংসে, তপেনের হাত নিয়ে যখন খেলা করছে পাখি, আত্ম-সমর্পণের এক ভীরু বিনীত অনুনয়ে যখন গলে পড়েছে পাখি, তপেন তখনো শুধু কথার উত্তাপের প্রেমকে জ্বালিয়ে রেখেছে। একটুও এগোয় নি। তাই সন্দেহ হয় পাখির। কত গল্প হয়, তপেন দেশ বিদেশের গল্প বলে, বড় জীবনের একটা প্রকাণ্ড ছবি স্পষ্ট করে এঁকে দেয় পাখির সামনে, কিন্তু সেই ছবি আঁকার প্রথম সূত্রটি সুরু করে না। তাই ত সংশয় জাগে।

পাখিকে নিয়ে ঘর বাঁধার আগ্রহে তপেন গৃহসজ্জায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। খাট পালংক তোষক এল। টেবিল চেয়ার আনলা এলো, তিনটি ঘরের দোতলা এক ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছে। বাহিরের ঘরের দেওয়ালে ছ ফুট লম্বা মরা একটা কুমীর লোহার চেন দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। ছোট খাটো—সব আসবাব পত্রই জামের মতো রঙ করা, বর্মাটিকের তৈরী। গদি আঁটা কুশান, বইয়ের দেরাজ, রেক্সিনে বাঁধান বই-পত্তর, আয়না আঁটা আলমারী। দামী পাখা, অদ্ভুত সুন্দর টেবিল ল্যাম্প—স্বর্গের একাংশে এসে পড়লো নাকি পাখি? পাখি বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে শুধু এদিক সেদিক তাকায়। রবীনবাবুর ঘরের পারিপাট্য দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল, পরিচ্ছন্নতা দেখে সে আশ্চর্য হলো—এখন তপেনের এই গৃহসংসার দেখে সে স্বর্গ মনে করে।

তপেন বলে—জীবনকে ভোগ করার জন্যেই টাকা পয়সা। টাকা না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ নেই। যদি সুস্থ মানুষের মতো সুন্দর পরিবেশে না বাঁচতে পারলাম—তবে কিসের সে বেঁচে থাকা? কোনো রকমে দিন গুজরান করাকে ত' বাঁচা বলে না। তাই জীবন-ভোগের জন্যে টাকা চাই—টাকা।

স্বপ্নরাজ্যে এসেছে নাকি সে? স্বপ্নলীন হয়ে সে কি জীবন-সংগীত শুনছে?

একটু একটু করে পাখি ত' নিজের হাতের মুঠো খুলে ধরেছে, কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় নি।

একদিকে একটি ঘটনা পাখিকে আজও পীড়িত করে। তপেন যে কি ধরণের মানুষ—তা সহজে বুঝে উঠতে পারে না। ঘটনাটি সাধারণ, এবং দোষ যদি কারুর থাকে—তবে তা পাখিরই।

জগৎকে তখন সে একটু একটু করে চিনতে পেরেছে! কোথায় পড়েছিল সে—কোন্ এক অখ্যাত অঞ্চলে। আম জাম জামরুলের ছায়ায় ঘেরা নড়বড়ে পাতার কুঁড়ে ঘরে, পচা ডোবা, মশা মাছি কলেরা, ম্যালেরিয়া—এর মধ্যে পৃথিবীর কি রূপই বা সে দেখতে পেতো।

পৃথিবীর পরিধি যে কত বড়, জীবন ধারণের কত বিচিত্র ব্যবস্থা যে এর মধ্যে রয়েছে—তার এতটুকু আঁচড়ও ত' লাগে না পল্লীতে।

পাখির নিজের এই ছোট্ট জীবনেরই না কত বিবর্তন ঘটলো! কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে অবশেষে স্থির হয়ে দাঁড়াবে—তা কোনো জলতত্ত্ববিশারদ আগে থেকে বলতে পারেন না। পাখির জীবনেরও যে কোথায় স্থিতি—সে নিজেও তা জানে না। অন্যে যে বাৎলে দেবে এমন ভরসা তার নেই।

সমিতির জীবন কি সে পল্লীগ্রাম থেকে কল্পনা করতে পেরেছিল?

না, আজ যে চাকরী পেতে না পেতেই সমিতির নিয়মানুযায়ী সে সমিতি ত্যাগ করে এসেছে তপেনের আশ্রয়ে—সে জানতো আগে থেকে ?

বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায় বসে বসে পাখি এই সব ভাবছিল। দুদিন থেকে বৃষ্টি খুব মাতন জুড়ে দিয়েছে, কখনো জোরে, ঘনঘটা করে—কখনো বা শুধু অবিরাম সূত্রটুকু ধরে রাখার জন্যে অল্প টিপ টিপ করে বৃষ্টির অষ্টপ্রহর চলেছে। ছেদ নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কখনো ধীরে, শান্তিতে, কখনো বা উদ্দাম গতিতে, প্রমত্তভাবে, উদাত্ত কণ্ঠে। মেঘে ঢাকা আকাশ, কালো অন্ধকার রাত্রি। নক্ষত্রের দেখাও নেই। সামনে পেছনে বৃষ্টির জলে সব যেন একাকার হয়ে ধুয়ে মুছে গেছে।

খুব কষ্টে পাখিকে এই ক'দিন অফিস করতে হয়েছে, কোন রকমে গেছে ট্রামে করে ড্যালাউসিতে, তারপর ওখান থেকে রিক্সায় চেপে—ফেরার সময় একদিন বিমান নিজের গাড়ী করে নামিয়ে দিয়ে গেছে বাড়ীতে, চা টোস্ট খেয়ে গল্প করে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে সূর্য উঠলো, পরিষ্কার আকাশ যেন হেসে খল খল করে উঠেছে। পাখি ছাদে নিজের বিছানাপত্তর রোদে দিয়ে এল। ক'দিন বৃষ্টিতে তোষক বালিস সেঁতিয়ে গেছে। একবার তার মনে হলো তপেনের ঘরের বিছানাও রোদে দিয়ে এলে মন্দ হয় না, কিন্তু তখনো তপেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, সুতরাং তপেনের বিছানা রোদে দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

পাখি নিতান্ত কৃতজ্ঞচিত্তে তপেনের সেবা করে যায়, প্রত্যাশা—নবীন এক স্বপ্নে মনকে বেঁধে রাখে।

কিন্তু বিছানা রোদে দিয়েই পাখি বেরিয়ে গেল অফিসে, তপেনও কোথায় গেল, ঠাকুর চাকরও নেই। ঝম ঝম করে আবার বৃষ্টি নামলো। শীতকাল অকাল বর্ষার মতো এমন যন্ত্রণাদায়ক আর কিছুই নেই।

তপেন যখন বাড়ী ফিরলো—তখন প্রায় রাত এগারোটা হবে। বৃষ্টি হচ্ছে তখনো। বৃষ্টির একটানা বিশ্রী আওয়াজ আর প্রচণ্ড শীত।

তপেন হল ঘরে ভিজে জামা কাপড়টা ছাড়লো, চাকরকে কড়া করে এক কাপ চা তৈরী করে আনার হুকুম একটু উচ্চ কণ্ঠে দিলে। মনে মনে বোধ হয় এই আশা ছিল পাখিই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হাজির হবে। হয়তো যখনি মিষ্টি আব্দারের সংগে এত রাত করে ফেরার জন্যে ধমক দেবে, ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট গার্জেনগিরি ভারি মধুর ঠেকবে। তপেনেরও ইদানীং পাখির শাসন পাবার এমনই একটা দুর্বার লোভ জেগে ওঠে।

নিজের ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালাতেই দেখা গেল—তার বিছানায় তারই গায়ের লেপ মুড়ি দিয়ে পাখি ঘুমিয়ে রয়েছে—নিশ্চিন্ত আরামে। প্রথমটা তপেনের ভারি বিশ্রী লাগলো—এযে বড্ড বেশী আব্দার, এযে অকারণ বাড়াবড়ি। গভীর বিরক্তিতে তপেনের মন ভরে গেল। পাখি কি চায় তার কাছে? তপেন শিউরে ওঠে—সেইত' আগে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে পাখিকে। তবে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। পাখিকে জাগিয়ে দুটো কড়া ধমক না দিলে যে আর চলে না। তবু একদিন পাখি তপেনের মনেও একটু জায়গা করে নিয়েছে, একটু মমতার, একটু স্নেহের স্থান সে গড়ে নিতে পেরেছে। পাখির ঘুমন্ত সরল স্নিগ্ধ অসহায় মুখের দিকে চেয়ে তপেনের কেমন মায়া হলো। হৃতসর্বস্ব, অপমানিত, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই বঞ্চিত এই মেয়েটিকে কড়া দুটো কথা বলা যে খুব সহজ কাজ—সে প্রত্যয় তপেনের হয়েছে।

জ্বর হয়েছে নাকি পাখির? এত অঘোরে ঘুমোচ্ছে সে। কি সরল সহজ আর সুন্দর মুখ পাখির। ছড়ানো চুল চারিদিকে—যেন পাতার মত ফুলের চারদিকে বিকীর্ণ, মুখখানি ফুলের মতো স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম।

তপেন পাখির কপালে হাতের চেটো বসিয়ে দেখলে উত্তাপ

কতটা। তাতেও ঘুম ভাঙলো না পাখির। একবার তপেনের ইচ্ছা হলো পাখির মাথার পাশে বসে পাখির কপালে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়। হয়তো অমানুষিক পরিশ্রম গেছে অফিসে, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে পাখির শরীর, কিংবা—

ঠিক এই সময় তার চাকর মোনা চা নিয়ে অতর্কিতে সেই ঘরে ঢুকে পড়লো, কিন্তু পাখির মাথার পাশে মনিবকে অমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—মোনা লজ্জায় মরে যাবার এমন এক বাহ্যিক এবং আভিনয়িক ভংগী প্রকাশ করে টেবিলের ওপর চা রেখে পালিয়ে গেল—যাতে তপেনের সর্ব অংগ রাগে জ্বলে উঠলো।

কি ভেবেছে এরা—এই সব চাকর বাকর? উত্তর দেশের রাঁধুনী ঠাকুরও—সেদিন কি একটা কথায় মাইজীর কাছে তপেনের বিরুদ্ধে নালিশ করে। মোনা এতক্ষণে দৃশ্যান্তরে পালিয়েছে। তপেনের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো পাখির ওপর। সেই বা ভেবেছে কি?

ঈষৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই তপেন ডাকলো—পাখি, পাখি।

চোখ মেলে চাইলে পাখি; সামনে তপেনকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো সে শয্যা থেকে; লজ্জায় ভেঙে একেবারে খান খান হয়ে গেল, মাটির সঙ্গে মিশে যাবার যত চেতনা নিয়ে সে বললে—কখন এলেন আপনি? আমি ত' টের পাইনি।

পাখি, তোমার অন্ততঃ এঘরে শোওয়া শোভন হয় নি, বিশেষ করে রাত্রে—এই রকম শীত আর বৃষ্টির রাত্রে। বাড়ীর ঠাকুর চাকর কি মনে করছে বলো ত!—যত রূঢ় তিরস্কার করে, পাখিকে সমঝে দেবে ভেবেছিল তপেন, কার্যক্ষেত্রে তার কোনো প্রকাশ ঘটলো না পাখিকে সে-ই যে আস্কারা দিয়েছে, ধীরে ধীরে তার ওপর অধিকার বিস্তারের ইংগিত যে সেই দিয়েছে।

আমাকে মাপ করুন, ক্ষমা করুন আপনি—বলতে বলতে পাখি কাপড়ে মুখ ঢেকে বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়! এক সংগে ট্যাক্সী চেপে বেড়িয়েছে, মাঠে ঘাটে গিয়ে বসেছে. অন্ধকার কক্ষে

পাশাপাশি বসে কত ইংরেজি ছবি দেখেছে, শ্রমক্লান্ত তপেনের গা হাত মাথা টিপে দিয়েছে কত দিন। আজ শীতের রাত্রে তার শয্যায় এসে পাখি শুয়েছে মাত্র—হয়তো অনধিকার এই শোওয়া। তবু এ নিয়ে এরকম চীৎকার করা আদৌ সংগত হয়নি তপেনের।

অফিসে যাবার সময় বিছানা তুলে যাওয়ার কথা খেয়াল হয়নি পাখির। অকাল বর্ষার দাপটে তার লেপ তোষক ভিজে চুপসে গেছে। অফিসের ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই কিছুক্ষণের জন্যে শ্রমের ক্লেদ দূর করতে তপেনের শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিল—তপেন আসার অনেক আগেই উঠে আসবে—এই মনে করে। কিন্তু ঘটনা অন্য হয়ে গেল।

পাখি মুখ ফুটে একথা বলতে পারলো না। জবাবদিহি করার কোনো দরকার নেই, আর তপেনকে জবাবদিহি করবে—এমন সম্পর্কও নয়। অন্ততঃ পাখি ত' তাই ভাবে।

যদি তপেনের মনে পাখিকে নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা জাগে বা ভার বোধ হয়—পাখি স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। জীবনের গতির সংগে ত' তার পরিচয় আছে।

কি জন্যে তপেন সংসার রচনা করেছে? গৃহসজ্জার উগ্র সৌরভ আকীর্ণ করে পাখির মনকে কেন মুগ্ধ করেছে?

যদিও মানবীয় মর্য্যাদার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, পাখি তপেনকে একান্ত আত্মীয় জ্ঞান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তপেনের নিস্পৃহ ব্যবহারে পাখি শুধু ব্যথিত হলো না, কেমন এক বিমুখ ঔদাসীন্যে তার মন কঠোর হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে বসন্তের উদ্দাম এলোমেলো হাওয়ায় দূরের গাছ থেকে বকুল গন্ধ ব্যাকুল এক স্বপ্নকে পাখির বুকে কীর্ণ করে, বিশিখ মন্ত্র সঞ্জীবিত হয়, কামনার কোনো এক চঞ্চল হরিণ গতায়াত সুরু করে। কিন্তু তবু সে ব্যক্ত করে না এর কোনো খবর, ভীরু সংকুচিত অভিব্যক্তির মধ্যে কখনো তার মন প্রকাশিত হয় না।

তপেনও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—পাখি তার কাছ থেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে। সিনেমায় যেতে বললে যায় না, অবকাশ সময়ে নির্জন কক্ষে মুখোমুখি বসে দুদণ্ড গল্প করতে মন সরে না। অফিস থেকে ফেরেও খুব দেরী করে।

তপেন ঠাট্টা করে—কি হলো, আজ যে দেরী এতো!

এমনি। পাখি খুব সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

নতুনের সন্ধানে? দুষ্টুমি ভরা তাৎপর্যপূর্ণ ইংগিত করে তপেন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে।

অর্থাৎ? দু চোখে আগুনের হল্কা সৃষ্টি করে পাখি জিজ্ঞাসা করে।

তুমি বোধ হয় আমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছো পাখি? তাই না? —ক্ষুব্ধ মিনতির সুরে তপেন জিজ্ঞাসা জানায়।

আচমকা কণ্ঠস্বরের এই পরিবর্তন—ব্যংগ থেকে অনুনয়ের এই আশ্চর্য বদল পাখিকেও কম বিস্মিত করে না। এই বেদনার্ত প্রশ্নের কি জবাব দেবে সহসা সে ভেবে পায় না। নিতান্ত অবুঝের মতো সে ছুটে পালালো—বোধ হয় কান্নায় তার সমস্ত মন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে—এই ভয়ে। পিছু পিছু তপেনও গেল। পাখির ঘরে গিয়েই বললে—আজ মাথাটা ধরেছে খুব, ভাবলাম তোমার হাতের সেবা খাই—একটু! কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে দেখি কোথায় তুমি। অফিস থেকেই আসো নি। মেজাজটা বিগড়ে গেল। এর জন্যে যে তুমিই দায়ী পাখি, মাথা টিপে টিপে এই বদ অভ্যেসটা তুমিই করিয়ে দিয়েছো।

পাখি কিন্তু সহজ সুরে আগের মতো বলতে পারলো না—আপনি আপনার ঘরে গিয়ে ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আমি যাচ্ছি। সে একটু দ্বিধাজড়িত সংকোচের সংগে বললে—আপনি যান, আমি আসছি।

পাখি গেল—কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্বেও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পাবলো না। কোথায় যেন বীণাযন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেছে। সুতো

দিয়ে ঐ তার বেঁধে আবার সুর সঞ্চারের চেষ্টা মিথ্যে, নিতান্ত অকারণ। তপেনের মনেও কেমন এক রহস্যময় অভিসন্ধির ছায়া—না সহসা ধরা যায় না, পাখির মনে কেমন এড়িয়ে যাওয়ার ভাব এবং বিতৃষ্ণা। এ অবস্থায় কি করে সে এখানে থাকবে ?

যে অবলম্বনকে যখনই আঁকড়ে ধরতে গেছে পাখি—সেটি তখনই খসে গেছে। নটবর সা থেকে সুরু করে তপেন পর্যন্ত—সকলেই এক ছাঁচে গড়া, এক ঢঙে তৈরী। মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে কাছে টানে, আদর করে, কপট অভিনয়ের মাধুর্যে আশ্চর্য জাদু সৃষ্টি করে, ভুয়ো প্রেমের পরিমণ্ডল রচনা করে থাকে, কিন্তু একটি মেয়েকে নিয়ে স্থায়ী ডেরা বাঁধতে চায় না। তেষ্টার জলের মতই মেয়েরা যেন সামায়িক প্রয়োজন মেটানোর বস্তু বিশেষ। তপেন সম্পর্কে স্পষ্ট অভিযোগ—তবু পাখির কেমন যেন ঘৃণা ধরে পুরুষ জাতির ওপর।

অথচ এই পুরুষকে ঘিরেই তার স্বপ্ন কামনা, গৃহজীবনের প্রতি আকাংখার তীব্র এক নারীত্বের আস্বাদ। বায়ুকে কেন্দ্র করে যেমন এক একটি জলবুদ্বুদ গড়ে ওঠে, ক্ষণ ভংগুর অস্তিত্ব নিয়েও সে যেমন নয়ন মনোহর ঢঙে নিজের স্থিতিকে প্রকাশ করে, কিন্তু কোনো দৃশ্যবস্তুর সংস্পর্শে, এমনকি বাতাসের ছোঁয়াচে সেই বুদ্বুদের অস্তিত্ব যেমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, তেমনি কি পাখির এই মর্ম-কামনা ? কোনো পুরুষ মানুষকে দেখেছে সে, তার সম্পর্কে কিছু ভেবেছে সে, তাকে কেন্দ্র করে নিজের মনকে বেঁধেছে—তাকেই হয়তো আত্মীয় বলে মনে করেছে—কিন্তু তখনই আঘাত এসেছে। নটবর সার কাছ থেকে সেই প্রথম আঘাত। তপেনের ঘরে অপরিহার্য বিশ্রামগ্রহণের ট্রাজেডীর মধ্যেও সেই কামনা বুদ্বুদের মতো চুরমার হওয়ার বেদনা।

পাখির মন আকুল হয়ে উঠে। নীড় বাঁধতে চায়। সারা দিন ধরে হাওয়ায় বা রৌদ্রের আলোক বেড়ানো চলে, কিন্তু সন্ধ্যার দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে বিশ্রাম কাতর পাখির মন ঘর চায়, নীড় চায়, ডেরা চায়। সুস্থ হয়ে জিরিয়ে নিতে পরিপার্শ্ব দেখতে চায়।

॥ দুই ॥

পাখি অফিসে যাবার সময়ও বটে, এবং অনুপস্থিত থাকা কালীনও বটে তপেন এসে বিমানের সংগে কিছু গোপন কি প্রকাশ্য কথাবার্তা বলে যেত। ইদানীং সেটা একটু বেড়েছে বলেই মনে হয়। পাখির চাকরী হয়েছে এ অফিসে—তপেনের করুণাতেই। পাখি তা জানে। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এদের দুজনের মধ্যে কোনো চক্রান্ত গড়ে উঠবে—তা কিছুতেই স্বীকার্য নয়। পাখি চেষ্টায় থাকে—তপেনের এ অফিসে আসার আসল উদ্দেশ্যটা কি জানার। পদ্মলোচনের সাহায্যে যেটুকু জানা যায়—তা খুব বেশী কাজের হলো না। পাখির গতিবিধি লক্ষ্য করাই নাকি উদ্দেশ্য তপেনের।

তা যদি হয়—হোক। পাখি দেখিয়ে দেবে তপেনকে যে সে বঞ্চিত প্রাণ ব্যক্তি বলেই অবহেলার বস্তু—তা নয়। তারও স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে। আশ্রয় দিয়েছে বলে, উপকার করেছে বলে সে যে পাখির মাথাটা কিনে নেয় নি—সেটুকুই সে বুঝিয়ে দেবে। প্রতিশোধ নেবার কথা নয়; নিজের সম্পর্কে নতুন একটা মূল্য বোধ আরোপ করা।

পাখির গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে চায়? ভালো কথা। তবে সে বুঝে যাক যে পাখি আর তার আওতার মধ্যে নেই। অশোকের সংগে দেখা হলে পাখি ইয়ার্কি করে। কবে কোন্ দিন এক রিক্সায় চেপে একটু বেড়িয়ে ছিল—তার স্মৃতি রোমন্থন করে অশোকের বুকে আগুন জ্বলে। রবীনবাবুর দোকানে যায়, বাড়ীতে যায়—হাসি ঠাট্টা করে। বিস্মিত, বিপত্নীক রবীনবাবু পাখির জন্যে অনুকম্পা বোধ করেন। ভ্রূক্ষেপ নেই পাখির, জীবনকে নিংড়ে দিয়ে সে প্রমাণ করছে পুরুষ জাত কত মেরুদণ্ডবিহীন। বিমানের দিকে মদির ভাবে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় পাখি। হোক না বিমানবাবু তার মালিক, তবু

ত' পুরুষ। নারীত্বের চিরকালীন দাবী নিয়ে সে যদি কটাক্ষ বান হানে —তাতে দোষের কিছু নেই। এমনকি পদ্মলোচনের সংগে মস্করা করে সময় সময়, নইলে তপেনের গোয়েন্দাগিরির সন্ধানটা জানতো না পাখি। অশ্বিনীবাবু যদি আজ পাখির সামনে আসতেন—পাখি দেখে নিতো কতবড় বুদ্ধিমান তিনি।

ললিতার শিক্ষা এতদিনে পাখির মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে।

অশোকের সংগে প্রায়ই দেখা হয়—আর পাখিও তাকে যেন ক্রমশ আকর্ষণ করে বসে বেশী। ধীরে ধীরে ছেলেটির নেশা ধরে গেল—পাখির অফিস যাবার বা ফেরার সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার। কখনো কখনো গড়ের মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষমান থাকে—দুজনের কথা হয়, হাসি ফোটে, গান বাজে।

এক একবার পাখি নিজেকে নিয়ে এই উন্মত্ত খেলায় যে নেমেছে তার যুক্তি খুঁজে পায় না।. মনে প্রাণে সে তপেনকে চায়। তপেনকে কেন্দ্র করেই তার নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে চায়। তপেনের সেবা করে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু তপেনের একি হতাদর?

তাবলে সেই অনাদরের বিরুদ্ধে পাখি নিজেকে নিয়ে এ কোন্ তামাসায় মত্ত হয়ে পড়েছে। অশোককে খেলাচ্ছে, নাচাচ্ছে। কেন? বোকা ছেলেটা যদি তার বঁড়শীতে অকারণে এসে ঠোকর দেয়, টোপ গেলে, পাখির করার কিছুই নেই। টোপ ফেলেছে নাকি পাখি?

কথাটা মনে হতেই সে চমকে ওঠে। না—না—না সে একটিমাত্র পুরুষকে চায়। নিজের মনের মানুষ করেই ধরে রাখতে চায়। তারই সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শবরীর মতো তার প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষিত ব্যাকুলতায় অশোক কেন এসে তাকে বিরক্ত করে। পুরুষের কেন এই নীচতা? কামনাপ্রিয় লালসামাতাল পতংগ যদি পাখির বুকের আগুনে ঝাঁপ দেয়, পুড়ুক না সে,—দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক না সে! পাখি যেন কোথায় একটা আনন্দলাভ করবে।

পুরুষ জাতির প্রতি অবশেষে ঘৃণাই জমেছে নাকি তার? ছটফট

করে পাখি।. অসহনীয় হয়ে পড়ে তার বাসা, তার সংগ, তার আশ্রয়, তার সাহচর্য। পাখি খসখস করে একটা চিঠি লিখে তপেনের টেবিলে রেখে আসে, আর চেষ্টা করতে থাকে সেখান থেকে সে সরে পড়তে চায়।

তপেন চিঠিটা দেখে। মামুলি চিঠি 'সবিনয় নিবেদন' করে পাঠ লেখা। পাখি এখান থেকে চলে যেতে চায়।

কিন্তু কোথায় ?

তপেন হাসলো। পাখিকে সে ধরে এনেছে স্খলিত নারীদেহ নিয়ে খেলা করার জন্যে নয়। অন্ততঃ অমন তুচ্ছ কামনা তপেনকে পাখি সম্পর্কে সচেতন করতে পারতো না। পাখিরও বোঝা উচিত ছিল তপেন এই ব্যাপারকে কোনোদিন প্রাধান্য দেয়নি। এটাকে সে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। এর জন্যে সুচিন্তিত কোনো অধ্যবসায় সে ব্যয় করে না। সে অর্থকে বিশ্বাস করে, টাকাকে চেনে। অর্থ হলে পরমার্থ লাভের বিলম্ব ঘটে না। জগৎটা কার? জগৎ টাকারই। টাকার জোরেই সে এই জগৎকে বশ করতে চায়, কিনতে চায়। টাকার যাদুতে সে জগৎকে হাতের মুঠোর মধ্যে ভরে রাখতে চায়।

পাখিকে তাই সে সহায় হিসেবে অবলম্বন হিসেবে চেয়েছে। স্বামিত্বের ভুয়ো অভিনয়ে সে জয় করেছে পাখির হৃদয়, কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ দেহগত মালিন্যকে সে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। এইখানে তপেনের মনে ধাক্কা বেজেছে।

অথচ পাখিকে সে অর্থার্জনের আড়কাঠি হিসেবে নিলেও কোনো দূষিত বা কলুষিত উপায়ের মাধ্যমে সে পাখিকে বিক্রীত হতে দেবে না।

বিমানবাবু জানেন সব। তাঁকে এই কন্ট্রাক্ট সাপ্লায়ের অফিস খোলার সময় টাকা সাহায্য করেছিল—এবং বিরাট এক সম্পত্তির মালিকানা আজো তপেনের ভাগ্যে আছে জেনেই তিনি তপেনকে উৎসাহ এবং আস্কারা দিয়ে আসছেন। সেই সম্পত্তি হাত করার

অস্ত্র হিসাবে পাখিকে ব্যবহার করতে হবে। তার বেশী আর কিছু নয়!

চিঠি লিখেছে পাখি—সে চলে যাবে অন্যত্র। নিষ্কাম স্বামিত্বের ভূমিকায় তপেন অবতীর্ণ হয়ে জীবনের, সংসার-জীবনের যে আস্বাদ তাকে দিয়েছে, একটি পুরুষকে কেন্দ্র করেই নারীর সার্থকতা গড়ে ওঠে—সেই আস্বাদন থেকে কি করে এত সহজে পাখি মুক্ত হবে? অশোকের সংগে মিশছে খুব, তপেন সে সংবাদ রেখেছে। কিন্তু তার হাত থেকে পাখিকে মুক্ত করে আনতে কতক্ষণ? অশোকের কাছে আর একটা ধাক্কা খাওয়ার দরকার আছে—তা হলেই সে খাঁটি সোনা হয়ে উঠবে। প্রেমের আগুনে জ্বলুক পাখি, তপেনের নিষ্কাম স্বামিত্বের ভূমিকার প্রলোভনের জালে আরো জড়িয়ে পড়ুক পাখি, তপেনের হাতের ছোট্ট ইসারার গণ্ডীতে নেচে বেড়াক। দাঁড়ে বাঁধতে কতক্ষণ!

পাখি এ কথা বোঝে কি না—সে প্রশ্ন তপেনের মনে কখনো জাগেনি। অভিনয়ের নিপুণ চাতুর্যে পাখির মনে স্বপ্নের বীজ বুনেছে সে। পাখি আকাংখার রঙীন পরিমণ্ডলে অন্ধ বিশ্বাসের পুঁজি নিয়ে বেঁচে ছিল। হয়তো এতদিনে তার স্বপ্নে চিড় খেয়েছে—তাই সে চলে যেতে চায় অন্যত্র!

॥ তিন ॥

সময়ের প্রলেপে আঘাত সেরে যায়। দাগ থাকে বটে, কিন্তু ক্ষতস্থানে নতুন মাংস লাগে, যন্ত্রণা ঘুচে যায়। পাখি ভুলে যায় পূর্বজীবন, সে জীবনের গ্লানি, মাদকতা, তার বিষক্রিয়া। নটবরদাস থেকে অশোক পর্যন্ত—সবাই আবছা হয়ে আসে! এমনকি তপেনের ঘরে সেই বর্ষার রাত্রে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা—তাও ফিকে হয়ে আসে। পুরুষ জাতিকে আঘাত করার একটা দুর্জয় বাসনা শুধু পাখির মনকে উন্মত্ত করে মাঝে মাঝে—তবে তা ক্ষণস্থায়ী। শুধু তপেনের জন্যে এক অপরিসীম দরদ পাখির বুকখানাকে সিক্ত করে রাখে; তপেনের জন্যে গভীর এক মমতায় তার মন টন টন করে উঠে। তপেনের কাছে থেকেও তপেনকে দূরের মানুষ মনে হয়, তাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে, এমন কি, প্রথম বর্ষার রাত্রে বিরহ বেদনায় কাতর হয়, দু ফোঁটা চোখের জল বুঝি বা মসৃণ কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। সেই চোখের জলের দাগ সহসা মেলায়ও না, তা দিয়ে পত্র লেখা আঁকা হয় গালে। একি হলো পাখির? বিচিত্রগতি এই জীবন? পূর্বরাগের বেদনায় পাখি কাতর হয়ে ওঠে। তার অন্তরে একি ব্যথা? পূর্বরাগ-পীড়িত পাখির একি দশা?

তপেন ধীরে ধীরে আবার কাছে এসেছে। অশোক সরে গেছে একটু একটু করে।—নাটকীয় বিদায়ের ঢঙে হঠাৎ একদিন এসে সে পাখির কাছে বিদায় নিতে গেল। সেলসম্যানসিপ শেখার জন্যে বিলেত যাচ্ছে—কোন এক কোম্পানীর পয়সায়। পরে দেখা হবে। অশোকের সম্বর্ধনা হলো—তার বন্ধুরা পার্টি দিলে, সেখানে পাখিও গিয়েছিল। যত সহজে অশোক এসেছিল পাখির জীবনে, ঠিক তত সহজেই বিদেয় নিতে পারলে। মাঝখানকার মেলামেশা যেন কিছু নয়।

পাখির একটু বিশ্রী লাগলো বটে, হাতে পেয়েও একটা পুরুষকে সে নাকাল করতে পারলো না। কিন্তু অশোক চলে যাবার আগে থেকেই তপেন পাখির কাছে ধরা দিলে।—তুমিও যেমন আশ্রয় চাও, কোন এক পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয়, আমিও কর্ম-ক্লান্ত জীবনে কোনো এক নারীর স্নেহ-প্রেমের ছায়ায় দাঁড়াতে চাই। সুতরাং আমাদের সন্ধি হতে বাধ্য।

তপেনকে পাখি কি বলবে? দোষে গুণে এই মানুষটিকে তার ভারী ভালো লাগে—কখনো রাগ হয়, কখনো করুণা জমে।

সব যুদ্ধে হেসে ফিরে আসা কোনো সৈনিকের বিক্ষত দেহকে তোমার মমতার প্রলেপ থেকে বঞ্চিত করো না পাখি। আমি সেই রকম একজন ভাগ্যহীন সৈনিক।—তপেন বলে।

কি এর উত্তর দেবে পাখি?

এই রকম আরো সব কথা। সুতরাং পাখিও নরম স্বচ্ছন্দ আয়েসের একটি পরিমণ্ডল গড়ে নিয়ে তপেনের অবলম্বনে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। তপেনের সংগে ঘুরতে আজকাল তার বাধে না—এমন কি চেঞ্জে গেলেও না।

চোখ কান বুজিয়ে নির্লজ্জের মতো পাখি প্রশ্ন করে—আর কেন অপেক্ষা করা? এইবার একদিন ঠিক করো বাপু—পাঁচজনে কি ভাবে বলো ত'?

ধীরে—পাখি ধীরে। বেশ সুর করে টেনে টেনে তপেন বলতে থাকে—মেওয়া যদি এত তাড়াতাড়িই ফলতো—তবে ও জিনিষটার কদর বাড়তো না। সবুরেই মেওয়া ফলা উচিত। আগে ভাগ্য পরিবর্তন করে নিই, দুটো পয়সার মুখ দেখি, তুমি আর আমি—যখন দুজনেই বিরাট পয়সার মালিক হয়ে উঠব, সেই সময়—একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠবো—তখন, তখন অনিবার্য হিসেবেই ত' তোমাকে আমার গ্রহণ করতে হবে। বিয়ের সূতোর চেয়েও শক্ত বাঁধুনির দ্বারা তখন অনিবার্য হিসেবেই তোমাকে আমার ধরে রাখতে হবে।

তপেনকে পাখি সবটা বুঝতে পারে না, কথা বলার ঢঙ থেকে পারে না। কখনো গেন্নুমাসির মতো রূপকাশ্রয়ী ভাষা বলে, কখনো এমনি সাধারণ হৃদয় সম্বেগের কথা বলে। কখনো সে সংক্ষিপ্ত, কখনো দীর্ঘ। তপেন কথার আবেগে স্নেহে প্রেমে কাছে টানে, কিন্তু স্পর্শ করে না। পাখিও বার বার ধাক্কা খেয়ে তপেনের মর্জির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। নিভৃত অভীপ্সার দরজায় গিয়ে পাখি যখনই দাঁড়িয়েছে—তখনই তপেন সুকোমলকণ্ঠে আবেগললিত প্রেমের স্নিগ্ধ কিরণ বিচ্ছুরণ করে বলেছে—পাখি, ব্যস্ত হয়ো না, এখনো অনেক পরীক্ষা বাকি! বিয়েটা আমাদের আগে হয়ে যাক, তারপর।

পুরীর সমুদ্রতটে ক্লান্ত দেহটাকে লুটিয়ে দিয়ে উপবিষ্ট তপেনের কোলে পাখি মাথা রেখেছিল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। চারিদিকে তরল অন্ধকারের একটা আস্তরণ, সামনে অশ্রান্ত গর্জন-মুখর সাগর। পাখি তপেনের একখানা হাত নিজের বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছিল—সমুদ্র কি অশ্রান্ত কলরব তুলেছে—তবু বসুন্ধরার মৌন ধ্যান যেন ভাঙে না।

চমকে উঠেছিল নাকি তপেন? একটু কেঁপেছে তার হাত—হাতের আঙুল নিয়ে সে তখন খেলা করছিল। তপেন পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তপেন বললে—তুমি দিন দিন অবুঝ হয়ে উঠছো পাখি। জীবনের আস্বাদ অনন্তকাল ধরে গ্রাহ্য। ছোট্ট সীমায় তাকে ধরে রেখো না। আমাদের বিয়েটা চুকে যাক—আগে। তুমি চঞ্চল হয়ো না পাখি।

পাখির যেন সেদিন কি ঘটে গেল। মুখ খুলে গেল তার। অনুভূতিলোকে নবজন্ম হলো। পাথর চাপা ফ্যাকাশে চারাগাছ হঠাৎ যদি পাথরের ঠুলি ঠেলে নীল আকাশকে কাছে পায়, প্রখর সূর্যালোকে স্নান করে দেহকে লাবণ্যের জোয়ারে সবুজ করে তোলে—তার যেমন দশা হয়, এতদিন পরে, এত মানুষের স্পর্শের পরেও পাখির মানসলীলায় এই অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ জাগলো। অশোককে সে

মাতিয়েছে, রবীনবাবু নিজেকে সংযত রেখে শুধু তার কল্যাণ করে গেছেন,—কিন্তু নারীত্বের মর্যাদা সে কারো কাছ থেকেই পায় নি। তপেনই এই বোধ হয় প্রথম তাকে মহিলার সম্মানিত আসন দান করলো। বিয়ের গণ্ডীর মধ্যে প্রবিষ্ট না হলে পাখি তার স্পর্শগম্য নয় —এত বড় সম্মানের কথা পাখি আর কখনো শোনেনি। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় পাখি এলিয়ে পড়ে তপেনের কোলে।

তপেন শান্ত করে তাকে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, কবিত্বের কথা বলে, কিন্তু কবিতা করার বয়স পার হয়ে গেছে বলে সেই কাব্যের সুর সকরুণ শোনায়, তপেন তা বোঝে, পাখিরও কেমন ছন্দপতন মনে হয়।

তপেন নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—তুমি বড় অস্থির পাখি। তোমাকে ত' আমি কতদিন বলেছি দরিদ্রভাবে বেঁচে থাকতে আমি চাই না। সমাজের মধ্যে যারা এই বলে বাঁচে যে দুঃখের ভাত সুখ করে খাও, এক মুঠো যদি জোটে—তাই সকলে হাসিমুখে গ্রহণ করো, স্বল্প হোক, তবু যেন শান্তি থাকে—এই জাতীয় মূঢ়তার মধ্যে আমি নেই। টাকা পয়সা আমার কেন থাকবে না? এই আমার প্রশ্ন! আমার বুদ্ধি আছে, রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে। ধনী বংশেরই একজন লোক আমি। আমি যে দুর্ভাগ্যের চরম লাঞ্ছনার মধ্যে দিন কাটাবো—তা ত' হতে পারে না।

টাকা, টাকা, টাকা—তুমি শুধু টাকাকেই বড় করে দেখেছো। আমি উপায় করবো, তুমি উপায় করবে—দুজনের আয়ে আমাদের এক রকম চলে যাবে।—পাখি বললে।

এই এক রকমের বিরুদ্ধেই আমার জেহাদ। তুমি কি এমন উপায় করবে, আমিই বা কত টাকা এখন আনছি বা পরে আনতে পারবো। অন্য উপায় বাৎলাতে হবে—অন্য পথ দেখতে হবে। যেখানে খরচ করে উঠতে পারবো না—এমন টাকা আসবে। আগে টাকা পরে জীবন। টাকা হলেই জীবন আপনা থেকে সুন্দর হয়ে যাবে।—তপেনের চোখে

মুখে কেমনধারা হিংস্র একটা উত্তেজনার ছায়া পড়ে, পাখির চোখে তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, সে বিস্মিত হয়।

টাকা চাই পাখি, বাড়ী গাড়ী চাই, জীবনকে ফুলের মতো কোমল করতে হবে, বজ্রের মতো কঠিন করতে হবে—তাতেও টাকা চাই। তোমার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে পাঁচমিনিট বেশী বেঁচে থাকো—দেখবে ওই পাঁচমিনিট সময়টুকুর দাম কত দিতে হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় থাকলে বাড়ীর লোক অন্ততঃ গোটা দুই ইঞ্জেকসন দেবে। বাঁচা ত নয় শুধু টাকা খরচ করা। বিংশ শতাব্দীতে কি টাকা ছাড়া এক মুহূর্ত চলে। উঠতে টাকা, বসতে টাকা।

টাকা টাকা করে তুমি পাগল হয়ো না যাও—আমার শুধু সেই ভয় করে।

পাগল বোধ হয় চট করে হবো না। সে ধাক্কা সামলে নিয়েছি। হয়তো তোমার জন্যেই পাগল হইনি। তবে টাকার নেশা আমার মধ্যে জ্বালার সৃষ্টি করে।

সহায় পাখি পেয়েছে বটে, কিন্তু নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে নি। তপেনের কাছে সে কেমন কাতর হয়ে পড়ে, কাঙাল হয়ে ওঠে কিন্তু তপেনের বন্ধুবান্ধব পাখির সংগে চটুল ইয়ার্কি দিতে চায়, পাখিকে কেন্দ্র করে হাসির তুফান ছোটায়, অপরিষ্কার দৃষ্টিতে তাকায় পাখির দিকে। আগে হলে পাখি এই পংকিল চাহনির বিপক্ষে ঝড় তুলতো, কিন্তু এখন ইচ্ছা করেই সে একটু খেলা করে। লালসাকুটিল নোংরা মানুষকে একটু শিক্ষা দিতেও মন যায়। কখনো বা এদের সংগে সিনেমায় যায়, প্রেম নিবেদন করে কেউ কেউ, অপরিসীম ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনে কাউকে পাখি বলে ফেলে—আপনি পশু। কাউকে ধমকে দেয়। কাউকে বা এমনই আবর্তে ফেলে, যেখান তার বেঁচে ফিরে আসা মুস্কিল হয়। মানুষ নিয়ে—পুরুষ মানুষ নিয়ে খেলা করতে সুরু

করে সে। সে মৃদু হাসে—আস্কারা দিয়ে তু তু করে কাছে ডাকে পুরুষকে ; হয়তো খুব কাছে কেউ এসে পড়লে পাখি নির্লজ্জের মতো তিরস্কার করে ওঠে—কেন আপনি আমার পিছু নিয়েছেন? ভদ্রমহিলার সম্মান পর্যন্ত দিতে জানেন না?—ততক্ষণে আশপাশ থেকে হাঁ হাঁ করে লোক ছুটে আসে। ভারতীয় মহিলার এই অপমান পুরুষেরা সহ্য করে না, তাদের সিভ্যাল্‌রি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মারমুখো হয় সকলে। সুবিধে বুঝে পাখির সংগে আসা লোকটি সরে পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু লোক নিগ্রহ এড়িয়ে যেতে পারে না। মুখে রুমাল দিয়ে পাখি হেসে নেয় একটু। পুরুষের প্রতি একি অকৃপণ কঠোর ব্যবহার তার?

এ তার কি হলো? তপেনের সংগে তার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সে যা চায়—পাখি তাতে রাজী। তপেন বলেছে—তার দাদার বাড়ীতে চাকরী নিতে হবে—যে কাজই হোক। তার দাদা বাইরে থাকেন। সেখানে যে-কোন কাজের অছিলায় যেতে হবে। তারপর আসল কাজ—এবং সেই আসল কাজটি যে কি—তা তপেন ব্যক্ত করে নি। তবে সে কাজ সমাধা হলেই পাখির অভীপ্সিত জীবন, সহজ স্বচ্ছন্দ নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ। তপেনের কাছে এ আশ্বাস না মিললে হয়তো তপেনকেও পাখি খেলাতো। পাখি নিজের জীবনচরিত্রের কথা এক একবার ভাবে, আর বিস্মিত হয়।

গড়ের মাঠ ফাঁকা জায়গায় মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে এলোমেলো হাওয়ায় বসে বসে পাখি ভাবছিল—নিজের সম্পর্কে। সন্ধ্যে তখনো হয় নি। চাকরীতে আর যেতে হয় না,—তপেনেরই নির্দেশে। উপেন-বাবুর কাছেই তার চাকরী করতে হবে।

পাখি ভাবছিল নিজের কথা। পড়ার জন্যে মনে একটা আকুলতা ছিল, কিন্তু বি, এ, ক্লাসে ভর্তিই হতে পারলো না আর। তপেন ইচ্ছে করে নি, সে-ও জোর করে নি। তপেন বলেছিল—বাঙালীর ঘরের বউ হয়েই যখন জীবন কাটাতে হবে, তখন ডিগ্রীর বহর জুটিয়ে নিজের বিজ্ঞাপনের দিকে আর কিছু না হয় নাই যোগ করলে পাখি। মেয়েরা

খুব বেশী পড়ুক—এ বাতিক আমার অন্ততঃ নেই। যা শিখেছো, ঢের হয়েছে। এখন একটু গৃহস্থালীর কাজকম্ম শেখো ত! দই-কই কি করে রাঁধতে হয় আর চিংড়ী মাছের ভাপা কি করে করে—তা শিখলেই চলবে।

পাখি সেই যে বইয়ের সংগে সংযোগ ছাড়লে—আর পড়ার কথা ভাবে নি। অথচ পড়ে গেলে এতদিন বি, এ, পরীক্ষাতেও উৎরে যাওয়া যেত।

কত মানুষ এল, গেল। কত চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল তার মনে। সমাজের চোখে পাখির আজ কোনো পরিচয় নেই,—কিন্তু পল্লীগ্রামে না হয় এই সামাজিকতার মূল্য আছে। কোলকাতার এই ছন্নছাড়া বাসাড়ে জীবনের আর সমাজসত্তা কি? দক্ষিণ কোলকাতা থেকে বাসা উঠিয়ে উত্তর কোলকাতায় ঘর ভাড়া করে থাকলে কে তাকে চিনছে, কে জানছে? তার জীবনে আতর আলি এসেছে, তপেন এসেছে—হিন্দুশাস্ত্রের তীব্রতম কঠোর পেনাল কোডের বিধানে সে ভ্রষ্ট, এই নষ্ট চরিত্রের মলিনতা তার চোখে মুখে ছায়া ফেলেনি, তবু কেন সুস্থ সহজ সুন্দর একটা জীবন তার জুটছে না! কেন এই অভিশাপ তার জীবনে? স্বামীর সেবা করে স্বামীর সংসার করে সে কি বাঙালী মেয়েদের মতো জীবন যাপন করতে পারে না?

থেকে থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে পাখির চুল নেড়ে দিয়ে যাচ্ছে দুষ্টু ছেলের মতো। কাপড়ের আঁচলও শ্লথ হয়ে আসে, কখনো বুকের কাপড় খসে পড়ে কখনো বা পিঠের কাপড় মাথায় উঠে যায়। মাথার কাপড় হাত দিয়ে নামাতে গিয়ে সে ক্ষণিক থেমে গেল। মাথায় কাপড় সে কোনো দিন দেয় নি, সীঁথিতে সিঁদুরও নয়। মাথায় কাপড় দিলে তাকে দেখায় কেমন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ত' একদিন দেখেনি নিজের সীমন্তিনী রূপ। কেমন এক কাতরতায় তার মন ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে ওঠে। যাক না মাথায় কাপড়ের আঁচলটা, বাতাসই আবার হয়তো পরের ঝলকে তার ভুল সংশোধন করে নেবে।

পিছনের থেকে তারই নাম উচ্চারিত হতে শুনে পাখি চোখ ফিরিয়ে দেখে ললিতা। ললিতার সংগে অনিলবাবু আর সুন্দর ফুটফুটে একটি ছোট্ট ছেলে। সূর্য তখনো অস্ত যায় নি। মেঘে মেঘে রক্তরাগের বিচিত্র লীলা ওপরে, মাঠেও ইতস্ততঃ ছড়ানো মানুষ—প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সংগে মিতালী করার জন্যেই জড়ো হয়েছে। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে ঠেলাগাড়ীর ওপর চলমান দোকান কয়েকটা, সেখানে লোকের বেশ ভীড়। জগৎ সংসারের বিচিত্র ছোট্ট একটি সংস্করণ যেন এই গড়ের মাঠ। এই মাঠের মধ্যে ললিতাকে দেখে, অনিলবাবুকে দেখে, সংগের ছেলেটিকে দেখে পাখি যেমন খুসী হলো, তেমনি বিস্মিত হলো। জগৎ পারাবারের তীরে ক্রীড়াতরংগের পাক খেতে খেতে হঠাৎ তাহলে দেখা হয়ে যায় পরিচিত মানুষের সংগে, নিজের মানুষের সংগে। ছেলেটি নিশ্চয়ই ললিতার খোকা, ললিতার ছেলে! পাখি চমকে ওঠে, খোকাকে ধরতে যায়।

মাথায় এমনভাবে ঘোমটা টেনে বসে আছিস—দূর থেকে যে চিনতেই পারি না। ও বললে—হ্যাঁ, ও পাখি। আমি বললুম—কক্ষনো না। ও ত' বাজী ফেলতেই রাজী ছিল। দু পা এগোতেই দেখি—সত্যি বটে তুইই বসে আছিস্!

পাখি মুখ তুলে ললিতার দিকে তাকালে।

তা ঘোমটার ব্যবস্থা কতদিন হয়েছে ভাই। খাওয়া থেকে বাদ পড়লুম আমরা। বেশ, বেশ—ললিতা ঠাট্টার সুর এনে অভিযোগ করে।

অনিলবাবু বললেন—তা, ভাগ্যবান্‌টি কে জানতে পারি না?

ললিতা বললে—আর এখানে একাকিনী বিরহিনী শোকাকুলা বন্দিনী সীতার মতই-বা কেন?

পাখি তবুও চুপ করে থাকে দেখে ললিতা পাখির মুখের দিকে তাকালে। কপালে সিঁদুরের টিপ নেই, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা নেই। চমকে উঠলো ললিতা—পাখি, পাখি, এ তোর কি দশা ভাই! কি হয়েছে?

অনিল রায়ও পাখির মুখচোখ কপালের দিকে চেয়ে ব্যথিত হয়ে উঠলো।

এতক্ষণ পরে মাথার ঘোমটা খসিয়ে দিয়ে পাখি বললো—কিছুই ত' হয়নি। উদ্দাম বাতাসে পিঠের কাপড়ের কিছুটা মাথায় উঠে এলো—ভাবলাম, না—থাক না—মাথাতে কাপড়। ঘোমটা দেবার বয়স যে পার হয়নি, এমন নয়। যদি ঝড় দুষ্টুমি করে ব্যংগই করে থাকে আমাকে, করুক, আমি তাকে বাধা দেব না। এই ভেবেই মাথার কাপড়টা নামাইনি। আর কিছু ঘটে নি।

অনিলের সংগে ললিতার চোখাচোখি হলো একবার। দুজনেই পাখির মনকে, মনের বেদনাকে উপলব্ধি করলে, কিছু বললে না।

পাখি বললে—এই বুঝি তোর খোকা। বাঃ বেশ, সুন্দর ফুটফুটে হয়েছে ত!

ওর কথা বলিস না। এমন বজ্জাত আর দুষ্টু যে সারাটা দিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। খোকন, এই যে—এদিকে এসো, এই যে তোমার মাসিকে দেখো।

খোকা তখন লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে দূরে ছড়িয়ে গেছে।

ললিতা বলে চলে—রোজ এই ছেলের জন্যে এক ঘণ্টা আমাকে মাঠে আসতেই হয়। বিকেল হলে সেই যে বায়না ধরবে মাঠে বেড়াতে চলো—না নিয়ে এলে নিস্তার নেই।

ললিতাদি, একটা চিঠি দিয়েও কি তোমার বোনের খবরটা নিতে নেই? কোথায় তোমার খোঁজ পাবো—সে ঠিকানাটাও কি দিতে নেই? পাছে যদি এই হতচ্ছাড়ি গিয়ে জ্বালায় তোমায়।

—কি তুই বলছিস পাখি! এখন আছিস কোথায়? বলতে নেই রে—আগের থেকে এখন তোর চেহারায় একটু জৌলুষ লেগেছে। তোকে দেখে আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।

কি যা তা বকছো বলো ত! তোমার দেখছি ছেলেমানুষি স্বভাব এখনো যায় নি।

—তুই খুব বুড়োমানুষ হয়ে পড়েছিস বুঝি ?—আমরা এখন আছি তালতলায়, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে। বছরখানেক হলো একটা মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি পেয়েছি ওই পাড়ায়—তাই উঠে এলাম। খোকাকে একটা কিণ্ডার গার্ডেন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। আর ও তো এখনো থিয়েটারেই কাজ করে। কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। তোর খবর কি বল? কতদিন পরে যে তোর সংগে দেখা। তুই আছিস কোথায় ?

পাখি বললে—কোথা থেকে বলবো বল। জীবনে ত' প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু ঘটছে। কত দূরের খবর জানো? সমিতি ছেড়েছি, আই-এ পাশ করেছি, চাকরী করছি। এ সব জানো? সম্প্রতি একজনের আশ্রয়ে আছি, ঠিক করুণায় নয়, আবার প্রীতিতেও নয়।

ব্যস, ব্যস—আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—গোছের ব্যাপার। অনিল রায় বলে উঠলো।

ললিতা অনিল রায়ের দিকে একটু বক্র দৃষ্টি হেনে বললে—সাবধান পাখি, শুধু মিষ্টি কথায় ভিজো না। কথার মর্যাদা রাখার মতো সাধু লোক আর কজন আছে ?

অন্ততঃ আমার মতো বোকা হয়তো আর একটাও না মিলতে পারে। তোমার দিদি বোধ হয় এই ইংগিত দিচ্ছে।—অনিল রায় ফোড়ন কাটে।

না, সে আশংকা নেই। তোমাদের কাছে বলতে বাধা কি—আমি তার ওখানেই থাকি। ঘর করছি এক সংগে !

তা হলে আশা করি আসন্ন বিবাহ ?—অনিলের প্রশ্ন। পাখি মুখ টিপে হাসে।

বিয়েতে ফাঁকি দিস না পাখি। ললিতা বলে।

এমন সময় খোকা দৌড়ে আসে। বলে—মা, এখানে সাপ নেই কেন? উট নেই কেন? বাঘ? সেই খাঁচার বাঘ নেই কেন? সেখানে কত পাখি? পাখি কই—মা, পাখি ?

পাখি ?—পাখি হাসে। খোকাকে ধরে আদর করে, চুমো খায়, বলে—পাখিকে চাও ? এই ত' পাখি।

ললিতা বলে—পাখি, সাপ, বাঘ—ওসব বাবা চিড়িয়াখানায় থাকে। এখানে ওই সব জন্তু কোথায় পাবে। এ যে মাঠ।

মাঠ কি মা ?

মাঠ—মাঠ। মাঠ আবার কি ? ললিতা বিরক্ত হয়। খোকা ললিতার আঁচল ধরে আব্দার করে, না—বলো-ও।

পাখি খোকাকে কাছে ডাকে—এসো খোকন, আমার কাছে এসো। আমি তোমার মাসি হই। যাবে আমার সংগে বেড়াতে ? বলে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটি টাকা বের করে খোকনের হাতে দেয়। —তুমি খেলনা কিনবে, তুলোর ছোট্ট একটা কুকুর কিনবে, কেমন ? ভেউ ভেউ করে ডাকে।

না, কুকুর—না। পাখি কিনবো। পাখি সাদা পাখি। খোকা টাকা হাতে নিয়ে বলে।

ললিতা বলে—ওঃ—পাখির ওপর যা ঝোঁক ওর।

পাখি বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ললিতা আর খোকাকে দেখে। কি স্বর্গীয় শান্তিই না আজ ললিতার জীবনকে স্পর্শ করেছে। খোকা হেসে ওঠে, ছুটে পালায় ললিতা আদর আর আবেগ মিশিয়ে খোকাকে ধমক দেয়, ঠিক ধমক নয়, ধমকের ছলনায় স্নেহ বিকীর্ণ করে।

পাখি বলে—তুমি যে জানতে চাইলে মাঠ কি ? তা জানলে না ?

খোকন আবার মাকে প্রশ্ন করে মা, বল না মাঠ কি ?

ললিতা বলে—তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা কর না।

খোকা মার কোল থেকে সরে গিয়ে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করে—বাবা, মাঠ কি তুমি বলো।

মাঠ ? মাঠ কি তুমি জানো না ? মাঠ হলো ছেলেদের খেলার জায়গা। ছেলেরা যেখানে দৌড়বে, খেলবে—সে জায়গাকে মাঠ বলে। অনিল সহজেই বুঝিয়ে দেয়।

খোকা বলে ওঠে—মা-টা কিছু জানে না। বোকা—। এক দৌড়ে দূরে ছুটে যায়!

ললিতা পূর্ব প্রসংগের জের টানে—বিকেলে ওর নিয়মিত মাঠে আসা চাই। একটি দিন কামাই হবার উপায় নেই। ওর যেদিন কাজ থাকে—আমিই নিয়ে আসি দস্যিকে। এক একদিন এমন হয়রান করে আমায়, সন্ধ্যে হলেও দুষ্টুটা কিছুতেই আমার কাছে আসবে না, দূরে দূরে দৌড়বে, নয়তো পিচের রাস্তায় নামবে। ভয়ে মরি তখন। দৌড়ে যে ধরবো—তা হয় না, খোকাও দৌড়বে—লুকো-চুরি খেলে। ওইটুকু বয়স হলে কি হবে পাখি, ওর পেটে পেটে শয়তানি বুদ্ধি।

পাখি সব দেখে, সব শোনে। কেমন একটা স্বর্গীয় মুগ্ধতার অনাবিল আনন্দলোকে তার চেতনা উন্নীত হয়। ললিতা বিরক্তির কথা বলছে বটে, কিন্তু প্রতিটি শব্দ ঝংকারে অমেয় খুসির কি নির্মল অভিব্যক্তি ঠিকরে পড়েছে!

দৌড়তে গিয়ে খোকার পা মুচকে যায়—এমন কিছু নয়, যৎসামান্যই। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে খোকা পড়ে যায় সেখানে। ছুটে যায় ললিতা, কি হলো দেখতে, পাখিও উঠে যায় সেখানে, খোকার কাছে। মার কোলে বসে পড়ে খোকা ছোট্ট পায়ের দিকে দেখায় ছোট হাতের আরো ছোট্ট ইসারা করে, পাখি সেখানে হাত বুলিয়ে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু খোকার কান্না যেন বাড়ে! ললিতা হাত দিয়ে পায়ের আহত স্থানটি টেনে দেয়, খোকা খিলখিলিয়ে হাসে। মা যে অন্য জিনিষ, অবোধ এই শিশুটা পর্যন্ত তা জানে। পাখির তা বোঝা উচিত ছিল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ললিতার ওঠার সময় হয়। পাখিকে অনুরোধ করে—পাখি চল, আমাদের বাসাটা দেখে আসবি।

অনিলও অনুরোধ জানালো—পাখির ইচ্ছা হলো না যেতে, এমনি অকারণে। সে বললে—আজ থাক ললিতাদি, অন্য একদিন যাবে—কথা দিচ্ছি।

চলে গেল ওরা তিনজন। পাখি চেয়ে থাকে সেই গতি পথের দিকে। মহিমময় হাঁটা ললিতার, কি উজ্জ্বল জীবন-জ্যোতি!

অথচ, অথচ এই ললিতাও ত, তারি মতো লালিত পালিত হয়েছে নারী কল্যাণ সমিতিতে। গৃহ শিক্ষকের নির্দেশে ঘর ছেড়েছে, ম্যানেজার অশ্বিনী ঘোষের সংগে বল্গাহীন উদ্দামতায় মিলেছে—কোথায় কোন্ পংকিল নোংরামির মধ্যে নিজেকে নামিয়ে দিয়েছিল ললিতা, কিন্তু আজ কে তাকে বলবে যে একদা সে বহু বল্লভপীড়িতা, সমাজের স্থির নীতির মানদণ্ডে সীমাহীন পাপের অধিকারিণী? সমাজ মানুষকে উন্নত করতে পারে না, কিন্তু শাসন করতে পারে। দুঃখিনীর কষ্ট দূর করতে পারে না, কিন্তু হুমকি চালাতে পারে। ললিতা নিজের চেষ্টায় জীবনকে টিঁকিয়ে রেখেছে, পাখির সামনেও মস্ত এক জীবনাদর্শকে তুলে ধরেছে। লেখাপড়ার পথ বাৎলেছে, বিয়ে থা করে ঘর বাঁধবার পরামর্শ দিয়েছে। পাখি কি হিংসেই করে ফেলেছে নাকি ললিতাকে?

ললিতা সার্থক হয়েছে, পাখির জীবনে এখনো নিশ্চয়তা আসে নি, স্থৈর্য আসেনি, তাই নিজেকে সম্পূর্ণ বিকশিত করতে পারে না। ললিতা আর অনিলবাবুর যে চটুল কথাবার্তা—তার মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই যেন জীবনের একটা মণিকর্নিকার সন্ধান মেলে। কিন্তু তার আর তপেনের কথোপকথনের মধ্যে ত' এই স্বর্গীয় দ্যুতি থাকে না। পাখি তা লক্ষ্য করেছে অনেক সময়।

তপেন কামনাকুটীল নয় বটে, কিন্তু পাখির হাতে ধরাও দিতে চায় না। বরং সে পাখিকেই ধরতে চায় এঁটে। অর্থ উপায়ের জন্যে তপেন উদ্বিগ্ন, জীবনকে উপভোগ করার জন্যে আদৌ ব্যস্ত নয়। অথচ তপেনকে না হলে পাখির চলে না। পতিত মেয়েকে গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা দেবে কে—তাই তপেনকে আঁকড়ে ধরেই তার প্রাণের শিকড় রস পেতে চায়। গৃহজীবনের সমস্ত স্বপ্নকে সার্থক করে বাস্তব করে মূর্ত করে তুলতে চায়।

॥ চার ॥

পাখি বাড়ী ফিরে এলো যখন—তখন বেশ রাত হয়েছে। ইতিমধ্যে তপেন কদিনের পর কোলকাতায় ফিরেছে; বাড়ী এসেছে। ঘরের চাবি থাকে শুকলালের কাছে। তপেনেরই বড় প্রিয় চাকর শুকলাল, শুধু চাকর নয়, চাকর রাঁধুনী, ম্যানেজার, গৃহস্বামী—একাধারে সবই সে। বাবু আসবেন জেনে সেদিন সে কোথাও বের হয় নি। সুতরাং তপেনকে কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি। তার স্নান করার, বিশ্রাম করার, চা পানের কোনো কিছুরই বিঘ্ন ঘটেনি; তবু সে আশা করেছিল এই কদিনের বিরহ-আগুনে জ্বলেপুড়ে পাখি তার আগমন পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু পাখি বাড়ী নেই শুনে তপেনের খুব খারাপ লাগলো।

শুকলালকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তপেনের মন চাইলো না। সে ছাদের ওপর কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। শুকলালের ওপর হুকুম হলো—আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে—দেখিস। এমন কি, তোর মা এলেও ডাকবি না আমায়।

জি হুজুর বলে শুকলাল নীচে নেমে গেল।

পাখি যখন বাড়ী ফিরে এল—তখন তপেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্ত দিনের ট্রেন জার্নি, তারপর সারা দুপুর গরম ভোগ, শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল! তাছাড়া পাখি সম্পর্কেও তার মনে একটু যে দুর্ভাবনা না জেগেছিল—এমন নয়।

কিজন্যে সে পাখিকে তুলে এনেছে ঘরে। কেন? পাখিকে তা খুলে বলার সময় এসেছে এখন। গেনুমাসির কাছ থেকে পাখির জীবনের মোটামুটি একটা ইতিহাস সে জেনেছে, কিন্তু পাখি যে

তপেনের কিছুই জানে না। একটু আঁচ দেওয়া দরকার। কেন সে পাখিকে এনেছে তার আশ্রয়ে—পাখিকে সে এবার স্পষ্ট করেই বলবে।

এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় ফিরলো পাখি। তপেনের ফেরার খবর সে শুকলালের কাছে জেনেছিল। ওপরের ঘরে এসে দেখলে তপেন শুয়ে আছে। ফিকে নীল আলো জ্বলছে, কেমন অগোছালো ঘর।

পাখি একবার ভাবলে—ডেকে তোলা যাক তপেনকে। আবার পরক্ষণেই কেমন মায়া পড়ে গেল তার। তপেনের মুদিত দুটি চোখ দেখে আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে পাখির মনটা মমতায় ভরে গেল। অথচ পাখি আজই তপেনের সংগে একটা হেস্তনেস্ত করবে বলে ওপরে উঠেছিল। ললিতার জীবন পরিপাট্য দেখবার পর সে নিজেকে বড় বেশী কাঙাল মনে করেছে। তপেনের কাছে সে একটা তারিখ চেয়ে নেবে, পাখি এই নগ্ন প্রত্যাশা এবং দীন প্রতীক্ষার ঝুলি নিয়ে আর কখনো বসে থাকতে রাজী নয়।

আজ রাতটা অন্ততঃ কাটুক, কাল সকালেই একবার শেষ বোঝা-পড়া করা যাবে। কেমন যেন মায়া হয় তপেনের ওপুর।

আজকাল কত লোককেই ত' কারণে অকারণে অপমান করে দেয় পাখি। কিন্তু তপেনকে সে দেখেছে অন্য চোখে, অন্যমন দিয়ে গ্রহণ করেছে। তপেন নগ্ন কামাতুর মানুষ নয়, বরং অতিরিক্ত রকম সংযমী। সে পাখিকে পত্নীত্বের মর্যাদা দিতে চায়, তার আগে নিজের সৌভাগ্যের ভিৎকে বেশ খানিকটা মজবুত করতে চায়। তপেনকে কেন্দ্র করে পাখির যে স্বামিত্বের আস্বাদ—তাতেও তপেনের বাধা নেই।

মাসের শেষেই হোক, অন্য সময়েই হোক, তপেন টাকা উপায় করে এনে পাখির হাতেই দেয়।—কই গো, গেলে কোথায়? ধরো ত' দেখি—এই কটা টাকা তুলে রাখো।

কোনো দিন বা বলে—পাখি, আমি বাইরে থেকে খেটে খুটে আনবো, তুমি শুধু তা খরচ করবে। আমার টাকা যে তোমারই পাখি। তুমি আমার কাছে কথা দাও—এখন আর অফিসের কাজে গিয়ে ক্লান্তি সঞ্চয় করো না.

এই রকম ভাবে একটু একটু করে পাখিকে তপেন তার অন্তরলোকে স্থান করে দিয়েছে—পাখিও তপেনকে নিজের মনোলোকের নিভৃত বেদীতে বসিয়ে পূজা করেছে, ভালবেসেছে।

এই সব কথা স্মরণ করেই পাখির মমতা হলো তপেনের ওপর।

পাখি তপেনের মাথার কাছে গিয়ে বসলো,—তাকে ডেকে তোলার চেয়ে বরং তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিলে তবু তপেন হয়তো শান্তিতে একটু ঘুমোতে পাববে। পাখি তপেনের মাথার ঘন চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে দিতে লাগলো।

নিজের জীবনের কথাই পাখি চিন্তা করে। একটু একটু করে এইভাবে তার নিজস্বতা নস্ট হয়ে যাচ্ছে নাকি? নিজের ভেতরের শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে? কতবার সে নিজেকে যথার্থ জীবনের মাঝখানে ন্যস্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি। সুস্থ সহজ জীবনাদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে রেখেছে মনের মধ্যে, কিন্তু তাও যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। দিশা পাচ্ছে না কোনো জীবন-চেতনার।

লেখাপড়া শেখার পথে তপেনের বাধাকেই বা কেন সে আমল দিয়েছে—আজ তপেনের মাথার পাশে বসে সে ভেবে পেলো না। তপেনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে। তপেন নিজেকে ব্যয় করে না বেশী, নিজেকে প্রকাশ করে না কিছুতেই—তবু তপেনকে কেন্দ্র করে পাখির মন আকুল হয়, তাকেই আঁকড়ে ধরে।

সেই জন্যই কি তপেনের প্রথম প্রতিবাদে সে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ জলাঞ্জলি দিলে?

পাখি চায় ঘর বাঁধতে, সংসারে যেমন মেয়েরা থাকে নিজের আত্মীয় পরিজনকে নিয়ে, স্বামী পুত্রের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে—নারীত্বের সেই দুর্লভ মহিমায় পাখি উন্মুখ হয়ে ওঠে। শুকনো বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে কি হবে? তাই তপেনের উপদেশ সহসা এমনই মিষ্টি লেগেছিল তার কাছে—কি হবে এত লেখা পড়া করে? মেয়ে জীবনের সার্থকতা বেশী লেখাপড়ার মধ্যে নয়, সংসার সাধনার মধ্যে, এই মনে করে তুমি পড়াশুনো করো পাখি। একবার যদি লেখাপড়ার ভূত ঘাড়ে চেপে বসে, সংসার ধর্ম করা আর তোমার পক্ষে সম্ভব পর হবে না, শুধু বই আর বই। আই, এ, পাশ করেছো। এই যথেষ্ট, এর বেশী আর দরকার হয় না।

ইদানীং তপেনও ভাবতে আরম্ভ করেছে—এভাবে পাখিকে আর কতদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে। পাছে পাখি হাত ছাড়া হয়ে যায় সেই জন্যে তাকে কলেজে ভর্তি হতে দেয় নি। পাছে জীবনের অন্য এক দীপ্তিতে পাখি মুগ্ধ হয়ে পড়ে, তাই তাকে জীবনের অন্যান্য সাফল্য থেকে সংগোপনে সরিয়ে রাখতে হচ্ছে। এভাবে আর কতদিন? শুধু লোভ দেখিয়ে মানুষকে চিরদিন ধরে রাখা যায় না, একটা জায়গায় শেষ হয়। দড়ি যত শক্তই হোক, বেশী টান করে বাঁধলে ছিঁড়ে সে পড়বেই।

পাখিকে পাকড়াও করেছে কেন? পাখির সংগে প্রায় বছর দুয়েক আলাপ হবার পরও তপেন পাখিকে নিজের অভিসন্ধি প্রকাশ করতে পারে নি। অথচ সংকোচের কিছু নেই। অনেক শক্ত আইনবহির্ভূত কাজ সে করেছে, অথচ একটা মেয়ের কাছে তার একি দুর্বলতা? হার মেনে যাবে সে? পাখিকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তার ভাগ্য ফেরাবার জন্যেই তপেন তাকে ঘরে এনেছে, আশ্রয় দিয়েছে, স্বামিত্বের অভিনয় করে পাখির মনকে অভিভূত করেছে।

পুরুষের বাসনাবহ্নির ইন্ধন হিসেবে পাখিকে পাপের পথে ঠেলে দেবার নীচতা নেই তার। এ ব্যাপারকে সে ঘৃণা করে। সে পাখিকে অন্য কাজে লাগাতে চায়।

অথচ ইচ্ছাসত্ত্বেও পাখিকে সব কিছু খুলে বলতে তপেন পারে নি।

পাখি যখন পরদিন দুর্বার হয়ে তপেনকে আক্রমণ করার ক্ষিপ্রতায় বলে উঠলো—আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমাকে কোন সামাজিক মর্যাদা দেবে কি না? বিয়ে তুমি করবে কি না—আমি জানতে চাই।

তপেন আবেগ-কম্পিত বিহ্বল কণ্ঠে ডাকল—পাখি।

তুমি আমাকে শুধু বলো আমি কোন্ অধিকারে এখানে পড়ে থাকবো, তোমার সংগে অবাধে মেলা মেশা করবো?

কোনো অসামাজিক সম্পর্কের মধ্যে বা কোনো অন্যায় অশোভন আচরণের মধ্যে ত' তোমাকে আমি টেনে আনি নি, পাখি।—তপেন নরম সুরে বলে।

পাখি শক্ত ভাবে দৃঢ় কণ্ঠে জানায়—বিয়ে করতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, এখনও বলো।

তপেন একটু আহত একটু বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে পাখির দিকে তাকায়।

পাখি বলতে লাগলো—যদি বিয়ে করার ইচ্ছে তোমার না থাকে, তবে স্পষ্ট করে তা বলে দাও, আমি নিজের ভাগ্যকে খোঁজ করে নিই। কি অন্যায় করেছি আমি তা জানি না। মানুষের মনকে, প্রাণকে তোমরা বিচার করে দেখতে জানো না। মেয়েদের মনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তোমাদের সকলের অভ্যেস।

পাখির বক্তৃতার মধ্যেই তপেন হঠাৎ বলে ওঠে—আমি তোমার সম্পর্কেই ভাবছি পাখি, কি করা যায়।

ভাবাভাবির আর কি? এখনো কি তোমার চিন্তা শেষ হয় নি?

না হয় নি। হলে ত' বুঝতে পারতে। দেখতেই পেতে আমার স্বরূপ কি। বাইরে আমি যতটা সরল,সাধারণ,—ভেতরে আমি ঠিক সাধু কিনা—তখন দেখতে পেতে। আন্দাজ করতে পারো?

একটু শংকিত একটু হতচকিত হয়ে পাখি জিজ্ঞাসা করে—কি ? কি আন্দাজ করবো ?

আমার ভেতরের রূপ ? বাইরের এই মানুষটার মনে কি থাকতে পারে তা।

পাখি একটু যে ভয় পেয়ে না যায়—এমন নয়। তপেনের আভ্যন্তরিক মনটাকে বিচার করে সে দেখেনি, দেখার দরকার বোধ করে নি। তপেন কি দুটো স্বরূপ নিয়ে বেঁচে আছে নাকি ? ভেতরে এক, বাইরে আরেক ? পাখির মনে হয়েছে তপেনের ভেতরটাই যেন বেশী পরিষ্কার। কোনো পংকিল দৃষ্টি নেই, কখনো আবিল ব্যবহার নেই। অথচ তপেন আজ একি বলে ? তপেনের চোখ মুখের আজ একি পরিবর্তিত রূপ ? লোকটার মধ্যে একটা হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে নাকি ?

তপেন বেশ উত্তেজনার সংগেই আরম্ভ করে—টাকাকেই আমি জীবনের প্রথম এবং প্রধান কাম্যবস্তু মনে করি। এই টাকা যে ভাবে হোক, উপায় করতে হবে। ছেলে বয়েস থেকে এই আমার সাধনা। ছাত্র জীবনে বি, এস, সি পরীক্ষা দিতে গিয়ে হলে নকল করার অপরাধে ধরা পড়ি, পাঁচ বছর পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বিদ্যার্জনের সহজ পথ ত্যাগ করে অর্থ রোজগারের গোপন সুড়ংগের সন্ধান করি। দু চারবার পুলিশের ধাতানি খাই, জেল হাজত পর্যন্ত ঘোরা হয়ে গেছে। এই অপরাধে দাদা আমাকে তাড়িয়ে দেন। তখন থেকেই আমি একা।

দম নেবার জন্যে তপেন থামে। পাখি একটু ব্যথিত হয়। এতদিন তপেনের সংগে আলাপ—তার এই বিচিত্রজীবন কথা ত' পাখি কখনো শোনে নি। তপেনের আবার দাদা আছে নাকি ? সে খবরও সে আজ এই প্রথম শুনলে।

কেন আজ এসব কথা শোনাচ্ছ আমাকে ? পাখি বলে।—পিছনের জীবন জানার জন্যে আমার কোনো ইচ্ছে নেই। অতীত

জীবন কবরে যাক, মুছে ফেলো তাকে। বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য।

তা জানি পাখি। তপেন জবাব দেয়,—তাই তুমি অতি সহজেই তোমার পিছনকে মুছে দিতে পারো। তোমার দেশ গাঁ, কিশোর জীবন—তোমার ওপর অত্যাচার—সব আজ ভুলতে পারো। কিন্তু আমি পারি না। প্রতি মুহূর্তেই আমার অতীত জীবন আমাকে দংশন করছে।

পাখি সে সব শুনতে চায় না। তপেন যে পাখির অতীত জীবনের ইংগিত করলে—সে কি জেনেছে নাকি আদ্যন্ত ইতিহাস? এই জন্যে কি তপেন তাকে স্পর্শ করে নি? বিবাহ করে নি? বেদনায় বিষণ্ণতায় পাখির চোখ দুটো জলে ভরে এল। কিন্তু সে-যাত্রা সে সামলে নিলে। তপেন আজ যখন মুখ খুলেছে—তখন এই পর্বটা শেষ করে ফেলাই ভালো। না-হয় তপেনের আশ্রয় সে ত্যাগ করবে। ধীরে ধীরে ভুলেও যাবে তপেনকে।

তপেন বলতে থাকে—আমার অতীত জীবনের কিছুটা ধারণা তোমার থাকা ভালো। কেননা—আজ বাদে কাল তুমি আমার স্ত্রী যদি হও, তাহলে বলতে পারবে না যে আমি তোমায় ঠকাচ্ছি।

কি যা তা বকছো? আমি ওসব শুনতে চাই না। তুমি চুপ করো।

চুপ আজ আর করবো না। মন যখন চাইছে, তখন সব বলতে দাও। আমার দাদা তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। অপরাধ আমি মাতাল, আমি রেস্থড়ে। আমি জাল জোচ্চুরি করি, আমি জেল হাজত ফেরা হাফ্ আসামী। বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কুলাংগার বলে দাদা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। নগদ কয়েক হাজার টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আমার ভাগের সম্পত্তি লিখিয়ে নিল। কাঁচা টাকা ধরে রাখার মতো কৃপণ চেতনা আমার নেই। সে টাকা উড়ে গেছে। যে সব পথে টাকা যায়—সে পথেই গেছে। আমোদ আহ্লাদে কিছু গেছে, আর কিছু গেছে টাকাটা বাড়াবার জন্যে নানা ক্ষেত্রে আগ্রহশীল চেষ্টায়।

দুঃখে দুর্দশায় ঘুরছি, মনে সুখ নেই, জীবনের নতুন কোনো অর্থ খুঁজে পাই নি। বন্ধুরা বললে—বিয়ে কর। গেনুমাসি আমার কাছে তোমাকে গচ্ছিত করে গেলেন। তোমার কথা যেটুকু জানি, তাতে বুঝলুম—তুমিও এমন একজনকে চাও, যাকে কেন্দ্র করে তোমার জীবন গড়ে উঠবে, আর আমিও এমন একজনকে চাই—যে আমাকে নরক থেকে স্বর্গে তুলবে। তুমি সে কাজ পারবে জেনেই তোমাকে কাছে টেনেছি।

কি এক স্বর্গীয় করুণায় পাখির মনটা ভিজে যায়। তার অতীতকে জেনে, সমিতির অনাথ মেয়ে বলে জেনেই তপেন গ্রহণ করতে চলেছে। তপেনের মতো উদার মহান্ মানুষ ত' বড় একটা চোখে পড়ে না সচরাচর।

তপেন বলে—দাদা ঠকিয়েচে আমাকে, আমি দাদাকে একবার দেখে নেবো। দাদার কাছ থেকে আমি আমার সম্পত্তির ন্যায্য দাবী করেছি, শুধু তা ফিরে পেলেই আমাদের বিবাহের আর বাধা কিছু থাকবে না। শুধু—

পাখি জোর করে তপেনেব মুখেব ওপব একটা হাত বেখে বলে ওঠে—দোহাই তোমার, তুমি আব কিছু বলো • না। উত্তেজনায তোমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। তপেন বাধা দেবার চেষ্টা করে, পাখির হাতটা মুখ থেকে সরিয়ে দেয়,—কি রকম কি কোমল হাতখানা পাখির! কালো রঙের জমিতে কি স্নিগ্ধ মোলায়েম লাবণ্য পাখির দেহে। তপেন পাখির হাতখানা মুখ থেকে সরিয়ে বুকে টেনে নেয়, পাখিও যন্ত্রচালিতের মতো কাছে সরে আসে। পাখি মুগ্ধ হয়ে চোখ বোজে। আবেগ-দরদী কণ্ঠে বলে—পাখি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো?

পাখি কোনো কথা বলতে পারলো না, শুধু তার মন আবেগে উত্তেজনায়, স্নেহে মমতায় টুক্‌রো টুক্‌রো হতে লাগলো।

॥ পাঁচ ॥

হাসি, কান্নার বিচিত্র উপলব্ধি নিয়েই মানুষের জীবন। এক এক সময় যখন দুঃখে বেদনায় এক অপরিসীম যন্ত্রণাকর অনুভূতিতে পাখির মন ভেঙে এসেছে, ঠিক সেই সময়ই আবার অন্তঃসলিল ফল্গুর মতো এক আনন্দ ধারা তার মনের কষ্টকে ধুইয়ে দিয়েছে। তপেন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় বিরক্তির পরই এসেছে এক অনাবিল টান।

তপেনকে আপন বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু সে যে তার ন্যায্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে—একথা আজ পাখি সহ্য করতে পারছে না। তপেনের প্রতি এই অন্যায় ব্যবহারকে সে নিজের প্রতি অন্যায় ব্যবহার-বলে মনে করছে।

তপেন বলেছে তোমার সাহায্যেই আমি এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব।

প্রতিশোধ? সে কি? পাখি শিউরে ওঠে।

প্রতিশোধ ঠিক নয়,—শুধরে নিয়ে তপেন বলেছিল—আমি বঞ্চিত হতে চাই না। যেখানে আমার ন্যায়সংগত দাবী আছে, সেইখান থেকে কেন আমি পিছু হটে আসবো? আমি সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ চাই। সেটুকু আদায় করতে হবে। একেই আর কি প্রতিশোধ নেবার কথা বলে ভাবছি।

এটুকুতে পাখিরও সায় আছে। সে ত' ভীরু মেয়ে নয়, অন্যায়কে স্বীকার করে অন্যায়কারীর প্রতি কথার অভিশাপ হেনে মনকে তুষ্ট করতে সে শেখে নি। নিজে সেও অনেক অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে।

তোমাকে একবার যেতে হবে কোলকাতার বাইরে, দাদার সংগে

দেখা করতে, এবং যে যে কথা শিখিয়ে দেব আমি, তাই বলে গিয়ে দাঁড়াবে।

কোলকাতার বাইরে বুঝি তোমার দাদা থাকেন ?

হ্যাঁ।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর কাছে আমি গিয়ে দাঁড়াবো—সেটা কি ভাল হবে ? কি পরিচয়েই বা যাব সেখানে ?

সে সম্পর্কে কি আর কিছু না ভেবেই এই প্রস্তাব তোমার কাছে রাখছি।—বলে তপেন একটু থামলে।

কিছুক্ষণ থেমে পাখির মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললে—কি পরিচয়ে তুমি সেখানে যাবে তা তোমাকে শিখিয়ে দেবার বোধহয় দরকার নেই। তবু দাদা একটু আত্মভোলাগোছের মানুষ হয়ে গেছে। শোকে তাপে একগুঁয়ে বদ্‌মেজাজী মানুষটা একেবারে বদলে গেছে। তুমি আজই ধরো আর দুদিন পরেই ধয়ো—এই বংশের বউ হবে। সুতরাং সবচেয়ে বড় যে পরিচয়, সেই মূলধন নিয়েই তোমার সেখানে যাবার অধিকার আছে।

বিস্মিতদৃষ্টি পাখি মুগ্ধ হয়ে তপেনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

ফাঁকে যে তুমিও পড়েছো। সুতরাং তোমাকে তোমার সম্পত্তি উদ্ধার করতে হবে। আর তা করতে হবে সেই পক্ষের কাছ থেকে, যে পক্ষ গ্রাস করেছে। তাই প্রতি মুহূর্তে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। আর—আর—বলে তপেন যেন দম নেবার জন্যে ইচ্ছা করেই একটু থামলো।

থামলে যে ? পাখি প্রশ্ন করে।

শত্রুপুরীতে তুমি যাবে কি ভাবে সে সম্পর্কে একটু চিন্তা করছি। হ্যাঁ—তোমাকে সেখানে নিজের যথার্থ পরিচয়ে গেলে চলবে না। ছদ্মবেশে ধারণ করতে হবে। অজ্ঞাতবাসে থেকে কাজ হাসিল করতে হবে।

অর্থাৎ ?—ঔৎসুক্যের সংগে পাখি তাকায়।

একটু নরম হয়ে আসে তপেনের গলা। সে নিস্তেজ হাসির অভিনয় করে শুকনো সুরে বলে—একটু অভিনয় করতে হবে। তুমি বোধহয় জানো, দাদার ঐ ছোট্ট ছেলেটি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমাকে বলেচি কি না আমার মনে নেই যে দাদা বিপত্নীক—এবং তাঁর আগের পক্ষে এক স্ত্রী ও তার দুটি সন্তান মারা গেছে। দাদাও আমার মতো টাকা পয়সা উড়িয়েছে পুড়িয়েছে। ইদানীং আধ-পাগলাগোছের হয়ে গেছে। দু নম্বর বৌদি মারা যাবার পর দাদা বদলে গেছে। ঐ ছেলেটি ছাড়া তার আর কোন কিছুর মোহ নেই। দাদা থাকে সাঁওতাল পরগণায়—করোতে। সেখানে কিছু বাঙালীর বাস আছে। শীতের সময় চেঞ্জার যায় প্রচুর, তুমিও চেঞ্জার সেজে সেখানে যাবে। তারপর কোন রকমে দাদার সংগে আলাপ জমাবে। কথায় কথায় শুনবে যে দাদা একজন অল্প বয়সী মেয়েয় খোঁজ করছে—ছেলেটির গার্জেন টিউটেস হিসাবে। তোমাকে সে কাজ নিতে হবে। খোকার সংগে চব্বিশ ঘণ্টা থাকার কাজ। মাইনের অংক খারাপ নয়। কিছুদিন পরে খোকা যখন তোমার একান্ত বাধ্য হয়ে উঠবে, তুমি দাদার সবচেয়ে এই দুর্বল স্থানে আঘাত হানবে।

কি তুমি বলছো? পাখি ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

প্রতিপক্ষের শরীরে সবচেয়ে ব্যথার জায়গায় ঘা দিলে কাজ হাসিল করতে বেগ পেতে হয় না। ধরো তুমি কিছুদিন খোকাকে কোথাও লুকিয়ে ফেললে—অবশ্য আমি সে ব্যবস্থা করবো। তারপর সম্পত্তির আর্ধেক ভাগ দিলে—একেবারে লেখাপড়া হয়ে গেলে তুমি তোমার ভাসুরপোকে সংগে নিয়ে গিয়ে দাদাকে প্রণাম করে দাঁড়াবে—তোমার আত্মপরিচয়ে—ছদ্মবেশে নয়।

ভয়ে বিস্ময়ে পাখির শরীরে শিহরণ লাগে। তপেন মানুষ না দৈত্য, না অতি-মানুষ? পাখি চট করে কিছু বুঝে উঠতে পারে না। দাদা তাকে ঠকিয়েছেন—সে কেন তার ন্যায্য অধিকার ছাড়বে। কিন্তু খোকনকে নিয়ে কেন তার খেলা?

আবার মনে হয়—এ ছাড় উপায়ই বা কি। আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হয়ে গছে—তপেন কতবার সে কথা বলেছে। এমন কি নিবেদনের শেষ দিনে তপেন যে গলাধাক্কা খেয়ে এসেছে—সে কথাও সেদিন সন্ধ্যায় তপেন বলছিল—আর দুঃখ প্রকাশ করছিল। শুনে পাখিরও ভারি কস্ট হয়েছিল।

কিন্তু পাখির সামনে এ আবার কি কঠিন পরীক্ষা? একদিকে তার নারীত্বের যথার্থ বিকাশ, স্বামীকে কেন্দ্র করে মেয়ে-জীবনের সমস্ত স্বাদ গ্রহণ, অন্যদিকে বৃহন্নলার দুশ্চর তপস্যার কি কঠোর পরীক্ষা। নিরবিচ্ছিন্নসুখ কোথাও নেই।

কি করবে সে? পাখি শক্তি চায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ক্ষমতা চায় সে।

কি, তুমি যে গুম হয়ে গেলে, কথা দিচ্ছ না যে করোতে যাবে কি না?—তপেন জিজ্ঞাসা করলে।

ভাবছি।—খুব সংক্ষিপ্তভাবে পাখি জবাব দিলে।

আমার কাজ কি তোমার কাজ নয়, পাখি? এখনো তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে?—তপেনের কণ্ঠে প্রার্থনার সুর ভেসে ওঠে।

এ কি বলছে তপেন? পাখিকে দূরে যে তপেনই সরিয়ে রেখেছে, এ সম্পর্কে তারই মনে বিক্ষোভ জমে আছে। অথচ পাখিকে তপেন কেন এ কথা বলছে? ছলনা করছে নাকি তপেন? অভিনয় করছে তার সংগে? বিস্ময়ের কিছু নেই। যে রকম চরিত্রের মানুষ বলে তপেনকে আগে মনে হয়েছিল পাখির, তপেন যে আদৌ সে রকমের নয়। কিন্তু ঠিক কি রকমের যে—তাও পাখির আয়ত্তের মধ্যে আসছে না।

একবার ললিতার সংগে পরামর্শ করলে হয়। কি পরিচয়ে সে যাবে করোতে,—আদৌ তার যাওয়া উচিত কি না। কিছুই বুঝে

উঠতে পারছে না। তালতলায় গিয়ে একবার ললিতার সংগে পরামর্শ করলে মন্দ হয় না। সে না পারুক—তার স্বামী অন্ততঃ একটা সুস্থ পরামর্শ দিতে পারবেন। ধর্মতলা থেকে সে হেঁটেই গেল তালতলায়।

তপেনের হয়ে একটা মস্ত অভিনয় তাকে করতে হবে। কিন্তু জীবন নিয়ে এ অভিনয় যে সাংঘাতিক রকম শক্ত। বাঁধা বুলি নেই যে মঞ্চে উঠে আউড়ে যাবে, বা ভুলে গেলে পাশ থেকে সুত্র ধরিয়ে দেবে। ছলনা বা চাতুরীর মধ্যে দিয়ে নিজের যথার্থ অস্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে অন্য আরেক সত্তায় বেঁচে থাকা—পাখি কি পারবে? অথচ স্বামীর জন্যে কি না পারে মেয়েরা? তপেনকে সে মনে মনে পতিত্বেই বরণ করেছে, এটুকু কি আর পারবে না?

তপেনের সংগে যখন প্রথম আলাপ হয় পাখির—কি বিশ্রীই না লেগেছিল। ড্যাবডেবে চোখে কি কুটিল দৃষ্টি হেনে গেনুমাসিকে তপেন প্রশ্ন করেছিল সে পাখির সম্পর্কে—মাসি, এই বুঝি শিকার?

কিন্তু সেই তপেনকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে নিয়েছে পাখি। শুধু গ্রহণ নয়, একেবারে গ্রাস। বিশ্রী কুটিল দৃষ্টিকে এখন মনে হয় কি সৌম্য সুন্দর চাহনি। টানা টানা চোখ। হাত পা নাড়াকে কেমন ছন্দোবদ্ধ মনে হয়। কাজকর্ম করার সময়, একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিচ্ছে কিম্বা লম্বা হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে—এই রকম সময়ে পাখি লক্ষ্য করে তপেনের দেহের গঠন সৌষম্য। কি সুন্দর মাস্‌ল, কি তার বিন্যাস।

এই রকম যে কোন মানুষকে মানুষ নিজের কত কাছে টানতে পারে—এ তারই প্রমাণ। দীর্ঘদিন সাহচর্যের জন্যে দূরের অপরিচিত একজন কত কাছে আসে, কত প্রিয়জন হয়ে পড়ে।

ললিতা বাড়ীতেই ছিল, কিন্তু তার খোকা আর অনিলবাবু নেই। ওরা দুদিন হলো বাইরে গেছে বেড়াতে অনিলবাবুর এক আত্মীয়ের

বাড়ীতে ; কাল ফিরবে। ললিতা স্কুলে ছুট পায় নি। সেজন্যে রয়েছে।

পাখি বললে—ভাগ্যিস, তুই যাস নি। নইলে আমাকে ত' ফিরে যেতে হতো।

তা বছরের মধ্যে ৩৬১দিন না এসে—ঠিক বেছে বেছে সেই চারটে দিনের মধ্যে যদি তুই আসিস—তা হলে তোকে ফিরতেই হবে। হঠাৎ কি মনে করে ?—ললিতা জিজ্ঞাসা করে।

এমনি, নিমন্ত্রণ রাখতে। সেদিন বললি অত করে। ঠিকানা খোঁজ করে করে আজ এলুম।

তা—এই দিনে ? এক পক্ষে অবশ্য ভালো হয়েছে। একা একা সময় কাটছে না। ছেলেটা কাছে না থাকলে ভালোও লাগে না। আয়, হাত মুখ ধুয়ে নে। চা খাবার কিছু খেয়ে—দু দণ্ড গল্প করি। তোকে অনেক খবর দেবার আছে—সমিতির খবর।

সমিতির খবর ? সত্যি, কতদিন পাখি খবর পাইনি সমিতির। গেনুমাসির, অশ্বিনীবাবুর, কামিনীর। এক একবার যে জানার ইচ্ছে হয় না—তা নয়। কিন্তু সমিতির দিকে পা বাড়াতেই কেমন একটা জুগুপ্সিত ঘৃণায় মন বার বার কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। তবু ললিতার কাছ থেকে সমিতির নতুন বা পরিণত খবর যদি কিছু সে শুনতে পায় —মন্দ কি।

হাত মুখ ধুয়ে চা খাবার খেতে খেতে দুই সখীতে মিলে নানান্ কথা হলো। সমিতির কথাই বেশী। অশ্বিনীবাবুকে সমিতি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ কেশ হচ্ছে। গেনুমাসিও ধরা পড়েছে। কামিনী আত্মহত্যা করেছে অবৈধ এক শিশুর সে মা হতে চলেছিল, সে অসুস্থ হয়েছিল, মুখে তার কদর্য রোগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। এমনি ত' আধ পাগলা গোছের ছিল। ইদানিং এলোমেলো অসংলগ্ন কথা বলতো। একদিন দেখা গেল গলায় দড়ি দিয়েছে। এই ব্যাপারে গেনুমাসির কারসাজি আছে বলে পুলিস সন্দেহ করছে।

তা ছাড়া গেনুমাসির বিরুদ্ধে আরও কি কি কেস আছে—তাতে ললিতাকেও সাক্ষী দিতে হবে।

পাখি কামিনীর জন্যে দুঃখ বোধ করে। অসহায় সরল মেয়েটিকে তার স্পষ্ট মনে পড়ে। রুগ্ন মুর্তিতেই তাকে বোধ হয় একবার দেখেছিল।

সমিতি সংক্রান্ত নয়। নিতান্ত ব্যক্তিগত কথাবার্তাও হয়। ক্রমে ক্রমে পাখি তপেনের প্রস্তাব পাড়ে। ললিতাও নানা প্রশ্ন করে জানে ব্যাপারটা কি।

ছেলেটাকে যে তুই আনবি চুরি করে—যদি তপেনবাবু তার কোনো ক্ষতি করেন?—ললিতা জিজ্ঞাসা করলো।

ক্ষতি আবার কি করবে? নিজের ভাইপো—না? দাদাকে এক রকম চাপ দিয়ে টাকা আমদানী করা।

এর নামই ব্ল্যাকমেল করা। আর যারা নিজের ভাইপোকে কেড়ে এনে ব্ল্যাকমেল করতে চায়—তারা যে কোন্ ধরণের লোক, আমি ভেবে পাইনা।—ললিতা বললে।

ভেবে পাখিও পায় না। কিন্তু কি করবে?

ললিতা একটু থেমে আবার আরম্ভ করে—ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে তুই যদি ধরা পড়িস, জেল খাটতে হবে। দু নম্বর হচ্ছে—ধর, তুই ছেলেটাকে তপেনবাবুর কাছে সরিয়ে দিলি, পুলিস এল, সন্দেহ তোকেও করবে, ক্রমে ক্রমে ধরতে পারবে ব্যাপারটা কি, আর যদি নাও ধরতে পারে, এমন হয়তো হলো যে তপেনবাবুর দাদা টাকা পয়সা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়.মনে করে শক্ত হয়ে বসলেন—তখন ছেলেটাকে ত' আর ফেরৎ দিতে পারবি না।

কেন? পারবো না কেন? সুযোগ বুঝে গোপনে বাড়ির কাছাকাছি ছেড়ে দিয়ে আসবো। —পাখি বললে।

তা সম্ভব নয় রে। যখনই ছেলেটাকে চুরি করে আনবি—তারপর থেকে আইনের চোখে তুই আসামী। ছেলেকে ত' বটেই, তোকেও

তখন তপেনবাবু লুকিয়ে রাখবেন। আর আমার মনে হয়—ছেলেটার ক্ষতি করতে পারেন।

পাখি ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে।

আমার কি রকম সন্দেহ হচ্ছে পাখি, যদি এই ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় না হয়, ছেলেটার মুস্কিল হবে।

না, না—আমি সে হতে দেব না, তা কখনো হবে না। ওরে, আমিও মা হয়েছিলাম—ছেলে কি জিনিষ—তা কি বুঝি না। দেখিস তখন—আমি তখন ফেরৎ দিয়ে আসবো। সে তোকে কথা দিচ্ছি।

—তা হলে তুই যাবারই—এক রকম ঠিক করছিস—পরামর্শটা এমনই। কিন্তু পাখি, ফেরৎ তুই ছেলেটীকে দিতে যাসনি কখনো—যদি কোন গণ্ডগোল বাধে - সামলাতে পারবি না। বংকিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইলে পড়িস নি,—খাঁটী উইলখানা ফেরৎ দিতে গিয়েই রোহিনী ধরা পড়লো। হরলাল তাকে ফেলে রেখে পালালো। দেখিস যেন লেখকের সেই কল্পনা বাস্তবে না ঘটে যায়।

ও অন্ততঃ হরলালের মতো মতলববাজ নয়—এ আমি বিশ্বাস করি। --পাখি প্রত্যয়-গভীর দৃঢ় কণ্ঠে জানায়।

ললিতা পাখির মন বুঝে তাকে আর বেশী বাধা দিতে পারে না।

ললিতার বাড়ী থেকে ফিরে পাখির মনে হলো রবীন চৌধুরীর কাছে তার জীবনের এই অধ্যায়টির আনুপূর্বিক বর্ণনা করে তাঁর পরামর্শ নেয়। সেই উদ্দেশে সে গেল বটে বইয়ের দোকানে, কিন্তু রবীনবাবুর দেখা মিললো না।

দোকানের আর সে চেহারা নেই। পাশাপাশি দুটো দোকান ঘরকে ভেঙে বড় একটা দোকানে পরিণত করা হয়েছে। বিরাট বড় কাউণ্টার। একদিকে বই প্যাক করে দেবার মেসিন। প্রকাশনা বিভাগের জন্যে টেবিল একটি, তার ওপর কাগজ এবং চারপাশে

চেয়ার ছড়ানো। নতুন রঙ করা দেওয়াল। ঝকঝকে তকতকে বই পত্তর, কাঁচের আলমারি, শো কেস। আলাদীনের প্রদীপের মতো রাতারাতি যেন সব বদলে গেছে!

দোকানের পরিচিত কর্মচারিটি পর্যন্ত নেই। তবু পাখি সংকুচিত হয়ে রবীনবাবুর খোঁজ করলে, দোকানটি এখনো রবীনবাবুরই আছে জানা গেল, কেননা রবীনবাবুকে কর্মচারীরা কর্তাবাবু বলেই ডাকে শোনা গেল।

রবীনবাবু দোকানে বড় একটা আসেন না। শুধু বইয়ের দোকান বড় করেছেন—তা নয়, একটা প্রেস কিনেছেন, তিনি সেই প্রেসেই থাকেন প্রেসের ঠিকানা চেয়েও পাওয়া গেল না। আর পাখির প্রেসে যাবার ইচ্ছাও ছিল না। গণেশ ওই প্রেসে বদলি হয়ে গেছে, জানা গেল।

অনেকক্ষণ বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এবার ফেরা দরকার, অন্য এক দিন রবীনবাবুর সংগে দেখা করলেই হবে।

কতদিন যে দেখা হয় নি! বেশ মানুষ রবীনবাবু, কাছে এস, চোখের ওপর দাঁড়াও, একান্ত আপনার মতো তোমার সুখে দুঃখে নিজেকে মিশিয়ে দেবেন। কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে তার মন থেকে মুছে যাবে।

পাখি তার স্নেহভাজন, অনুগৃহীত কৃপার পাত্র। একবারও কি মনে করলে দোষের কিছু হতো? পাখি তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট উপকার পেয়েছে বলেই না তাঁর সম্পর্কে পাখির এই কৃতজ্ঞতা। কিন্তু রবীনবাবুর কাছে তার যে আব্দার করবার সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। সেইটে কেন তিনি ভুলে যান,—পাখির ত' তাই অভিযোগ।

বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই তপেন পাখিকে ডেকে পাঠালো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা কিছু ব্যবস্থা ত' করতে হবে। তুমি যাবে কিনা—আমি এখনো জানতে পারলাম না।

যখন জানতেই কিছু পারোনি, বিশেষ করে আমার একটা আলাদা

মত কি—তা যখন আমি জোরের সংগে বলিনি, তখন তোমার মতই আমার মত—এও কি ব্যক্ত করে বুঝিয়ে দিতে হবে। দুষ্টুমির হাসি হেসে পাখি জানায়।

ছ্যাটস্ গুড্—বলে তপেন পাখিকে কাছে টেনে নেয়। এই উপযুক্ত কথা শুনে তার প্রাণমন যেন ভরে গেছে—এই রকম দিব্য তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্যে তার মুখ চকচক করে উঠলো। পাখি হয়তো বুঝলো না—এ অভিনয়।

বোঝবার উপায়ও নেই। তপেন এসব ব্যাপারে নিপুণ অভিনেতা। পাখি যখন মাথায় তেল মাখিয়ে দেয়, তখন চোখ বুজিয়ে থেকে তপেন কতবার এই স্বর্গীয় আরামের ঘোষণা করেছে, প্রতিটি কাজ হাতের কাছে এগিয়ে দেয় পাখি। মুখ ধুয়ে এলেই হাতের কাছে তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাখি। তপেন হাসে, নিবিড় ঐকান্তিতার পত্রলেখা এঁকে দুচোখে একটা মদির ভাব রচনা করে। কখনো বা পাখির দুটো হাত ধরে প্রার্থীর বিনয়-কুণ্ঠিত সংকোচ নিয়ে আবেদন করে কতদিন, পাখি, আর কতদিন, আমাদের মধ্যে এই ব্যবধানের দেওয়াল তোলা থাকবে? টাকার সুরাহা না হলে যে আমি চিরদিন তোমার কাছে পাপী হয়ে পড়বো, আমার সেই ভয়।

পাখি এসব কথার গভীর তাৎপর্য ধরতে পারিনি। তপেনকে তার ধীরে ধীরে আপন বলে মনে হয়েছে, তাই তপেনের কাজকে সে নিজের কাজ মনে করতে দ্বিধা করে না।

ললিতা যাই বলুক, তপেনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলাতেই তার স্বর্গ, এজন্যে যদি কোনো বিপদ আসে—তবে তাতেও সে পেছপা নয়। এই ত' তার অগ্নিপরীক্ষা!

॥ ছয় ॥

সন্ধ্যের সময় বের হতে হবে। হাওড়া থেকে পাখি কোথাও কখনো ট্রেনে চেপে যায়নি। হাওড়া ষ্টেশন সম্পর্কে তার এক রোমান্টিক কল্পনা মাঝে মাঝে তাকে উদাস করে দিয়েছে। সে অলস মধ্যাহ্নে নিদ্রাহীন শয্যায় শুয়ে কত দেশ বিদেশের অদেখা জায়গায় মনের ট্রেন ছুটিয়ে ঘুরে এসেছে—আর সে সব ট্রেন ছেড়েছিল হাওড়া ষ্টেশন থেকে। কি বড় ষ্টেশন হাওড়া, সব সময় লোকজনে গমগম করছে, লাইনে লাইনে ইঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করছে। কত লোক যে যায় হাওড়া থেকে, কোথায় কোন্ দেশে, কোন্ স্বপ্ন রাজ্যে—আজ পাখির জীবনে সে স্বপ্ন স্পষ্ট হতে চলেছে।

বিকেল না হতেই পাখি তৈরী হয়ে পড়লো। তপেন কিন্তু তাকে সন্ধ্যের সময় বের হতে বললেও আসলে ট্রেন যে রাত প্রায় দশটার সময় —সে কথা তপেন জানতো। তবে মেয়েদের ব্যাপার বলেই ঘণ্টা দুয়েক হাতে রেখে বলেছে, কিন্তু পাখি যে বিকেল থেকেই তৈরী হয়ে থাকবে— এমনকি কাপড় জামা জুতো পরে ট্যাক্সীর জন্যে অপেক্ষমান হয়ে থাকবে —তা কে জানতো?

গাড়ী হচ্ছে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার। প্রায় প্রত্যেকটি ষ্টেশনে থেমে সকাল সাতটা আন্দাজ কারমাটার ষ্টেশনে যাবে। সেখান থেকে চার পাঁচ মাইল করো।

বাংলাদেশের বাইরে কখনো পাখি যায়নি। শুনেছে পাহাড় পর্বতের কথা, সাগর উপসাগরের কথা, কখনো চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তপেনের দৌলতে সে সাধটুকু আর অপূর্ণ থাকবে না। এইখানেই যে আপন মানুষের সংগে অন্যজনের তফাৎ।

তপেন সংগে যাচ্ছে। করো পর্যন্ত যাবে না, কার্মাটারে নেমে অন্য

একজনের সংগে করোতে পাঠাবে তাকে। করোতে কোথায় থাকবে, কি করতে হবে—সে সব নির্দেশ করোতেই পাবে—যার বাড়ীতে থাকবে, তার কাছে। তপেনের এক বিশিষ্ট বন্ধু সে, সুতরাং জলে পড়ছে না পাখি।

সারা রাত পাখি ট্রেনে জানালার ধারে বসে কাটালো। মাঝ রাতের পর আধখানা চাঁদ পূর্বাকাশে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাও কার্যকর কিছু নয়, ট্রেনে বসে বাইরের দৃশ্যপটকে পরিষ্কার করে পাখির চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেনি। আবছা অস্পষ্ট আলোয় একটা ভূতুড়ে পরিবেশ রচনা করেছিল যেন। তার মনে হয়েছিল—রহস্যময় এক দূষিত পুরীতে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,—ট্রেনটা যেন জীবন্ত এক রাক্ষস। চতুর্দিকের গাছপালা মাঠ বন, দেখা অদেখা দৃশ্যপট, কুয়াশাঘেরা অস্পষ্ট চাঁদের আলো—সব কিছুই তার ভবিষ্যৎ সূচনা করছে। কিন্তু ট্রেনের ঝাঁকানিতে যখন আচ্ছন্ন ভাব কেটে গিয়ে সে সচেতন হতে পেরেছে—বাইরের দৃশ্যপটের ওপর পাৎলা চাঁদের আলো দেখে তার ভারি ভালো লেগেছে, মনে হয়েছে প্রকৃতিবধ্ ঘুমোচ্ছে পাৎলা জরিন ভয়েলের একটা আস্তরণ গায়ে দিয়ে।

সীতারামপুরের পরই সকাল হলো। বেশ পরিষ্কার আলো এসে লাইনের ধারে মাঠের ওপর গাছের ওপর বেঁকে পড়েছে। কি চকচকে আলো! কি সুন্দর কোমল ঘন সবুজ গাছপালা। কি ফাঁকা মাঠ, কিন্তু কি রকম উঁচু নীচু। কোথাও ছোট দু একটা পাহাড়। পাহাড়ও যে সবুজ হয়—তপেনই প্রথম তা বুঝিয়ে দিলে।

সকাল যে এত আশীর্বাদ নিয়ে এমন আনন্দ নিয়ে মানুষের জীবনে দেখা দিতে পারে, পাখির এ ধারণা ছিল না। এ কোন্ রাজ্য? তাদের গ্রামের কথা মনে হলো। সেখানেও পল্লীর প্রসন্নতা ছিল, সেই কাঁচা গ্রামের শ্যামলশ্রীর সংগে এই রুক্ষ অথচ নয়ন-মনোহর সৌন্দর্যের একটা তফাৎ আছে, কিন্তু তবু এ কত সুন্দর। প্রথম কোলকাতায় এসে যেমন নতুন এক উপলব্ধিতে তার মন ভরে গিয়েছিল, এখন আবার

কোলকাতায় রুক্ষতার শেষে এই প্রকৃতির মুক্ত উদ্যানে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার মধ্যে এক নতুন উন্মাদনা পাখি উপলব্ধি করে।

কারমাটারে নেমে পাখির ভালই লাগলো। ছোট্ট ষ্টেশন বটে, কিন্তু দেহাতী মানুষের সাঁওতাল মানুষের সমাগম দেখে তার খুব ভালো লাগলো। ষ্টেশনের সংগে লাগোয়া একটা বাজার বা গঞ্জ গোছের। সেখানে ভীড় লেগেছে। উল্টোদিকে একটি জমি বটগাছ ঘেরা তারই পূবদিক থেকে রাস্তা—লাল সুরকির পথ, সোজা করোয় চলে গেছে—মাইল চার পাঁচ।

ষ্টেশনের আশে পাশে কয়েকটি বাড়ী, বাঙালীরই—শীতের সময় যারা স্বাস্থ্য তৈরী করাব জন্যে আসে—তাদের বাড়ী। ষ্টেশনের কাছটাই যা সরগরম। তারপর বেশ ফাঁকা।

কারমাটার ষ্টেশনে নামতেই দুজন লোক এগিয়ে এসে তপেনকে সেলাম করে দাঁড়ালো, তপেনের সংগে পাখিকে দেখে তাকেও সেলাম জানালে।

এই তোদের দিদিমণি। লোটন, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ত'?

জী হ্যাঁ। কোনো গড়বড় নেই। মাইজীর বাসাভী ঠিক আছে। খানা পিনা—বিলকুল ঠিক।

লোটনের সংগে তার স্ত্রী এসেছে, নাম ভৈরবী। উভয়েই বাঙালী। আগে যখন এই অংশটুকু বাংলাদেশের মধ্যে ছিল, তখন থেকেই তারা এখানকার বাসিন্দা। বাংলা ভাষায় কথা বলে বটে, কিন্তু দু একটা কথার টান বেঁকে গেছে।

তপেনের অনুগ্রহে এদের সংসার চলে। লোটন তপেনরই জানা কোলকাতার কোন্ এক অপিসে কাজ করে। ভৈরবীও এখানে তপেনের দাদার ওপর, দাদার বেটার ওপর নজর রাখে, সেজন্যে সেও কিছু পায়। দিন চলে একরকম।

ষ্টেশন থেকেই তপেন লোটন আর ভৈরবার সংগে পরিচয় করিয়ে

দিয়ে পাখির কাছ থেকে বিদায় নিলে। পাখিরও চোখ ছল ছল করে উঠলো।

বিরহের কষ্টি পাথরে প্রেমকে না ঘষে নিলে তাকে খাঁটি সোনা বলে চিনবো কি করে পাখি? এ তোমার ব্রত উদযাপন, এ তোমার সাধনার সিদ্ধিলাভের শেষ পর্যায়।—তপেনও কণ্ঠে আবেগ মিশিয়ে গদগদ ভাবে জানায়, চোখেও আসন্ন বর্ষার সিক্তভাব জাগে।

পাখি নাটকীয় ঢঙে তপেনের পায়ে হাত দিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে। আচমকা এই ঘটনার জন্যে তপেন প্রস্তুত ছিল না, সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

কারমাটার থেকে করো যাবার জন্যে ছইতোলা গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে। কারমাটারের নাম পাখি আগেই শুনেছে। বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনী পড়ার সময়ে, তিনি এইখানে চেঞ্জে আসতেন।

ছইঢাকা গাড়ীতে বসলেও পাখি কারমাটারের পথের সব দৃশ্যই দেখতে পেল, ঠিক সামনে সে বসলো। ছোট ছোট শিশুগাছ, বাবলা গাছ—কোথাও ঝোপের সৃষ্টি করেছে। দূরে কাছে ইতস্ততঃ ছড়ানো শাল পিয়াশালের গাছ। ফাঁকা মাঠ, কোথাও ধান চাষ হয়েছে, কোথাও জমি সাংঘাতিক রকম উঁচু নীচু। মহুয়ার গাছ কোথাও কোথাও ঘন হয়ে জড়াজড়ি করে আছে। উঁচু নীচু পথ। দু এক মাইল অন্তর এক আধটা গ্রাম পড়ছে। কুড়ি বাইশটি ঘর—সাঁওতালদের, কি দীন অথচ বলিষ্ঠ জীবন! সারাদিন মেয়ে পুরুষেরা কাজ করে ফেরে, সন্ধ্যায় এসে নীড়ে জমায়েত হয়, ঠোঁট ধরে আদর করে জরুকে, মহিলাও সোহাগের মদিরা দিয়ে মাতাল করে তার মানুষটিকে।

প্রায় মাঝামাঝি একটা নদী পড়লো পথে। মরা নিস্তেজ নদী, শুকনো শীর্ণ খালের মতো। দুপারে বালি চিক চিক করে রোদে। কুটুস ফুলের চারায় কত রঙ বেরঙের ফুল, দুপারে মহুয়ার গাছ। কালো বড় বড় শিলা পাথরও ছড়ানো রয়েছে। নদীতে জল নেই

বললেই হয়,—তবু কাঁচের মতো পরিষ্কার জল। পাখির মনে হলো যেন নদীটি রোগ-কাতর একটী মেয়ের মতো, বালির বালিশে শুয়ে আছে।

কারমাটারের চেয়ে করো যেন আর একটু পল্লীশ্রীযুক্ত। কারমাটারে সহুরে ছাঁদ এসেছে। সেলুন হয়েছে, চায়ের দোকান হয়েছে, হাট নষ্ট করে দৈনিক বাজার বসাচ্ছে সেখানকার লোকেরা। ষ্টেশনের কাছে চেঞ্জারের ভিড়ে মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু করো সে রকম নয়। কত বড় বড় বাড়ী এখানে, নাম করা সেরা সেরা লোকের বাস। কেউ এখানে থাকেন, কেউ থাকেন কোলকাতায়, শীতের সময় শুধু এখানে এসে বেড়িয়ে যান। সব বাড়িতেই ফুলের বাগান। আর এখানকার সব বাড়িরই একটা করে নাম লেখা আছে আগে গেটের কাছে। দেব নিবাস, নিভৃত কুটীর, দত্তবাড়ী, চৌধুরী লজ, পলায়নী, দি রেষ্ট, মাতৃস্মৃতি, স্মৃতিসদ্ম।

এই স্মৃতিসদ্মই হচ্ছে তপেনের দাদার বাড়ী। লোটন সে কথা বুঝিয়ে দিলে। লোটন আরো বুঝিয়ে দিলে—বড় বাবুর লড়কা এমন সুন্দর আর এমন হাসিখুসি যে সারা করো কি, কারমাটারে ভি ওর জুড়ি নেই। ওই ছেলিয়ার তরে আপনাকে যেতে হবে। সে সব ঠিক হোবে।

যখনই এই কাজের কথা মনে হয়, যে জন্যে করোয় আসা—সে কথা যখনই মনে হয়—তখনই তার বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে আসে। মনে পড়ে—জীবনের এতখানি পথ অতিক্রম করে এসেছে সে, কিন্তু কখনো নীতির বাইরে, সত্যের আশ্রয় ছেড়ে এতটুকু তার পদপাত ঘটেনি, মিথ্যাচরণ করেনি সে কখনো। আর আজ? কিন্তু যদি তার এতে কোনো পাপ বর্তায়, তবে তা যেন তাকে স্পর্শ না করে! স্বামীর জন্যে সতী নারী যে আরো জঘন্যতর কাজ করেছে, তার তো কোনো অন্যায় হয় নি। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে বহু গল্পই ত' সে পড়েছে এ ধরণের।

হ্যাঁ, সে তপেনের নির্দেশকেই বেদবাক্য জ্ঞান করবে।

লোটনকে যতটা তপেন-ভক্ত মনে হয়, ভৈরবী কিন্তু ততটা নয়। ভৈরবী সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে স্বামীর সেবা করে। লোটন তার দেবতা। সে যখন বড় কর্তার খোঁজ চায়, সে জানায়, লোটন এসে জেনে যায়। তপেনের চিঠি বা নির্দেশ কিছুই সে গ্রাহ্য করে না। সাধারণ হিন্দু নারী—অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন। স্বামীর পা ধোয়া জলখেলে নারীর যে কোন শক্ত রোগ পর্যন্ত সেরে যায়—এই রকম বিশ্বাস করার মতো প্রাণ আছে। কোনো সন্তানাদি নেই। বয়স অনুপাতে চেহারা একটু ভারী হয়ে গেছে।

সে বলে—বড় শক্ত কাজ দিদি। বাপের কাছেসে ছেলিয়া নিআসা বড় শক্ত কাজ দিদি। তুমি সব জানো ত? তুমারে কি করতে হবে?

না জেনে কি আর এসেছি দিদি, জানি। তবে তোমরা যদি সহায় হও, কাজটা আর এমনকি শক্ত হবে।—পাখি একটু সাহসের সংগে মুখ ফুটে কথা বলে।

লোটন কোলকাতায় ফিরে গেছে, ওর ত' কাজ ফেলে বেশীদিন বসে থাকলে চলবে না। ভৈরবীর জিম্মায় পাখিকে সঁপে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। ভৈরবীও যথাসাধ্য ওই মেয়েটার সেবাযত্নে নিজেকে ব্যয় করছে।

একদিন বড় কর্তার সংগে আলাপ হয়ে যায় পাখির অতর্কিতে। সেদিনটায় ছিল করোর হাট। দুপুর থেকেই নানা গ্রাম থেকে নানা রকমের সওদা নিয়ে লোকজন এল। কত গরু মোষ ছাগলের আমদানী। ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, গাধার গাড়ী—কত ধরণের যে মালবাহী গাড়ী। হাট যে কি জিনিষ পাখির কোন ধারণা ছিল না।

ভৈরবীও হাট করে রাখে—তিনদিনের বাজার করে রাখতে হয়! সবাই তাই করে। হাটেই প্রথম ভৈরবী বড় কর্তাকে দেখিয়ে দিলে পাখিকে, বললে,—উই বড় কর্তা। তপেনবাবুর দাদা। নীতীশবাবু উয়াব নাম। এখানের রাজাবাবু, সবাই মান্য করে।

সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ব্যক্তি। মাথার চুল সাদা, কপালে বার্ধক্যের কুঞ্চন! মুখের আদল কতকটা তপেনের মত।

নীতীশবাবুর সংগে তাঁর ছোট্ট ছেলেটী রয়েছে। নাম করুণ কুমার। অপূর্ব সুন্দর ছোট্ট ফুটফুটে। কি চঞ্চলতা ছেলেটির চলনে বলনে। বাবার হাত ধরে হাঁটে বেরিয়েছে।

ভৈরবী রাজাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে, বললে—আপনার বেটার জন্যে উ বলছিল যে দিদিমণির কথা তিনি ত' আইছেন। আপনি আদেশ করেন ত' উয়াকে লিয়ে যাই আপনার কাছে।

বেশ, নিয়ে এস, কাল আমার কাছে সকালে—নীতীশবাবু বললেন।

দূর থেকে পাখি শুধু করুণ কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল। বছর ছ সাত হবে, চোখে মুখে কি অপূর্ব দীপ্তি, সৌম্যতায় সৌন্দর্যে এক দিব্য আনন্দে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই ছেলেটির গার্জেন-টিউটর হয়ে তাকে থাকতে হবে, কিছুদিন বিশ্বাসভাজন হয়ে থেকে একে চুরি করে নিয়ে কোলকাতায় চলে আসতে হবে! তপেন কি নির্দয়। এমন সুন্দর ছেলে সম্পর্কে ঈর্ষার ভাব পোষণ করে?

ভৈরবীর কথা মতো পাখিকে পরদিন যেতে হলো নীতীশবাবুর কাছে, চাকরীর জন্যে। এ চাকরীর মধ্যে দাসত্বের ক্লেদ নেই, একটি শিশুকে মানুষ করে তোলার যে আনন্দ—বরং সেই তৃপ্তি তার হবে। ছোট্ট শিশু সন্তানকে মনুষ্যত্বের মধ্যাহ্নে দীপ্ত করে তোলা যে নারী-জীবনের এক বড় শিল্পকর্ম—একথা পাখি মর্মে মর্মে বুঝেছে। নিজের জীবনে সেই সৌভাগ্য থেকে, সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত বলেই পাখির ভাবনা—যদি বা একটা সুযোগ আসে জীবনে, সেটাকে কি করে পায়ে মাড়িয়ে সে চলে আসবে।

নীতীশবাবু বেশ মোটা গলায় বললেন—বয়সে তুমি আমার চেয়ে

বেশ ছোটই হবে, গোড়াতেই তুমি বলে তোমাকে ডাকছি বলে অন্য রকম কিছু ভেবো না। তোমার নাম কি আর কতদূর পড়েছো?

পাখি মানুষটাকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করছিল। সাধারণ পোষাক পরিহিত, সহজ সরল কথাবার্তা—এই নাকি লাখপতি?

কি জবাব দিচ্ছ না যে—নীতীশবাবু পাখির চোখের দিকে একটু কড়া দৃষ্টি হেনে বললেন।

হ্যাঁ। আমার নাম পাখি।—আমতা আমতা করে জবাব দেয় পাখি।

পাখি? সে আবার কি? পাখি নাম ত' কোনো মেয়ের শুনিনি বাপু। কম মেয়ের সংগে ত মোলাকাৎ আমার হয়নি। পাখি?—ভালো নাম কি?—বিরক্তি ও বিস্ময় নিয়ে নীতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

পাখি বলেই ডাকে। ভালো নাম আমার নেই।

ও। কতদূর পড়েছো?

আই-এ পাশ করেছি। বি, এ, পড়তে পারিনি অভাবের জন্যে।

তোমারও অভাব? কি রকম অভাব? খেতে পরতে পাও? না—দুবেলা দুমুঠো জোটে না। তা শরীরটি ত' রেখেছো ভালই।

পাখি একটু অসন্তুষ্ট দৃষ্টি দিয়ে নীতীশবাবুর দিকে তাকালো। তিনি তা বুঝলেন। একটু নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কাজ এখানে তোমার জানো? করুণকে শুধু পড়ানো নয়, মা-হারা ওই ছেলেটার সমস্ত দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে! সময় মতো খাওয়ানো, পরানো, যত্ন আত্তি করা, আবার লেখাপড়া শেখানো। বোধনমায়ীর বয়স হয়ে গেছে—তাকে এবার ছুটি দিতে হবে।

বোধনমায়ী এক সাঁওতাল রমণী, নীতীশবাবুর বর্তমান অভিভাবক বলা চলে। যখন নীতীশবাবু যুবক ছিলেন—তখন এই সাঁওতাল রমণীকে এক দেহাত থেকে ধরে চুরি করে আনেন, তখন এর নিটোল মসৃণ স্বাস্থ্য ছিল। সেই থেকে এই মেয়েলোকটি এই সংসারে আছে।

নীতীশবাবুর প্রথম স্ত্রীর যখন প্রতিপত্তি ছিল খুব, তখন এই সাঁওতালনী ছিল বাড়ীর দাসীর মতো, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম অকাতরে করে থাকতো। দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবনকালে কখনো কখনো বোধনমায়ী পরামর্শ দাতার মর্যাদা পেয়েছিল। করুণের মায়ের অসুখের দেড় বছর একাদিক্রমে সে সেবিকার পদে উন্নীত ছিল। তারপর নীতীশবাবু বোধনমায়ীকে সংসারের ভার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু বৃদ্ধা সাঁওতাল রমণী আত্মমর্যাদাকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে নীতীশবাবুর কোনো প্রস্তাবে রাজী না হয়ে এই সংসারের এক শুভকাংখিনী হয়েই আছে। পাখি পরে কিছুটা ভৈরবীর কাছে, কিছুটা নীতীশবাবুর কাছে কথা বার্তায় এ সব কাহিনী জেনেছে।

নীতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কাজের কথা ত' শুনলে,—এবার বলো—কি মাইনেতে তুমি কাজ করতে চাও?

মাইনের জন্যে আপনার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে না। যা দেবেন—আমি তাতেই রাজী।

যদি আমি কিছু না দিই?

বেশ, দেবেন না—আমি তবুও রাজী।

আর যদি সব দিই,—তোমাকে রাজরাণী করে দিই?

পাখি চুপ করে রইলো। নীতীশবাবুর সংগে তার রংগ রসিকতার সম্পর্ক নয়—আর যাই হোক।

বেশ কাজে লেগে যাও। তোমার থাকার ঘরদোর বোধনমায়ী দেখিয়ে দেবে। আপাততঃ ওই সব তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। করুণ কুমারের ও ছাড়া এখনো পর্যন্ত আর কেউ নেই। শুধু কুমারের কেন, তার বাবারও।—নীতীশবাবু একটু বাঁকা দৃষ্টি দিয়ে পাখিকে দেখে বাইরে ফাঁকা আকাশের দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন—খাওয়া পরা বাদে আপাততঃ তুমি পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। অভাবের কথা যখন বললে,—তাই দেব। মেয়েদের অভাব আমি মোটে সহ্য করতে পারি না।

ভৈরবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্মৃতিসদ্মেই চলে এল পাখি, কিন্তু ভৈরবীর সংগে রোজ যোগ ছিল তার। গল্প হতো দুজনের। সরল গ্রাম্য মেয়েটিকে পাখির বেশ লেগেছিল। সে-ই প্রথম করোর জীবনের সংগে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছে। স্মৃতিসদ্মের নীতীশবাবুকে সবাই রাজাবাবু বলে ডাকে কেন। কটা নলকূপ তিনি বসিয়েছেন, হাটের চালা তুলে দিয়েছেন কত খরচ করে, কি রকম দাপটের সংগে দুটো স্কুল বসিয়েছেন এখানে—যে আসে—কি অহংকারের সংগে তাকেই তিনি দান করেন—এই সব গল্প ভৈরবীই তাকে শুনিয়েছে। তবে মেয়েদের সংগে রাজাবাবুর ব্যবহারটা কিছু নরম। মুডকুণ্ডায় তাঁর এক বিরাট বাগানবাড়ী আছে, সেখানে আগে কত যে রূপসী পুষতেন; তবে সে সব দোষ তাঁর একেবারে ঘুচে গেছে। শোকে তাপে ভেতরটা তাঁর ঝাঁঝরা। এখন শুধু করুণ কুমার অন্তপ্রাণ, বংশে বাতি দিতে ওই তাঁর একমাত্র সন্তান,—আহা, শিব রাত্তিরের সলতে!

বোধনমায়ীও পাখির কাছে করুণ কুমারের কথা বলে। ছেলিয়াকে বাঁচানোই হচ্ছে বুড়ার কাজ। বয়সে সে এমনই বুড়া নয়, বোধনমায়ীর থেকে দু বছরের ছোট, কিন্তু শোকে পুড়ে পুড়ে কর্তা একেবারে বুড়া হয়ে পড়েছে। উয়ারও যত্ন লিতে হবে।

ভাঙা ভাঙা গলায় বোধনমায়ীর বাংলা কথাগুলো এত মিষ্টি শোনায়। পাখির একটা মমতা জেগে ওঠে বোধনমায়ীর ওপর। কিন্তু কি যত্নপরায়ণ সাধনা, কি করে কোন্ ধনীর দুলাল খেয়াল বশে তাকে ধরে এনেছিল—তার চিকন কালো স্বাস্থ্যের সুরা পান করবে বলে, আর সেই থেকে সে ধনীর আবাসেই নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিল—সেবার মধ্যে দিয়ে, প্রত্যক্ষ ভাবে হোক, অপ্রত্যক্ষভাবে হোক—নীতীশবাবুর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করেই সে জীবনকে উৎসর্গ করে দিল! পাখির কাছে এ যেন এক নতুন প্রত্যয়। শিক্ষা দীক্ষা নেই বলেই বোধনমায়ী নারীত্বের আদর্শকে এই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে। আর পাখির

শিক্ষিত মন বলেই তপেনের কাজকে নিজের কাজ ভাবতে এত কুণ্ঠা, এত সংকোচ।

করুণ কুমারকে ধীরে ধীরে পাখির খুব ভাল লেগে গেল। এক একবার হিসেব করে দেখলে সে চমকে উঠতো, বিমর্ষ হয়ে পড়তো—তার ছেলেটি বেঁচে থাকলে এতদিন বছর ছয় সাতের হতো, করুণেরই বয়সী হবে। কতদিন পরে আবার সেই উৎপীড়িত জীবনের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। সন্তান পেটে এসেছে শুনে আতর আলি তার ঠোঁটটুকু নেড়ে বলেছিল—পাখি, তবে এবার সাতনলি মোতির মালা একখান দিমু, গলায় পরলে যা দেখাইব তরে।

কিন্তু সে স্বপ্ন সে আহ্লাদ কোথায় কোন্ বায়ুস্তরে ভেসে গেছে, মৃতবৎসা না হলে তার ছেলেটিও আজ এত বড়টা হতো। যে ছেলের পরিচয় দেবার সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, সেই সন্তানের জন্যে এতদিন পরে মনটা টনটন করে উঠলো। হা রে মায়ের প্রাণ!

করুণ তাকে মা-মণি বলে ডাকে। পাখি বলেছিল—দিদিমণি বলে ডাকতে। কিন্তু করুণ বললে—বাবা যে তোমাকে মা-মণি ছাড়া আর কিছু বলতে বারণ করে দিয়েছে!

তা হোক, আমাকে দিদিমণি বলো।

বারে—বাবার কথা বুঝি শুনবো না। মুখ বেঁকিয়ে করুণ এমন ভংগীতে কথাকটি বললো, মনে হল যেন কত জ্ঞানবৃদ্ধই সে হয়ে পড়েছে।

করুণের মুখে এ ঘটনা শুনে নীতীশ একদিন পাখিকে বললে—মা বলে তোমাকে করুণ ডাকে, এতে তোমার আপত্তি কেন? মা-যে কি, তা বোঝবার আগেই ও মা হারিয়েছে। মা ডাক শেখাবার আগেই ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে। পৃথিবীতে এই রকম একটা মধুর উচ্চারণ থেকে কেন করুণ বঞ্চিত হবে—তাই আমি তোমাকে মা-মণি বলে ডাকতে বলেছি। তাছাড়া—

বলে হঠাৎ নীতীশবাবু থামলেন। পাখিও একটু অধীর আর আগ্রহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো—নীতীশবাবুর বক্তব্যের শেষটুকু শুনতে। কিন্তু নীতীশবাবু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—না, সে হবার নয়। যাক।

করুণের সংগে খেলাও করে পাখি, কখনো ব্যাটবল, কখনো চোর চোর। রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনায়, বাংলার মণীষীদের জীবনী আলোচনা করে। বিকেলে ছাদে ওঠে, সূর্যাস্ত দেখায়, আকাশের আলো, গাছপালা, খোলা জায়গার বাতাস—সব কিছুর পটভূমিতে করুণ কুমারকে পাখিও কখন নিজের ছেলের মতই মনে ভেবেছে। তার সুখে দুঃখে, আহারে বিহারে, কথাবার্তায় পাখি নিজের জীবনকে বিকীর্ণ করে দিয়েছে।

পাখি নিজের হাতে চান করিয়ে দেয় করুণকে, নিজে হাতে করে ভাত খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। বিকেলে গা হাত পা ধুইয়ে দিয়ে সাজিয়ে দেয়। কখনো কখনো আদর করে করুণ, কখনো বা বায়না। আদর করে কিম্বা বিরক্ত হয়ে দু এক ঘা যে পাখি বসিয়েও দেয় না, এমন নয়। কিন্তু করুণ মা-মণির কাপড়ের আঁচল ধরেই কান্না জুড়ে দেয়। পাখিরও কান্না পায়। সেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিশোর একটি কচি ছেলের গায়ে হাত তোলার যন্ত্রণায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তার মন। নীতীশবাবু লক্ষ্য করেন, কিছু বলেন না, বরং খুসিই হন। করুণের সামান্য একটু জ্বর হলে পাখিরই উদ্বেগ হয় বেশী। নীতীশবাবুকে বলে—আপনার এই হোমিওপ্যাথিক ছেড়ে করুণের জন্যে চিত্তরঞ্জন থেকে ডাক্তার আনান। সেই কাল বিকেলের পর আর জ্বর ছাড়ে নি।

এখন জ্বর কত?

বেশী তেমন নয়, একশো আজ ওঠে নি। কিন্তু তিনটে দিনই বাছা আমার কেমন রোগা হয়েছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখটা কত ছোট হয়ে গেছে। তাই বলছিলাম—

ভাবনার কিছু নেই পাখি। এ রকম জ্বর ওর মাঝে মাঝে হয়। কাল পশু'র মধ্যেই সেরে যাবে। প্রথমে ব্রায়োনিয়া, পরে রসটক্স্—এই হলো ওষুধ। আমার ভালই লাগে পাখি, তোমার উদ্বিগ্ন মুখের এই আতুরতা।

পাখি এটু লজ্জিত হয়ে পড়ে।

নীতীশবাবু তাও লক্ষ্য করলেন, বললেন—লজ্জাও তোমাকে বেশ সুন্দর করে গড়ে।

পাখি দৃশ্যান্তরে চলে গেল।

বোধনমায়ীর চোখ এড়ায় না—রাজাবাবু কেন ঘুর ঘুর করেন পাখির পেছনে! চন্দ্রালোকিত উন্মুক্ত আকাশের তলায় করুণকে কেন্দ্র করে পাখির সংগে ছাদে বসে রাজাবাবুর আলাপ কেন—তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না বোধনমায়ী। নারী সম্পর্কে রাজাবাবু দুর্বল ছিলেন এতকাল, কিন্তু ইদানিং সে উপসর্গ কাটিয়ে উঠেছিলেন। আবার এই তরুণীটিকে কেন্দ্র করে কি তাঁর চাঞ্চল্য জেগেছে? একটুখানি সতর্ক দৃষ্টি রাখে পাখির ওপর।

বুড়ী পাখির সংগে নানা দুঃখ ও সুখের কথা আলোচনার করে, নিজের জীবনের কথা বলে, রাজাবাবুর জীবনী শোনায়।

রাজাবাবুর কি ছিল আর কি ছিল না। এঁদের পূর্বপুরুষের কটা পোষা হাতিও ছিল। কম বড় লোক এঁরা নন। রাজাবাবুরা দু-ভাই নীতীশ কুমার হচ্ছেন বড়, আর গিরীশকুমার ছোট।

নীতীশবাবুর ভাই গিরীশকুমার? সে কি?

হঁ্যা। বোধনমায়ী যা বলছে—পাখি প্রশ্ন না করে তা শুনুক। বুঝবে কত বড় বংশের মানুষ এঁরা। গিরীশকুমার অল্প বয়স থেকেই বেতালা হয়ে পড়েন। রাজাবাবুও হয়েছিলেন—তবে মদে তাকে খায় নি, তিনি বাইজী নাচাতেন বাড়ীতে, রেসের ঘোড়া পুষতেন। দুঃস্থ মেয়েদের সাহায্য করতেন, সুন্দরী মেয়েদের চুরি করে আনতেন। গিরীশকুমার জাল জোচ্চুরির দিকে যান। মদে দিন রাত ডুবে

থাকতেন। বংশ ডুবে যায় দেখে দুভাই একদিনে বিয়ে করলেন। কোলকাতার এক বড় ধনীর মেয়েকে রাজাবাবু আনলেন এখানে বউ করে। আর গিরীশকুমার ভেটাগুড়ির রাজার মেয়েকে বিয়ে করে কোলকাতায় বাসা বাঁধল। বিয়ের পরই দু-ভাই হলো আলাদা। সম্পত্তি ভাগ হলো। গিরীশকুমার তার অংশ দাদার কাছে বিক্রী করে প্রায় লাখখানেক টাকা নিয়ে শেয়ার মার্কেটে, রেসের মাঠে ভাগ্য ফেরাতে গেল। ছেলে বউ নিয়ে হল তার কষ্ট, দাদার কাছে এসে হাত পাততো। দু দশ হাজার করে টাকা নিয়ে যেত। রাজা-বাবুর প্রথম বউ মারা যাবার পর—যখন দু নম্বর বউ এল, তখন থেকেই গিরীশকুমারের টাকা বন্ধ হয়ে গেল। রাজাবাবুর আগের পক্ষের দুটো ছেলে ফুড-পয়সনে মরে যাবার পর তাঁর কেমন সন্দেহ হলো যে ফুডপয়নের পেছনে গিরীশকুমারের হাত আছে। ফলে গিরীশের এ বাড়িতে ঢোকা নিষেধ হয়ে গেল। ভৈরবীর সোয়ামি লোটনাকে নিয়ে সে সেই যে কোলকাতা গেল, আর ফিরে আসে নি। রাজা-বাবুর শুধু ভয় গিরীশ করুণের কিছু ক্ষতি না করে। সে যা নিষ্ঠুর নির্দয় গুণ্ডা, যে কোন নৃশংস কাজ করতে তার বাধবে না।—করুণ কুমারকে একবার যদি সে পায় কাছে এমন কি তাকে হত্যা করাও তার পক্ষে—

শিউরে ওঠে পাখি। প্রাণ ভেঙে পড়ে, গা মাথা ঝিম ঝিম করে, সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায়।

এই রকম একটি সুন্দর দিব্যদীপ্তিমান ছেলের প্রতি একি নিষ্ঠুর মনোভাব! আর, আর পাখির কেমন সন্দেহ হয়—তার তপেনই বুঝি গিরীশকুমার। বোধনমায়ীকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়, আকৃতি আর প্রকৃতি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে মিলিয়ে নেয় তপেনই এই গিরীশকুমার।

পাখি তবু নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা মায়ি, তোমাদের গিরীশকুমারের বাঁ চোখে ভুরুর পাশে এক ইঞ্চি কাটা দাগ আছে কি?

বোধনমায়ী ঈষৎ আশ্চর্য হয়, সন্দিহান দৃষ্টি হেনে পাখির মুখের দিকে তাকায়, বলে—তা বেটী, তুই জানলি কেমন করে।

পাখি তপেন সম্পর্কে আছন্ত কিছু ব্যক্ত না করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললে—এই রকম একটা লোককে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু নামে তার সংগে মিলছে না বলেই আমি কিছু বলছি না।

বোধনমায়ী বললে—নামে না মিলতেও পারে। যেখানে সেখানে ও নানা নামে ঘুরে বেড়ায়। এখন ত' ওর বউ ছেলিয়া কুছ নেই। সব ওর থেকে দূরে গেছে। ও ফিকিরে আছে।

পাখি জিজ্ঞাসা করলে—এখানে আসে না?

আসবেক কি—রাজাবাবু যে কেস করিয়েছে। উয়ার নামে লুটিশ আছে। পুলিস এখানে ঢুকতে দেয় না।

ভৈরবীর কাছেও পাখি গিরীশকুমারের নিন্দা শোনে। তবে তপেন যে গিরীশকুমার—তা কিন্তু সে জানে না। লোটনের কাছে সে কিছু শোনে নি। তপেন লোটনকে দানাপানির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এই জন্যে তপেনের কাজকর্ম কিছু করে দেয় লোটন। আর তপেনের এই রাজাবাবুর ওপরে কিছু নজর আছে, তাই এঁর সুখদুখের খবরটুকু নেন—লোটন মাঝে মাঝে আসে, খবর নিয়ে যায়। তাতে মনে হয় তপেন এই রাজাবাবুকে জানে। কিন্তু ভৈরবী কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি, লোটনও নিজে থেকে পাখিকে কিছু বলে নি।

সব মিলিয়ে পাখির কেমন যেন ঘোরালো মনে হয়। তপেনের কথা আর কাজের সংগে গিরীশকুমারের মৌলিক মিল কি আদৌ নেই? চিন্তা করে পাখি। তপেনের জন্যে, তপেনের জন্যে কেন—নিজের জন্যে, নিজের প্রীতি ও প্রেমের জন্যে সে এখানে এসেছে, কাজ হাসিল করা ত' দূরে থাক, মেয়ে-জীবনের সবচেয়ে যা কামনার জিনিস, সন্তানের মা হওয়া, সেই জিনিসটাই যেন সে পেয়ে গেছে অতর্কিতে। এর জন্যে

তাকে বিশেষ কোনো মূল্য দিতে হয়নি। যাকে চুরি করে নিয়ে তার ঋদ্ধির পথ, জীবনের পথ সে উন্মুক্ত করবে, সে কিনা স্বেচ্ছায় ধরা দিয়ে নারীজীবনের সবচেয়ে বড় মমতার স্থানটিতে আঘাত হেনে তাকে শুধু মা মণি ডাকের নয়, বাচনিক গৌরবে নয় মাতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর হয়ে বসলো। পাখিরও নেশা ধরে গেল—করুণ কুমারের কাজ না করলে তার চলে না। মা যেমন ছেলেকে আদরে, ধমকে, স্নেহে সোহাগে, ক্রোধে ভালবাসায় রচনা করে, নিজেকে সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত করে দিয়ে যেমন করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পাখিও ঠিক তেমনি করে করুণের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করে ব্যাপ্ত করে দিয়ে তার নারীজীবনকে ধন্য করে তুলছিল।

ধীরে ধীরে সে কি তপেনের থেকে দূরে সরে আসছে?

ইতিমধ্যে একবার হাটের দিনে করুণ কুমারকে নিয়ে পাখি একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল কারমাটারের পথে, নদীটার কাছ বরাবর যাবে। চৌধুরী লজের কাছাকাছি এসে একজন লোক যেন তার পিছু নিলে বলে মনে হলো। বার বার পাখির দিকে লোকটি তাকাচ্ছিল এমন-ভাবে—যেন পাখি তার কতকালের চেনা। পাখিরও লোকটাকে চেনা মনে হলো, কিন্তু স্পষ্ট মনে করতে পারলো না কোথায় দেখেছে তাকে। কিন্তু লোকটির গতি দেখে—পাখি আর বেড়াতে গেল না, চৌধুরীলজের পরেই ফাঁকা মাঠ, শাল পিয়াশালের জংগল, মহুয়া গাছের মাঠ দিয়ে পথ। লোকটি পিছু নিয়ে মনে করে সে বাড়ীর দিকেই ফিরলো। লোকটিও অমনি ফিরে হাটে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে এসে পাখি হাঁফাতে লাগলো।

বোধনমায়ী জিজ্ঞাসা করলো—একি, হাঁফাস কেন? কুচ্ হয়েছে নাকি?

করুণ কুমার বললে—না কিচ্ছু হয় নি। মা মণি চৌধুরী কাকুর ম্যানেজারকে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলেন।

কোন্ ম্যানেজার? বোধনমায়ী প্রশ্ন করে।

—ওই যে গণেশবাবু, এখন যে প্রেসের ম্যানেজার হয়ে গেছে।

গণেশবাবু? পাখির এইবার মনে পড়ে—লোকটি কে। রবীন-বাবুর বইয়ের দোকানের কর্মচারী। সেই গণেশই ত'—এখন স্পষ্ট মনে পড়েছে। ছি, ছি, কি লজ্জার কথা। গণেশবাবুকে দেখেই তার এত ভয়। কোলকাতার পথে কত লোলুপ দৃষ্টির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নির্ভয়ে চলতে পেরেছে সে, আর এখানে একটি চেনা লোকের সংগে পথ চলতে তার এত আশংকা? গণেশ বার বার তাকাচ্ছিল—তার সংগে কথা বলার জন্যে, পূর্ব পরিচয়ের সূত্র টেনে, তবে ভরসা পাচ্ছিল না বলেই হয়তো তার দ্বিধা ছিল। কিন্তু গণেশ এখানে এল কেন?

আজকাল পাখির ভয় বেড়েছে। চেনা অচেনা কোনো মানুষকেই সে যেন সহ্য করতে পারে না। নীতীশকুমার মাঝে মাঝে পাখির দিকে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। পাখি অনিচ্ছা প্রকাশ করলে হয়তো কোন কোন দিন তিনি বলতেন—তোমার দিকে চেয়ে থাকলেও একটা শান্তি জাগে মনে। তোমার কথা বলার ঢঙ, চলে যাওয়ার ছন্দ—মনে আনন্দ জাগায়। তুমি যে খোকার সংগে লুডো খেল, মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমি দেখি—খোকার ছয় পড়লে বা খোকা তোমার ঘুটি কেটে দিলে তোমার মুখে যে আনন্দের ছায়া পড়ে—সেই স্বর্গীয় খুসিটুকু দেখে আমার প্রাণ ভরে যায়। তোমার হাতের আঙুলগুলি নাড়া দেখি, কি বিচিত্র ললিত বিন্যাস। যে ভাবেই তুমি আঙুল নাড়ো না কেন—একটা ছন্দ ফুটে ওঠে।—অথচ তুমি ত' কোনো দেহচর্চা করো না, সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে কোনো প্রসাধন ব্যবহার করো না। যারা যথার্থ সুন্দর হয়, তাদের আর বাইরের কোনো উপসর্গের দরকার হয় না।—বলে হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

পাখির প্রথম প্রথম ভয় হতো—এ ধরণের কথা শুনতে, কিন্তু করুণের মুখের দিকে চেয়ে আজকাল এসব কথাগুলি নীরব বিরক্তির সংগে সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। করুণকে ছাড়তে এখন তার প্রাণ চায় না।

পাখি এক একবার ভাবে নীতীশকুমারের বোধহয় কোন মতলব আছে, সেইজন্যে তাকে অত্যন্ত বেশী সতর্কতার সংগে দিন কাটাতে হয়। একদিকে খোকার জন্যে সমস্ত মমতা, অন্যদিকে তার বাবার কাছে থেকে আত্মরক্ষার সাহস—পাখি তাই ধীরে ধীরে চেনা অচেনা মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে তপেনের সম্পর্কে। তপন তার হৃদয়ের কত কাছে ছিল! অথচ বোধনময়ী নীতীশকুমার প্রভৃতির কাছ থেকে গিরীশকুমার সম্বন্ধে যে সব কথা শুনছে সে—তা যদি সত্যি হয়—তাহলে তপনকে কি করে সে নিজের একান্ত আপন জন ভাবতে পারে।

তপেনের কত স্মৃতিই না তাকে আজ মুগ্ধ করে, বিহ্বল করে। এই ত সেদিনও—কারমাটারে নামিয়ে দিয়ে সে বলে গেল—বিরহের কষ্টি পাথরে ঘষা না হলে খাঁটি সোনা বলে চিনবো কি করে পাখি? এ তোমার ব্রত উদ্‌যাপন। এ তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভের শেষ পর্যায়।

না, না। তপেন এত হীন হতে পারে না। পাখির তপ্ত হৃদয়কে সে সিক্ত করেছে, বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনা একটি মেয়েকে সে নারীত্বের মর্যাদা দিয়েছে। তপেনকে কি করে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখবে?

তবু ধীরে ধীরে মানুষ জাতটার প্রতি একটা ভয় ধরে যায়। নীতীশ কুমারের বিলোল চাহনিতে তপন আর গিরীশের সম্ভাব্য অভিন্নতায়—পাখি যেন অস্থির হয়ে উঠে। একটা উপায় তাকে করতে হবে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত দিনগুলিতে যখন করোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জ্বলে পুড়ে ওঠে,—তখনই বিশেষ করে বিদ্রোহ করে মন। একটা সিদ্ধান্তে তাকে পৌঁছতে হবে। কি সে করবে?

ঠিক এই রকম সময়ে লোটনের মারফৎ তপেনের কাছ থেকে ডাক আসে,—ক'দিনের ছুটি নিয়ে তুমি কোলকাতায় চলে এস। কাজ আছে। তোমারই কাজ, পাখি তোমার জীবন পথেরই কাজ। এস।

তপেনের ডাককে অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই, পাখি দুদিনের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় চলে এল।

॥ সাত ॥

সকালের ট্রেনেই ফিরতে হলো—বেনারস এক্স্‌প্রেসে। করুণ কিছুতেই ছাড়তে চায় না, নীতীশকুমারও ছুটি দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু পাখির একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন আছে,—পিছনের অভ্যস্ত অতীত আছে, কাজেই সে শুনবে কেন নীতীশকুমারের বাধা। নীতীশ বলেওছিলেন অনেক করে, আবেগ মথিত হৃদয়ের আকাংখা প্রকাশ করে,—কেন তুমি যেতে চাও পাখি? ছেদ টেনে দাও তোমার অতীত জীবনের। নতুন আরেক অধ্যায় সুরু করতে পারো না কি? পাখি—

বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলে এই আবেগকে পাখির মনে হয়েছে। সে জন্যে এ সব কথার কোন জবাব দিতে হয় না। বয়স্ক অনাথ মেয়েকে এমন ধারা কত হৃদয়রস ছড়াবার কথা শুনতে হয়—তার হিসাব নিকাশ থাকে না। নীতীশকুমারও আধপাগালাগোছের, তাই ওঁর কথা ধর্তব্য নয়। কিন্তু পাখিকে জড়িয়েছে করুণ।

মা-মরা অসহায় করুণ ছেলেটির জন্যে পাখির যে মমতা জন্মেছে—তাকে অস্বীকার করতে পারে না পাখি। করুণকুমার তার মনে প্রাণে জড়িয়ে পড়েছে। করো থেকে কার্মাটার—এই চার মাইল পথের ব্যবধান যেন কত সুদূর বলে মনে হচ্ছে। বিশ্রী লাগছিল পাখির। কি জানি করুণ এখন কি করছে। ঘুম থেকে উঠে সে মা-মণিকে দেখতে না পেলে বায়না জুড়ে দেয়। পাখির হাতে ছাড়া কিছু খাবে না, মুখ ধোবে না, —এমন কি পাখি আদর করে বিছানা থেকে না তুললে খোকার ঘুম ভাঙে না। সে ত' আজ ভোরে বেরিয়ে এসেছে। কে আজ করুণকে ডেকে তুলবে। কি এক অসহায় মমতায় মনটা তার টন টন করতে থাকে।

এই ফাঁকা পরিবেশের সূর্যোদয় পাখির কাছেও ম্লান ঠেকলো।

করুণকুমারের জন্যে প্রচ্ছন্ন একটি বেদনালোক সৃষ্টি হয়েছে তার মনে—এই ক' ঘণ্টার অদর্শনেই সে স্পষ্ট মনে হলো।

একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যেই পাখিকে যেতে হচ্ছে কোলকাতায়। কে এই তপেন? কি চায় সে পাখির কাছে? সে যদি সত্যিই বিয়ে করতে চায়—করুক সে, নচেৎ পাখিই তাকে পরিত্যাগ করবে। তপেনই কি গিরীশ নাকি? অনেক প্রশ্ন তার মনে তোলপাড় তুলেছে। প্রেমের আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তিতে তপেন তাকে তাতিয়েছে, তাকে মাতিয়েছে; এবার পাখি ততটা দুর্বলতা দেখাবে না। বরং সে তপেনকে নির্দিষ্ট একটি দিন বা তারিখ বলে দেবে, তার মধ্যে যদি তপেন তাকে পত্নীত্বের মর্যাদা না দেয়, সেই তারিখ থেকেই সে তপেনের সান্নিধ্য ত্যাগ করবে। আর করুণকুমারকে তার লোভ-কুটিল উগ্র থাবা থেকে সে বাঁচাবার দায়িত্ব নেবে। এর জন্যে হয়তো চরম শত্রুতার মধ্যে ঢুকতে হবে—হোক, তাতেও পেছপা নয় পাখি।

•

আবার সেই কোলকাতা। কি ভিড়, কি ব্যস্ততা। সহরের এই ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি দেখে কি কেউ ভাবতে পারে যে পৃথিবীতে ফাঁকা জায়গা এমন অনেক আছে—যেখানে প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ মমতার অবলেপে সেখানকার মানুষজনকে নিজের কাছে ডেকে নেয়। নির্মল-নীল আকাশের আশীর্বাদ নামে। আর এখানে? প্রাণের কোনো প্রকাশ নেই, ভেতরে এক মন আর বাইরে আরেক কপট প্রকাশ। তাই নিয়ে মানুষের দৌড়।

হাওড়াতেই তপেনের সংগে দেখা। তপেন যেন কতদিন দেখেনি পাখিকে।

তবু ভালো পাখি, ডাকে যে সাড়া দিয়েছো। আমার ত' এদিকে—পিয়া গেহ মধুপুরা, দুখ মঝুপাশ—গোছের ব্যাপার। একটা বছর কি করে যে কাটিয়েছি—সে আমিই জানি। প্রেয়সী কাছে থাকলেও

মনে হয়—বুঝি বা বিরহের মধ্যে বাস করছি। ভয় হয়—পাছে তাকে হারাই। আর যাদের প্রিয়জন দূরে থাকে—

তপেনের চেহারাটা একটু রোগা হয়ে গেছে। চোখের কোল বসে গেছে। কালো একটা রেখা পড়েছে চোখের তটদেশে।

পাখি একটু হাসলো। তপেনের জন্যে কেমন যেন দরদ হলো। ট্যাক্সীতে চেপে সে নরম সুরে বললে—তোমার ডাকে সাড়া না দিয়ে কি পারি ?

কারমাটার কেমন লাগছে বলো ?

কারমাটার কোথায় ? করো বলো।

ওই হলো।

ভালই লাগছে। বিশেষ করে করুণকে।

আর করুণের বাবাকে ? প্রেম নিবেদন করেনি তোমার কাছে ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন করছো বলো ত' ?

আমি যে তাকে চিনি। বয়স্থ কোনো মেয়ে দেখলেই সে কেমন-ধারা এলোমেলো কথা বলে। এই ত' তার চরিত্রের প্রধান দোষ। আর তুমি তার বাড়ীর সব সময়ের চাকর, তোমাকে ছোট বড় একটা কথা বলবে না—এ হতেই পারে না।

কিন্তু শুনে তুমি আশ্চর্য হবে—আমার সম্পর্কে তাঁর কোনো শ্রদ্ধা না থাক—কোনো অশোভন উক্তিও নেই। তবে মাঝে মাঝে তাঁর গলা আবেগে ভিজে যায়, মদির কণ্ঠে কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেন। আমার ত' বেশ ভাল লাগে তাঁকে। মোটামুটি—করো আমার ভালই লাগছে।

বাড়ীতে এসে তপেন কাজের কথা পাড়লো। আসল কাজের কি কেমন হলো ? কতদূর এগিয়েছো ?

কিসের ?—পাখি যেন কিছুই জানেনা এমনি ভাবে প্রশ্ন করে।

করুণকে আমার কাছে ধরে আনবার। কেন, তুমি কি ভুলে গেছো সব ?

ভুলিনি। তবে ভাবছি—আমার দ্বারা ও কাজ কতদূর হবে বুঝতে পারছি না। করুণকে আমি ছেলের মতই দেখি। মা হয়ে কি করে তাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিই।

তার মানে?

মানে বেশ স্পষ্ট। তুমি আমাকে স্তোক দিয়েছো।

স্তোক?—তপেন বিস্মিত হবার ভাণ করে।

মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে তুমি আমাকে পাপের কাজে নিযুক্ত করতে চাও? করুণকুমার যে তোমার ভাইপো নয়, সে কথা আমি জেনেছি। আর যদি সে তোমার ভাইপোই হয়, তবে জেনো তোমার নাম তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছো।

পাখি—বজ্রগম্ভীর স্বরে তপেন হাঁক পাড়ে।

শক্ত মেয়ের মতো অবিচলিত স্বরে পাখি বলতে লাগলো—আমি তোমাকে স্পষ্ট করে আবিষ্কার করেছি। তোমার নাম কি, কাজ কি, —সে সম্পর্কে আমার আর কিছু খোঁজ নেবার নেই। তুমিই গিরীশ-কুমার। তুমি চাও করুণকে হত্যা করতে, এবং তারপরে সম্ভব হলে নীতীশবাবুকেও, আর তা করতে চাও তুমি আমার মাধ্যম দিয়েই। কিন্তু জেনে রেখো—সে আর সম্ভব নয়।

যন্ত্রণাহত কণ্ঠে তপেন শুধু পাখিকে মদির ভাকে একবার বললে —পাখি, রেকর্ডের একদিককার গান শুনে এসেছো, এবং সেদিকের গানটাই পুরানো, আর একপিঠ আছে, যেখানে গিরীশকুমার তপেন হয়েছে। সে খোঁজটাও নেওয়া দরকার। তারপর বিচার করো, পরিত্যাগ করো।—জীবনের এক অসহায় করুণ সময়ে তোমাকে কাছে পেয়েছি। নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত একটি মানুষ জীবন সমুদ্রে যখন আমৃত্যু নিমজ্জিত হতে চলেছে, সেই সময়েই সে তোমাকে আঁকড়ে ধরলো। তাকে তীরে টেনে তোলা—তারপর বিচার করো, প্রয়োজন হলে আবার ভাসিয়ে দাও জলে, না হয় করুণা যদি জাগে—ঠাঁই দাও কি চাই বিদেয় করে দাও। এমন নিষ্ঠুরভাবে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দিও না।

তুমি যে বিবাহিতা, সে কথা ঘুণাক্ষরে আমাকে জানাওনি কেন?

জানাবার কি দরকার বলো? আর জানাবার ত' কথাও নয়। সে বিয়ে আজ সাত বছর হলো ভেঙে গেছে। আমার স্ত্রী আমার বিরুদ্ধে মামলা করে আমাকে অস্বীকার করেছে। তাই তোমাকে আমি কিছু জানাই নি।

নাম গোপন করে—পাখিকে বাধা দিয়ে তপেন বলতে লাগল—আগে আমাকে সবটা বলতে দাও, পরে তোমার জেরা সুরু হবে। তুমি জান না যে আমার পোষাকী নাম গিরীশকুমার হলেও আমার একটা ডাক নাম আছে। আমি তোমাকে আমার ডাক নামটাই বলেছি। মানুষের মনটাই আসল, নামটা নয়—এই ভেবেই আমার দুটো নাম বলি নি। তুমি নিশ্চিত লক্ষ্য করেছো যে যতটুকু প্রয়োজন—তার বেশী কথা বলি নি। বলা আমার স্বভাবও নয়। করোয় যখন যাচ্ছো, সবই জানবে—এ জ্ঞানটুকু আমার ছিল, তাই মিথ্যা বলে স্বখাত সলিলের সৃষ্টি করি নি।

হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে দিয়ে মমতাঘন আবেগ সঞ্চার করে তপেন বলতে লাগলো—আমি জানি পাখি, জীবনে শুধু হারাতেই এসেছি। তোমাকে ডেকে এনেছি এখন—শুধু তোমার কাছ থেকে শেষ কথা আমি জেনে নেব, তুমি আমাকে স্বামিত্বে বরণ করবে কি না। যদি তোমার তরফের কোনো আপত্তি থাকে—তুমি নিজের কল্যাণের ভবিষ্যৎ পথ নিজেই বেছে নেবে। আমার অন্ততঃ এটুকু গর্ব বা আনন্দ থাকবে তোমার প্রতি আমি কোনো অসংগত অশোভন আচরণ করিনি।

পাখি সহসা কোন জবাব দিতে পারে না। একবার ভাবে তপেন বুঝি সত্য কথা বলছে, আবার মনে হয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে অসত্যের আশ্রয় নিয়ে অভিনয় করছে।

তপেন বলতে থাকে অশ্রু-আপ্লুত কণ্ঠে—অতীত জীবনের ওপর আমি খুব বেশী জোর দিই নি। আমি জানি বর্তমানের ওপরই ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে। আমি যেমন তোমাকে কিছু বলিনি পাখি,

তুমিও তোমার অতীত জীবনকে ব্যক্ত করনি। কি প্রয়োজন আমাদের পরস্পরের অতীত জীবন জানবার?

কঠোর মন ছিল পাখির, কিন্তু তপেনের হাহাকারে একটু একটু করে সেই কঠোরতা গেল উড়ে। যে সংকল্প নিয়ে তপেনের সংগে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে সে মনকে শক্ত করে বেঁধেছিল, সেই সংকল্প গেল ঘুচে। সে তপেনের কাছে এসে অপরাধীর মতো সংকোচ-ভীরু নতদৃষ্টি বুলিয়ে তপেনের দিকে তাকালো প্রথম, পরে বললে—আমাকে মার্জনা করো তুমি। আমিও তোমারই তপস্যা করে এসেছি। কিন্তু কেন জানি না বাইরের লোকের কাছে তোমার নামে নিন্দা শুনে আমি কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি। তাই ত আমার এই তর্ক।

আজ একটা বিয়ের দিন আছে। এই তারিখটা আমার জীবনে নব জীবনের নব জন্মের তারিখ। তাই তোমাকে স্মরণ করেছি। রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ নয়, বিয়ের লগ্নে আকাশ অগ্নি বায়ু সাক্ষী করে আমি তোমার কপালে সিঁদূর টিপ এঁকে দিতে চাই, দুগাছি শাঁখা পরাতে চাই।

অর্থাৎ? প্রশ্নটা পাখির ঠোঁটে এসেও উচ্চারিত হতে পারলো না। কি অধীর একটা উত্তেজনায় পাখির বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে উঠলো। কি বলে তপেন? তাকে স্বীকার করে নেবে সে, পত্নী বলে সে সামাজিক মর্যাদার একটা লেবেল এঁটে দেবে সে! পাখির সব গোলমেলে বোধ হতে লাগলো।

তপেন তাকে পত্নী হিসেবে স্বীকার করে নেবার জন্যেই কি এক জোড়া শাঁখা আর এক প্যাকেট সিঁদূর কিনে নিতান্ত গোপনে দেশলাই কাঠির আগুন সাক্ষী করে, ছাদের ওপরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিবাহের আয়োজন? পাখি কাঙাল ঠিকই, কিন্তু সে ত এ জিনিষ চায় নি। ললিতার মত দু পাঁচজন বন্ধুকে

সাক্ষী রেখে যদি তার রেজিষ্ট্রী ম্যারেজও হতো, তা হলেও কিছু বিক্ষোভের কারণ ছিল না।

কত আকাংখা তার ছিল তার বিবাহকে কেন্দ্র করে। নহবত বাজবে, রঙ বেরঙের হাল্কা গান ধ্বনিত হবে। আনন্দ আহ্লাদে সাজে পোষাকে একটা উৎসবের চেহারা ধারণ করবে তার বিবাহ। কিন্তু সে স্বপ্ন কোথায় ভেসে গেল ?

সন্ধ্যার অন্ধকারে উন্মুক্ত আকাশের তলায় নয়, পাখিরই ঘরেই তপেন এক টিপ সিঁদূর অতর্কিতে পাখির কপালে ঠেকিয়ে দিয়ে বললে —আমি তোমার কপালে স্বীকৃতিপত্র লিখে দিলাম। ইচ্ছা হয় গ্রহণ করো না হয় দূরে ফেলে দাও আমাকে, চুরমার করে ভেঙে দাও গৃহ-কপোতের সংসার-কামনা।

পাখি কেঁদে উঠলো। এ কান্নার কি যে অর্থ—তাও সে বুঝতে পারলো না, তবু দুই গণ্ড বেয়ে তার জলধারা নেমে এল। পাখি ত' একটি মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সংসার জীবন রচনা করতে চেয়েছে। আজ তপেন তাকে সে সুযোগ দিচ্ছে—কিন্তু তবু কেন তার বেদনা ?

যন্ত্র চালিতের মতো পাখি তপেনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। পাখিকেও বুকে টেনে নিলে তপেন। একটু আবেগে, একটু উন্মাদনার সংগে, তপেন বুঝি বা একটু চাপও দিলে পাখির দেহ-বল্লরীতে। পাখি নিজেকে সমর্পণ করলে তপেনের কাছে।

সেই রাতে তপেন প্রস্তাব দিলে—চলো, বাইরে কোথাও যাই। যেখানে শুধু তুমি আর আমি, আর সুন্দর শান্তশ্রী প্রকৃতি। কোল-কাতার এই বন্ধ জীবন, রূঢ় জীবন, নিষ্ঠুর জীবন আর ভাল লাগছে না। করো থেকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করো,—এবার ওখানে গিয়ে তোমার স্বাধিকার তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, তবে গিরীশের স্ত্রী হিসেবে দাদা তোমাকে গ্রহণ করবে না, বরং তাড়িয়ে দেবে। তার চেয়ে আমাদের সেই প্রথম প্রস্তাব—করুণকে লুকিয়ে ফেলে।

তপেন পাখির দিকে তাকালে। পাখির মনে করুণের মুখখানা

ভেসে উঠলো। তপেন তাকে নিয়ে খেলা করছে না নিজের রিক্ত বিক্ষত অন্তরে পাখির স্নেহরস অবলেপ হিসেবে আকাংখা করেছে—সে বুঝতে পারলো না। একদিকে করুণের প্রতি স্নেহ, অন্য দিকে তপেনের প্রেম—এক কঠিন সংকটের মধ্যে পাখিকে পড়তে হয়েছে।

সেই রাতে প্রায় সমস্তক্ষণ কথাবার্তার পর ঠিক হলো—যত নিষ্ঠুর হোক, স্বার্থের খাতিরে পাখি করুণকে তপেনের হাতে ধরে দেবে।

কিন্তু সকাল হতেই পাখি আবার দুর্বল হয়ে পড়লো। করুণের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগলো। কি দোষ করেছে ছেলেটি? নিষ্পাপ সরল আনন্দময় দেবত্বের প্রতিমূর্তি করুণকুমার। কেন তার ক্ষতি হবে? কোনো অন্যায়, কোনো অকল্যাণের ষড়যন্ত্রে ত' সে নিজেকে জড়ায়নি কখনো! না—না।—কেন সে তপেনকে কথা দিল? কি এক নরম মুহূর্তে তপেন তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে? পাখির আদ্যন্ত ভাবতেও ঘেন্না লাগে।

সেই মুহূর্তেই তপেনের অজান্তে সে কাগজ কলম নিয়ে নীতীশ কুমারকে একটি পত্র লিখতে বসলো। কি পাঠ লিখবে কিছুক্ষণ ভাবার পর সে লিখলে—

মান্যবরেষু,

আমি আপনার পুত্রের গৃহশিক্ষয়িত্রী। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না যে আমি ছদ্মবেশী সর্বনাশবিশেষ। করুণের মৃত্যু ঘটাবার জন্যে আমাকে গিরীশকুমার ওখানে নিযুক্ত করিয়েছে। সুতরাং আমার কাছ থেকে করুণকুমারকে বাঁচাবার দায়িত্ব আপনার। আমি যেন কোনো দুর্বলতম মুহূর্তে করুণের কোনো ক্ষতি না করি—দেখবেন। গিরীশ দিন রাত ফন্দী ফিকির আঁটছে—কি করে করুণকে সে চুরি করে আনবে। আমাকে তারই চর হিসেবে ওখানে সে পাঠিয়েছে। করুণকে আর আপনাকে যদি সরাতে পারে পৃথিবী থেকে—গিরীশই হবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। সুতরাং মুখে আমি হয়তো গুছিয়ে বলতে পারবো না

এসব কথা, বিশেষ করে করুণকে বাঁচানোর কথা—তাই লিখে দিলাম। আপনি খোকনকে আমার তথা গিরীশের লুব্ধ থাবা থেকে বাঁচাবেন। দায়িত্ব আপনার। নমস্কারান্তে, ইতি—পাখি।

খামে মুড়ে ঠিকানা লিখে চিঠিটা ডাকে দিয়ে আসার পর যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বুকের মধ্যে ঝড় বইছে। উত্তাল আনন্দ স্রোতের প্রবাহ রয়েছে যেমন, তেমনি দুর্বার করাল এক আশংকার ছায়া। একদিকে জীবনের প্রতি মোহ, অন্যদিকে আবার সংশয়—এই দুই বিপরীতমুখী উপলব্ধিতে পাখি কেমনধারা দিশাহারা হয়ে পড়ছে।

আর একটা দিন কোলকাতায় থেকে তপেনের নির্দেশেই পাখিকে আবার করোয় চলে আসতে হলো। কোলকাতায় এই দুটো দিন নিশ্ছেদভাবেই অবিরাম আমোদ আহ্লাদে কাটিয়েছে পাখি আর তপেন। সকাল থেকে রাত্র অবধি—আনন্দের এত সরঞ্জাম যে কোলকাতায় রয়েছে—পাখির এতদিন কলকাতা বাসের পরও ধারণায় ছিল না। ফেরাজিনীর ঠাণ্ডা ঘরে প্রিয়জনের মুখোমুখি বসে এক কাপ করে চা খাওয়ার মধ্যে কি এক অনুপম শান্তি—তার খবর পাখি এই প্রথম পেলে। থিয়েটার বায়স্কোপ, লেক, বোটানিকাল গার্ডেন। এসব মামুলি আনন্দের খোরাক। চাঁদপাল ঘাট থেকে সন্ধ্যায় ছই খোলা পানসীতে বসে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার তৃপ্তিও কত আনন্দের। পাখির দেশ নদীমাতৃক জলা জায়গায়, কতবার গহনার নৌকোয় সে এখানে ওখানে গেছে, কিন্তু এ আনন্দ কখনো পায়নি।

করো ফেরার পথে ট্রেনে বসে বসে এই কথাই সে ভাবছিল।

হু হু করে ট্রেন ছুটেছে। পাখির আজ আর বাইরের দৃশ্য দেখার নেশা নেই। নিজের মনের পট পরিবর্তন ঘটে গেছে। জীবনের সে ব্যর্থ হলো। আনুপূর্বিক ভেবে নেবার চেষ্টা করে বার বার কোথায় তার জীবনের সুরু আর কোথায়ই বা শেষ?

এবার করো যেতে তার কেমন সংকোচ লাগছে। সে নিজেই

নিজের মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করে এসেছে। গতকাল বিকেলেই নীতীশ-বাবু তার চিঠি পেয়েছেন। তার এবং গিরীশকুমারের ষড়যন্ত্রের পূর্ণ চেহারাটা ধরে দেওয়া হয়েছে। এরপর পাখি যাবে,—জেরা করলে সে কোন কিছু গোপন করবে না। যদি ন্যায়ের আদালতে তার বিচার হয়—সে কিছুই লুকোবে না।

তাড়িয়ে যদি দেন নীতীশকুমার—ভালই হয়। সে বেঁচে যাবে একটা বড় পাপ কাজ করার হাত থেকে। বাইরে যতই সে দেখাতে চেষ্টা করুক যে করুণকে সে ভালবাসে, অন্তরেও যতটা ভালবাসুক না সে করুণকে, নীতীশকুমার এবার সদর থেকে তাকে তাড়াবেন।

ভালই হবে। লোটন, ভৈরবী এখন করোয় আছে। তাদের সাক্ষী রেখে পাখি ফিরে যাবে তপেনের কাছে। পাখির ঘাড়ে কোনো দোষ আসবে না। করুণকে আড়াল থেকে শেষবারের মতো দেখে সে করো পরিত্যাগ করে যাবে।

তপেন এবার স্পষ্টই বলে দিয়েছে—এবার শেষ খেলায় অবতীর্ণ হতে হবে পাখি। করুণকে কোনো রকমে তুমি লোটনের হাতে তুলে দিয়ো। লোটন এখন থেকে তোমার সাহায্য করার জন্যে করোতে থাকবে। ওর কাছেই করুণকে দেবে—আমিও কারমাটারে কিম্বা চিত্তরঞ্জনে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। তুমি আজ যাচ্ছো, আমি কাল-পরশুর মধ্যে রওনা হবো!

ভৈরবী আর লোটন ব্যাপারটা জানে না বলেই পাখির ধারণা—তাই, যদি সে তপেনের জন্যে, তার নিজের জন্যে করুণকে কোলকাতায় নিয়ে আসে—তবে সে নিজেই চুরি করে নিয়ে আসতে পারবে। একটি সাক্ষী রাখতে যাবে কেন?

সকালেই ট্রেন কারমাটার পৌঁছল। গরমের দিকে এ সব অঞ্চলে চেঞ্জার আসে না। স্থানীয় যাত্রীদের ভিড়ও বেশী থাকে না। ফাঁকা ষ্টেশন। সকাল সাতটা কি আটটা হবে। এর মধ্যে রোদের কি তেজ। সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করে যে সূর্য দ্বিধা, নৈরাশ্য এবং বেদনার্ত

হাহাকারকে অপনোদন করে একটা উজ্জ্বল্য সৃষ্টি করে, পল্লীর এই নির্জন পরিবেশে তাকে আজ এ কি রুদ্র ঠেকছে। সেই লাল সুরকির পথ, শাল পিয়ালের বন। উঁচু নীচু মাঠ, শ্রমশীল চাষীদের রোয়া ক্ষেত, জড়াজড়ি করে গড়ে ওঠা ক'ঘর সাঁওতালের বাড়ী—সবই রয়েছে, কিন্তু পাখির কাছে এদের রোমাণ্টিক দীপ্তিটুকু যেন ক্ষয়ে গেছে। অবিরাম দৃশ্যপটের সুমোহন আশীর্বাদ পাখির কাছে আজ হারিয়ে গেছে। শুধু তার মনে হচ্ছে এই পল্লী গ্রাম, এই স্নিগ্ধ নির্জনতা থেকে তার বিদায়ের ডাক এসেছে। গাছে গাছে তারই প্রতিধ্বনি। এমন কি যে সব সরল নিষ্পাপ দেহাতী লোকজনেরা সওদা নিয়ে কারমাটারের বাজারের দিকে যাচ্ছে—তারাও পাখির দিকে নীরব ভৎর্সনার দৃষ্টি হেনে যেন জানিয়ে যাচ্ছে—পাখি এই পল্লীর পটভূমিতে অপ্রাসংগিক, অপ্রয়োজনীয়। সে এখান থেকেই ফিরে যায়।

ভৈরবীর কাছে গ্রামে গিয়েই সে দাঁড়ালো। কেমন যেন গম্ভীর ঠেকছে নাকি তাকে? সে-ও কি পাখির দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে? লোটন? লোটন নিশ্চয়ই জানে সব। তপেনের সে সাকরেদ, নিশ্চয়ই শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে তাকে।

ভৈরবী বললে—এই ফিরছো নাকি বোন?

খোকন রাজাবাবু ভাল আছেন?—পাখি জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ। সব ভালো আছে। খোকনও ভালো আছে। যাও না—দেখতে পাবে।—ভৈরবীর কথায় পাখির যেন খটকা লাগলো।

কিছু ঘটেছে নাকি? দ্বিধায়, সংকোচে—এমনকি ভয়ে দুর্ভাবনায় পাখির বুকের ভেতরটা শুকিয়ে এল। পা যেন আর চলে না। তবু স্মৃতিসদ্মের দিকে ক্লান্ত ভারী পা দুটো টেনে টেনে পাখি এগোতে লাগলো।

॥ আট ॥

খুব সন্তর্পণে পাখি স্মৃতিসদ্মের সদর দরজা পর্যন্ত গেল। ভেতরের বাগানে শুধু দুজন মালি কাজ করছিল, ফুলের চাষ হয় বাগানে, বোধহয় আগাছা বাছছিল। বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ। পথের শেষে দালান, দালানের দুপাশে বড় বড় দু খানা ঘর, এক কালে নায়েব গোমস্তারা থাকতো, কাছারি বসতো। এখন বন্ধ থাকে। মাঝে মাঝে রাজাবাবু নিজে পূবের ওই ঘরটায় বসেন, তাঁর যৌবন কালের তোলা অনেক রকম ফটো আছে দেখেন, আলবোলা টানেন। আজকে ওখানে তিনি নেই, থাকলে পাখির সংগে প্রথমেই দেখা হতো।

দালানে উঠে করুণ বলে একবার পাখি খুব আস্তে আর সংকুচিতভাবে ডাকলে। কিন্তু কোথায় করুণ? দালান পেরিয়ে অন্দর মহলের চত্বরে যেতে পাখির পা উঠল না। তার মন সরছে না—কোন্ অধিকারে সে যাবে? তবে নীরবে চোরের মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো অর্থ নেই। সে বরং আরো খারাপ। নীতীশকুমার তাকে তস্করের মতো এখানে গোপনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ক্ষমা করবেন না, বিশেষ করে ওই পত্র পাবার পর থেকে।

পাখি অন্দর মহলের চত্বরে গিয়ে একবার ওপরের দিকে করুণের ঘরের দিকে তাকালে। ঘরের দরজা ভেজানো রয়েছে। তার সামনের দিকে দেখলে পাখি। নীতীশকুমার মাঝে মাঝে ওখানে বসে তামাকু সেবন করেন, সে দরজা খোলা। কিন্তু ভেতরে কেউ আছে বলেত' মনে হল না। সেখানেও বেশীক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়ান যায় না। একদিন—বিশেষ করে ওই চিঠি লেখার আগে এই বাড়ী ঘরদোর সম্পর্কে তার নিয়মানুগ কোন অধিকার না থাক, কোথাও এতটুকু জাড্য ছিল

না। আর আজ কত না বাধা, কত না সংকোচ তার দুটো পায়ে ভীরুতার বেড়ী পরিয়ে দিয়েছে।

পাখি চত্বর থেকেই একটু জোরই ডাকলো—করুণ।

কে—নীতীশকুমারের গলা শোনা গেল। তিনি দোতলার একটি ঘরে বসে বই পড়ছিলেন। বেরিয়ে এসে পাখিকে দেখে বেশ প্রফুল্ল-মনেই বলে উঠলেন—আরে এস, এস। তা নীচ থেকে অমন ডাক ছাড়ছো কেন। ঘর দোর সিঁড়ি বারান্দা—কিছু চেনো না বুঝি। এই চার পাঁচ দিনের বিরহের ঠেলাতে প্রাণ যাওয়ার দাখিল। এস হে, এস হে—আমার—

পাখি গানের বাকী অংশটুকু শুনতে পেল না, সে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

নীতীশকুমারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো পাখি। অন্য সময়ে হলে একটা প্রণাম করতো, আজ সে নীতীশের পায়ে হাত দেবার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে।

পাখিকে নীরব দেখে নীতিশকুমার বললেন—কি চুপ করে যে। করুণের কথা একবারও জিজ্ঞাসা করছো না। কেমন তুমি মা-মণি?

কই? তাকেত দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় সে? হয়তো আমার ওপর রেগে রয়েছে—পাখি নীচের দিকে চোখ নামিয়ে রেখে বললে।

রাগ করবার ছেলেই সে নয়। বড় দুঃখ পেয়েছে। বড় অভিমানী কি না, তাই বড় ব্যথা পেয়েছে।—নীতীশকুমারের গলা ভারী হয়ে এল।

কেন?

তোমার ব্যবহারে।

পাখির ব্যবহারে? হ্যাঁ, করুণকুমারের দুঃখের কারণ সে হয়েছে বৈকি! মায়ের ছদ্মবেশে এসে তার সর্বনাশের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল! পাখির জীবনে নিজের ওপর এক জুগুপ্সিত ধিক্কার জন্মালো।

কেন দুঃখ পাবে না সে, বলো—নীতীশকুমার পাখিকে নীরব দেখে বলতে সুরু করলেন—বলা নেই, কওয়া নেই, এক ঘণ্টার নোটিশে ফস করে কোলকাতা চলে গেলে। মা-মরা ছেলে, তোমাকে মায়ের মতই দেখে, মায়ের মত ভাবে। তোমার হাতে খায়, তোমার কাছে শোয়। তুমি পড়ালে সে পড়বে, তুমি বললে সে বলবে। তাকে ফেলে কোন্ মা পাষাণির মতো যেতে পারে বলো? তাঁর বুড়োবাপের কথা না হয় বাদ দিলাম। সে বুড়োও জেনো নারীর সেবা ছাড়া কখনও থাকেনি।

কই, করুণ কোথায়?

সে বাড়ীতে নেই।

বাড়ী নেই? কোথায় গেল?

ওর চৌধুরী কাকা কাল কোলকাতা থেকে এসেছে। গণেশ কাকা আর কাকীমাও এসেছে—তাদের ওখানে গেছে নিমন্ত্রণ খেতে বোধন-মায়ীর সংগে। তোমার আসবার পথেই ত' 'পড়ে বাড়ীটা। ওর গলা শোন নি—চৌধুরী লজে? এখানে ত' থাকলেই কাঁদছে, বায়না করছে। মা-মণি কবে আসবে, কই এল না—এসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করছে। তার চেয়ে চৌধুরী লজে গিয়ে বরং আজ খেয়ে আসুক। ওরা বড্ড ভালবাসে ওকে। করুণকে দেখার জন্যে পাখির মন আকুল হয়ে উঠলো। করুণ তাকে এর মধ্যে এতদূর ভালবেসে ফেলেছে। আর পাখি? পাখির স্নেহও কি কম? বুক চিরে সে জিনিষ দেখাবার নয়। সহ্য করার জন্যে সে পৃথিবীতে জন্মেছে। মাতৃত্বের বেদনা তাকে যে সহ্য করতেই হবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বে করুণ। এর মধ্যে তুমি হাত মুখ ধুয়ে চা খাবার খেয়ে নাও। স্নান সেরে নাও। ঠাকুরকে খবর পাঠাও। দেখো এই পাঁচদিনে তোমার সংসারের কিছু ওলোট পালোট আমরা করেছি কি না। বুঝে শুনে নাও। আরে একটা গিন্নী না থাকলে কি সংসার চলে। সেই জন্যে রসিকজনেরা গিন্নীকেই সংসার

বলেছে। আমি বলি কি গিন্নীরা হলো সংসার নৌকোর হাল।—নীতীশকুমার বেশ সরল ভাবেই কথা গুলো বলতে লাগলেন।

পাখির ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল। কোন্ উঁচু স্তরের খেলোয়াড় নাকি নীতীশকুমার। সব জেনে শুনে এমন নিপুণ অভিনয় করছে? পাখি খুব বিহ্বল হয়ে পড়লো।

কি ভাবছো হাঁ করে। যাও, মুখ হাত পা ধুয়ে এসো। কুয়োয় জল তুলে দেবার জন্যে মালীকে বলো গে। বোধনমায়ী নেই—তার হয়েছে কি?—ধমকে উঠলেন যেন নীতীশকুমার—এই রকম সুন্দর মুখ, একরাত ট্রেনের জার্নিতে কালি করে ফেলেছো। যাও, মুখে একটু সাবান দিয়ে শোভন দৃশ্য হয়ে এসো। পরে কথা হবে। আগে সুস্থ হয়ে নাও তুমি—

পাখি দৃশ্যান্তরে চলে গেল। নীতীশকুমার কি চিঠি পায় নি নাকি? ঠিকানা লেখা ত' পাখির ভুল হয়নি। আর—কিন্তু ব্যবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতেও ত' মনে হয় তিনি পত্র পেয়েছেন। করুণকে সরিয়ে দিয়েছেন। চৌধুরী লজের কথা বললেন বটে, কিন্তু করুণকে যে কোথায় সরানো হয়েছে—তা কে জানে। বোধনমায়ীর কাছে—তার স্নেহ মমতার মধ্যেই করুণকে পাখির চোখের আড়াল করা হয়েছে বোধ হয়। নীতীশকুমারের সহজ সরল বাচাল ইয়ার্কির ভংগীর কোনো পার্থক্য ঘটে নি বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যেন ইংগিত রয়েছে—ব্যস্ত কেন, সময়মতো বোঝাপড়া হবে। আগে পাখি সুস্থ হয়ে নিক, পথের ক্লান্তি দূর করুক। তারপর, তারপর—

হ্যাঁ। পাখি আগে সুস্থ হয়েই নেবে। সে ত' অন্যায় করার জন্যে এই পৃথিবীতে আসেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার জেহাদ। যেখানে শক্তিতে কুলোয় না, সেখানে সে পূর্বাহ্নেই নিজের দুর্বলতাকে সকলের কাছে ঘোষণা করে। করুণকে সে বাঁচাতে চায়, তাই না সে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে তার মনের দুর্বলতা। এতে যদি নীতীশকুমার তাকে তিরস্কার করেন, সে হাসি মুখে সেই তিরস্কার সহ্য

করবে। বরং এতক্ষণ যে তিনি এই প্রসংগের কোনো কথা তুলছেন না—তাতেই পাখি মনে মনে যন্ত্রণা পাচ্ছে। নীতীশকুমার গিরীশেরই দাদা, অভিনয়ে বোধহয় ওস্তাদ শিল্পী। এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই ঘটেনি।

এগারোটার মধ্যেই করুণ বোধনমায়ীর সংগে ফিরে এল চৌধুরীলজ থেকে। পাখিকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে গেল, তার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। পাখি তার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কেঁদে ফেললে। পাশের ঘর থেকে নীতীশকুমার কয়েক মিনিট ধরে এই দৃশ্য দেখে চুপ করে সরে গেলেন—পাখির সংগে চোখাচোখি হলো, পাখি ভীত বিহ্বল হয়ে করুণকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরে, আবার ছেড়ে দেয়। এমনিভাবেই করুণ আর তার মা-মণির দেখা শোনার পর্ব চুকলো।

তারপর সুরু হলো করুণের প্রশ্ন। এক একবার পাখির মনে হতে-লাগলো—এসব প্রশ্নগুলি করুণের নয়, তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? কে তাকে শিখিয়ে দেবে। নীতীশকুমার নিশ্চয়ই নন; অন্ততঃ ওই চিঠি পাবার পর।

করুণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো—বলো, তুমি আর কোনদিন আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না? বলো? মা বুঝি ছেলেকে ফেলে কোথাও যায়? তুমি কেমন মা-মণি, আমাকে তুমি এরকম করে ফেলে রেখে চলে গেলে?

পাখির আবার কেমন সব ব্যাপারটাই গোলমেলে ঠেকলো। করুণের প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন তাকে খুব বেশী করে বিঁধলো। কোলকাতা থেকে কেন সে করুণের জন্য কিছু আনেনি। কিছু একটা কিনে আনার কথা যে তারও মনে হয়নি এমন নয়, কিন্তু সে কৃতনিশ্চয় ছিল যে করোর অন্ন তার উঠেছে, শুধু সে যাচ্ছে নীতীশকুমারের

কাছে তাড়া খেতে। অথচ ঘটনা যে এরকম আকৃতি নেবে—তা সে কল্পনাও করতে পারেনি।

করুণ বললে—আমি কখ্‌খনো কোলকাতা দেখিনি। তুমি আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?

কোলকাতা খুব খারাপ জায়গা। সেখানে তোমায় যেতে নেই বাবা। পাখি বোঝাতে সুরু করে।

কেন—কোলকাতা খারাপ কেন? করুণের কৌতূহল মেশানো প্রশ্ন।

কেন খারাপ জানো, সেখানে সব খারাপ লোক বাস করে—যাদের মুখ এক, মনে আরেক। তোমাকে বলবে এক রকম কথা, কিন্তু করবে আরেক রকম কাজ। এমনি সব খারাপ লোক—

তুমি ত' কোলকাতার লোক, কই, তোমার ত' দু'রকম কথা নেই।

ছিঃ, মা-মণিকে ও রকম কথা বলতে নেই। পাখি শাসনের সুরে বলে।

করুণও ছাড়ার পাত্র নয়, সে-ও বলে—আর তোমায় বুঝি মিথ্যে কথা বলতে আছে?

মিথ্যে কথা?—পাখি চমকে ওঠে।

মিথ্যে কথা না ত' কি। তুমি যে বললে কোলকাতা খুব খারাপ—সে বুঝি মিথ্যে নয়। আমি যে কত কথা জানি কোলকাতার। ট্রাম গাড়ীর কথা, বাস গাড়ীর কথা, কত আলো, কত দোকান,—কত সুন্দর জায়গা কোলকাতা।

এ সব তুমি কোত্থেকে শুনলে বাবা?

বারে—কাকু যখন আসতো, আমাকে কোলকাতার গল্প শোনাতো। আমাকে কতবার কোলকাতায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, বাবা যেতে দেননি। 'বছরখানেক আগেও কাকা করোর হাট থেকে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ইচ্ছে করলেন, বাবা দেখতে পেয়ে দৌড়ে এলেন, লোকেরা কাকুকে ধরে প্রায় মেরে ফেললো;—কাকু সেই যে

পালিয়েছে—আজো ফেরেনি। একবার এসে আমায় নিয়ে যাবে সে আমি বলতে পারি।

খবরদার করুণ, তোমার কাকুর সংগে কোথাও যাওয়া চলবে না। কাকু তোমার ভাল লোক না।

য্যাঁ—ভাল লোক না? তুমি কিচ্ছু জানো না মা-মণি। আমাকে কাকু খুব ভালবাসে। যখন বাবা তাড়িয়ে দেন কাকুকে, কাকু লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতে আসতো, খাবার কিনে দিত। কোলকাতা পালিয়ে যাবার কথা বলতো।

না, করুণ, কক্ষণো তুমি তোমার কাকুর সংগে গোপনে দেখা করো না। তার দেওয়া খাবার খেয়ো না, তার সংগে কোথাও যেয়ো না।—পাখি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে ঝড়ের মতো ওই কথা কটা বলেই আবার প্রশ্ন করে—তোমার বাবা এসব জানেন? তোমার কাকু লুকিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে চায়, তোমাকে খেতে দিতে চায়—

বারে—জানবেন না কেন? তবে বাবা আমাকে কোথাও যেতে দেন না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে চাও কোথায়ও—বাবা অমত করবেন না। আর অমত করলে হবে কি—আমি এমন কাঁদবো, বাবা হ্যাঁ না-বলে পারবেন না। যাবে তুমি আমাকে নিয়ে?

করুণের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে পাখি। ছেলেটার অদৃষ্টলিপি কি তা কে জানে? ভাগ্যকে পাখি কখনো বিশ্বাস করেনি বিশেষ করে অমোঘ নিয়তির নৈষ্ঠুর্য বলে মানতে পারেনি। কিন্তু করুণের কথাবার্তায়—তার সাধ-অকাংখার কথা ভেবে পাখি যে শিউরে উঠছে। ছেলেটিকে সত্যিই তাহা'লে মৃত্যু ডাকছে।

কিন্তু না। করুণকে বাঁচাতে হবে। মা বলে সে তাকে ডেকেছে। মা বলে যার ডাকবার কথা, সে যখন এই জগতের মুখ দেখার আগেই চলে গেছে, তখন যে তাকে এই স্বর্গীয় সম্বোধন করছে, তার প্রতি অবশ্যই তার একটা কর্তব্য আছে বৈকি! সে করুণকে বাঁচাবে। তার সন্তানকল্প এই অবোধ কিশোরকে সে বাঁচাবে।

কিভাবে ? কিভাবে এই সুন্দর শিশুটিকে বাঁচানো যায় ? দানবের মত তপেনের ক্রুদ্ধ চোখ দুটোর আগুনও এক একবার দেখেছে পাখি। কি দৃঢ় মনোবৃত্তি, কি স্থির কৃতসংকল্প নিষ্ঠা। পাখি কি সেই দস্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এই অবোধ ছেলেটাকে ?

চুপ করে গেলে কেন মা-মণি ? আমাকে নিয়ে যাবে না বুঝি ? বাবাকে বলব আমি ?—করুণ পাখির গলা জড়িয়ে প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ। না। না না—তোমাকে নিয়ে কোলকাতায় যাব কেন ? বললাম না কোলকাতায় ছোট বয়সে যেতে নেই।—অন্যমনস্কভাবে পাখি জবাব দেয়।

বাবার কাছে আমি বলবো—তিনি যেতে দেবেন—আমি ঠিক বলছি বায়না করবার মতো সুর করে করুণ চেঁচিয়ে বলে উঠলো।

না, না, করুণ, তোমার বাবাকে একথা বলো না। একথা শুনলে তিনি খুশি হবেন না।

পাখির ভয় হলো করুণ যদি নীতীশকুমারকে বলে পাখি তাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চায়—তা হলে 'যে সর্বনাশ এখনই হবে। কিন্তু নীতীশকুমার কেন সতর্ক হচ্ছেন না, কেন পাখির কাছ থেকে করুণকে সরিয়ে নিচ্ছেন না !

কথায় কথায় পাখি শুনতে পেল যে চৌধুরী লজে করুণের যে গণেশকাকু থাকেন—তাঁর স্ত্রীর নাম ডলি। ডলি এককালে নার্স ছিল, এখন সে গণেশের স্ত্রী হয়েছে। নীতীশকুমারের কাছেই শোনা গেল এই গল্প। তা হলে কি রবীনবাবুর বাড়ীতে সেবা করতো যে মেয়েটি,—যার কাছে পাখি একদা দরবার জানিয়েছিল—সে নাকি ?

করুণকে নিয়ে ডলির খোঁজ করতে যাওয়া যায় না। করুণকে সংগে নিয়ে কোথাও বের হওয়া চলে না। তপেন আসার সময়ও

পাখিকে বার বার বলে দিয়েছে—ভয় নেই, আমি যাচ্ছি করোয়। গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। বাড়ীর বাইরে করে করুণকে একবার এনে ফেলতে পারলেই আমার লোক বা আমি নিজে ব্যবস্থা করবো।

নীতীশকুমার যদি একবার এ সব প্রসংগ তুলতেন—তা হলে সমস্ত কিছু বলতেই পারতো পাখি। চিঠির পর অন্ততঃ পাখির কাছে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি। অথচ পাখিরও সাহসে কুলোয়নি যে নিজে গিয়ে বলবে সব কথা।

এখানে কি এক অপরিসীম যন্ত্রণাকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে পাখিকে। এমন কেউ নেই যার সংগে সে একটু পরামর্শ করতে পারে। ডলির কথা শুনতে তাই তার কাছে যাবার বাসনা এত তীব্র হয়ে উঠলো। এই গণেশকেই সে এখানে একদিন দেখেছিল; এবং এই গণেশই বোধ হয় রবীনবাবুর প্রেসে চাকরী করে। সব মিলিয়ে মনে হয় এরা সেই রবীনবাবুরই আশ্রিত জন। ডলির কাছে বুদ্ধির সাহায্য চাইবার জন্যেও পাখির তাকে খোঁজ করা দরকার।

প্রথম যেদিন গণেশের সংগে দেখা হয়েছিল, পাখি চিনতে পারে নি। চিনলে আর এ বিপর্যয় ঘটতো না।

চৌধুরীলজে গিয়ে পাখি শুনলে যে গণেশবাবু তার স্ত্রী আর বাচ্চা নিয়ে পিণ্ডারী গেছেন—এক দেবতা আছেন—তার কাছে কিছু মানত করা পূজো দিতে। ব্যর্থ হয়ে পাখি ফিরে এল।

তপেন বলে দিয়েছিল—করোয় তোমার যথার্থ আপন জানবে লোটনকে। সে এখানে আমার অন্নে পালিত, সে আর তার স্ত্রী, তোমাকে নানাবিধ সাহায্য করার জন্যে তৈরী থাকবে। যখন কোনো বিপদে পড়বে, তখন লোটনের সাহায্য পাবে—তাকে জানাতে কুণ্ঠা করো না।

লোটনকে কি বলবে পাখি? লোটনের বিপক্ষে তার জেহাদ। তপেনের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা। কার কাছে সে পরামর্শ নেবে?

বোধনমায়ীর কাছে? সে বৃদ্ধাটি দোষেগুণে আছে। আগে ত'

পাখিকে তার নিজের বোনের মতই দেখতো। এখন অবশ্য অন্য দৃষ্টিতে দেখে। সব সময় সন্তর্পিত সতর্কমাখা পাহারা দেবার ভংগীতেই পাখির প্রতি কাজে, প্রতি কথায় চোখ রাখে। বোধনমায়ীর এই গোয়েন্দাগিরির জন্যেই পাখির মনে হয়েছে নীতীশকুমার পাখির পত্রের বিষয় অবগত হয়েছেন। নিজের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন ঘটাননি বটে, কিন্তু বোধনমায়ীকে পাখির পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন। বোধনমায়ীর ব্যবহারেও তাই একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। তবু বোধনমায়ীর ব্যবহারে যে একটু সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—তাতেই যেন পাখির সান্ত্বনা। পাখি যেন সেটুকুতেই খুশি বোধ করে। বোধনমায়ীর কাছে সবগুলি না হয় বলুক না সে। কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলতে তার বাধে। বোধনমায়ীও ত' আচ্ছা মেয়েলোক। করুণকে যদি সে যথার্থই ভালবাসে—তবে এই কাল-সাপের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর কেন চেষ্টা করে না সে ?

বোধনমায়ীকে আজকাল আকারে ইংগিতে কিছু বলতে গেলেই সে অন্য কথা তোলে। পাখি বললে—খোকনের ভালমন্দ এখন ত' তোমাকেই দেখতে হবে বোধনমায়ী। আমি দেখছি, কিন্তু তোমারও সর্বদা চোখ রাখা দরকার। আর খোকাকে কখনো বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

বোধনমায়ী একটু হাসি আর একটু তিরস্কার মিশিয়ে বললে—হ্যাঁ—তা যা বলেছো। প্রেম ত' সব্ কুচকে ভুলিয়ে দেয়। ছেলে পর হয়, নিজে ভি অন্যরূপ হয়ে যায়। ছলা কলা ছেড়ে দে পাখি। তোর ভি ভালো হবে না।

অসংলগ্ন, অপ্রাসংগিক কথা বলে বোধনমায়ী। পাখির প্রেমের খবর বোধনমায়ী জানলো কেমন করে ? প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় সে আজ অবতীর্ণ হয়েছে, বুঝি সেই আগুনের তাত তার সইছে না, প্রাণ মন সব ঝলসে পুড়ে যাচ্ছে।

তপেনের কথা তার প্রতি রাত্রেই মনে হয়। চারিদিক যখন

নির্জন হয়ে যায়—শয্যায় যখন তার শাড়ীর আঁচল আঁকড়ে করুণ তার বুকের কাছে গুটিয়ে শুয়ে থাকে, দূরে কাছে শাল পিয়াশালের বনে চাঁদের আগুন জ্বলে, কোথাওবা কোকিল ডাকে,—আর পাখির মনে মদন-বিশিখের ক্রিয়া সুরু হয়। কোনো রাত্রে বা সে নিজের জীবনের আদ্যন্ত রোমন্থন করে, কখনও বা তপেনের জন্যে বেদনার্ত বোধ করে। লোকটাকে কাছে পাবার জন্যে আকুল হয়ে তার মন ছুটোছুটি করে। প্রেমের নিগূঢ় অব্যক্ত এক উপলব্ধিতে মন তার কাতর হয়ে পড়ে। করুণের মুখের দিকে চেয়ে এক-আধবার বুঝিবা ভাবেও—প্রতিবন্ধকতা কোথায়। প্রেমের সার্থক ফসল সে অন্তরের ভাণ্ডারে তুলতে পারবে কি? কখনো কখনো দস্যু-চিন্তা তার সুন্দর বুদ্ধিকে মেরে ফেলে, শুচিশীলনের টুঁটি টিপে ধরে। কে তার করুণ? তার কাকার হাতে তুলে দিলে ধর্মের দিক থেকে কি এমন অন্যায় হবে পাখির? প্রতারিত বঞ্চিতসর্বস্ব, একজনের সাহায্যে প্রতারকের শাস্তি বিধান কি এমন অন্যায়—বিশেষ করে যখন পাখির নিজের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত।

রাত্রের অন্ধকারে মনের ভীরুতা, আর দুর্বলতা বিশেষভাবে জেগে ওঠে। নীতি, মানবপ্রীতি, স্নেহ-সোহাগ সব বুঝি ডুবে যায়, শুধু নিজের স্বার্থ, নিজের প্রেমের সার্থকতার ফিকির বড় হয়ে দেখা দেয়। তপেনকে লাভ করার সাধনা আর একবার উদ্দাম হয়ে ওঠে। প্রেমের যে দীক্ষা সে নিয়েছে—তাকে ত' ব্যর্থ করতে পারবে না। প্রেমের পদ্ম তুলতে গেলে তাকে ত' গলা জলে দীঘিতে নামতে হবে, কাঁটায় হাত দিতে হবে।

কালকেই লোটনের সংগে দেখা করে সলাপরামর্শ করা যাবে—আপাততঃ এই রকম সংকল্প করে পাখি শুয়ে পড়লো।

সকালেই ভৈরবীর সংগে পাখির দেখা। পাখিকে লোটনের কাছে যেতে হলো না, ভৈরবী খবর দিলে—লোটনই পাখির কাছে আসবে।

কেন?

ভৈরবী তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলো না। একটু পরেই

লোটন সেখানে এল,—স্বামীকে দেখা মাত্রই সলজ্জকুণ্ঠায় ভৈরবী দৃশ্যান্তরে প্রস্থান করলে।

লোটন বলে—কতদূর হলো। তপেনবাবু যে রোজ রোজ তাগাদা করছেন। গুণ্ডা লাগানো হবে, করুণকে খুন করার জন্যে।

এইটুকুই তপেনের বক্তব্য লোটনের মারফৎ। এর বেশী আর কিছু তার বক্তব্য নেই? পাখি তার মুখের দিকে চেয়ে অন্যায়ের এই পংকিল কাজে কি সম্মত হয় নি? অথচ তার জন্যে কোনো সংবাদ নেই?

আবার পাখি বিদ্রোহ করে; লোটনকে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়—মা হয়ে আমি সন্তানকে খুনের হাতে তুলে দিতে পারবো না।

বেশ, আমি তাই বলবো।

হ্যাঁ তাই বলো তাকে। দরকার যদি থাকে, আমার সংগে কারমাটারের পথে নিভৃতে দেখা করুক—আমি তাকে বলবো।

লোটন একটু হেসে চলে গেল।

পাখি যে তার দয়িতের জন্যে এই অন্যায়ের কাজে সম্মত হয়ে এসেছে—তার প্রতি তপেনের একটা বাণী পাঠানো কর্তব্যের মধ্যে এল না। ধীরে ধীরে যেন তপেনের অন্তরের গোপন অভীপ্সা বা অভিসন্ধি পাখি ধরতে পেরেছে। যে নিজের ভাইকে ভাইপোকে মারতে চায়, সে কি সত্যিই পাখিকে গ্রহণ করবে।

কিন্তু এবার করোয় আসবার দিনে পাখির গা ছুঁয়ে তপেন দিব্যি করে বলেছে—যাই কেন ঘটুক না; তুমি আমার যে স্ত্রী হয়ে রইলে, তাই থাকবে। তার আর কোনো নড়চড় হবে না। তপেন পুরুষ মানুষ। তার কথার মর্যাদা সে রাখতে জানে।

পাখির আবার সব গুলিয়ে যায়। এই বুঝি করুণের অসহায় মুখ ভেসে ওঠে, এই বুঝি তপেনের বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয়ের ছবি জাগে। করুণ আর তপেন। স্নেহ আর প্রেম। কাকে সে গ্রহণ করবে? তীরবিদ্ধ পাখির মতই ছটফট করতে থাকে সে। পাখি কি করবে? কোন্ পথে যাবে?

॥ নয় ॥

করোর চৌধুরী লজ বাড়ীটি রবীন চৌধুরীর—এ কথা শুনে পাখি মনে কোথায় একটা ভরসা পেল। করুণের মুখে কথায় কথায় রবীন-বাবু, গণেশকাকুর কথা উঠলে পাখি ভরসা করে করুণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রবীনবাবুর কথা জানতে পারে। মাঝে মাঝে রবীনবাবু আসেন। পাখি এখানে থাকাকালীনও দুবার রবীনবাবু এক আধ দিনের জন্যে এসে চলে গেছেন। বড় শিকারী রবীনকাকু। প্রত্যেক বার শীতে এসে তাঁর মনডুংরির জংগলে শিকারে যাওয়া চাই।

গণেশকাকু রবীনবাবুর ম্যানেজার হয়েছেন। আগে বইয়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। গণেশকাকুর একটি ছোট্ট ছেলে—তার জন্যে কি মানৎ পূজো আছে ঐ পিণ্ডারীতে দেবীর কাছে, সেজন্যে এবার ওরা এসেছেন, রবীনকাকুও আসবেন।

পাখি সেই আশাতেই দিন গুণতে থাকে। গণেশের সংগে যখন দেখা হল পথে, তখন সংশয় এবং ভীরুতায় সে আলাপ করতে পারে নি। ডলিকে দেখলে সে চিনতে পারতো। গণেশের সংগে তার তেমন চেনা ছিল না, তাই চট্ করে সে চিনতে পারেনি।

রবীনবাবু এলেই তাঁর সংগে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। কি করে করুণকে বাঁচানো যায় সে চেষ্টাই করা দরকার। নিজের প্রেম সঞ্জীবিত করার জন্যে, নিজের বাঁচার জন্যে একটি অসহায় কিশোরকে বিপদে ফেলা যায় না। রবীনবাবু এ বিষয়ে যথার্থ মত দিতে পারবেন।

এই রকম যখন পাখির মনের গতি—একদিন দুপুরে করুণ ঘুমিয়েছে,—নীতীশকুমার পাখির ঘরে ঢুকলেন।

বেশ শান্ত অথচ আদেশ-গম্ভীর গলায় তিনি ডাকলেন—পাখি

তোমার সংগে আমার কয়েকটি জরুরী কথা আছে। কখন তোমার সময় হবে—বলবে?

আমার সংগে? আপনার কথা? বলুন, কি কথা? এখনই আমার সময়। আমিও এই রকম ভাবছি যে এইবার আপনার কাছ থেকে আমার ডাক আসবে। —শুকনো গলায় ঢোক গিলে গিলে পাখি এই কথাগুলি বলতে লাগলো।

তার মানে? তুমি আমাকে সন্দেহ করো? তোমার সংগে ইয়ার্কি দিই বলে তুমি মনে মনে আমাকে ইতর ঠাউরে নিয়েছো। কিন্তু তুমি আমার নাৎনীর বয়সী—সে খেয়াল আছে। তাই ত' একটু ফষ্টিনষ্টি করি। তাতে এখানে—এই নির্জন পুরীতে তোমারও দিন কাটবে ভালো, আমারও রংগ-রসিকতা করার অভ্যেসটা বেঁচে থাকবে।

এ আপনি কি বলছেন? এ সমস্ত চিন্তা কোনদিন ত' আমার মাথায় আসেনি। আমিও আপনাকে বরাবর শ্রদ্ধা করেই এসেছি—ছি ছি—পাখি প্রায় কেঁদে ফেলার মতই অধীর হয়ে উঠলো।

তুমি বোধনমায়ীর কাছে আমার সম্পর্কে কিছু বলেছো? আমি তোমার সংগে ইয়ার্কি দিই, ঠাট্টা করি—এই নিয়ে?—গম্ভীরভাবে নীতীশকুমার প্রশ্ন করলেন।

আমি? আপনার সম্পর্কে কিছু বলবো বোধনমায়ীর কাছে? না, না—এ আপনি কি বলছেন। আপনি আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, আপনার গুণ-কীর্তন করা ছাড়া আমি কোথাও কারো কাছে কিছু ত' বলিনি। —ভীরু সংকোচের সংগে পাখি বললে।

নীতীশকুমার চুপ করে রইলেন। সহসা কোন কথা বললেন না।

পাখি বলতে লাগলো—বোধনমায়ীকে একবার ডেকে এনে বোধ হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিলে আমার সন্দেহ যাবে। আমি ওকে কোনো কথা বলিনি। বোধনমায়ী আপনাকে কি কথা বলেছে?

হাল্কা স্বরে নীতীশ বললেন—কিছুই সে বলেনি। বলার সাহস তার নেই, কিন্তু আকারে-ইংগিতে আমাকে সে এমন করে পাহারা দিতে

সুরু করেছে যে, যেন আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। বুঝিবা বিয়েই করে ফেলবো।

নীতীশকুমারের কণ্ঠ লঘু হয়েছে দেখে পাখি একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু সংগে সংগে বিহ্বল হয়ে পড়লো। সে ত' মনে করেছিল—পাখির চিঠি নিয়ে আলোচনা হবে, তা না হয়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এ সব কথাবার্তা কেন? বোধনমায়ী যে পাখিকেও ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখে, চোখে চোখে রাখে, নীতীশকুমারের সংগে কি কথা হয়, কখন দেখা হয়—সব দিকেই নজর রাখে—এটা পাখিও জানতে পেরেছে। পাখি ভেবেছে নীতীশকুমারের উদ্দাম আবিলতা যাতে পাখিকে স্পর্শ না করে—সেজন্যেই হয়তো বোধনমায়ীর সতর্কতা। আজ যে নীতীশকুমার নীরব মধ্যাহ্নে পাখির ঘরে ঢুকেছে—বোধনমায়ীও দূর থেকে তা লক্ষ্য করেছে, নীচে সিঁড়ির মুখে বসে এ ঘরের দিকে চোখ পুতে বসে আছে—পাখি লুকিয়ে তা দেখে নিয়েছে। তার কারণ জানতে পাখির কোনো কৌতূহল নেই। আসলে পাখি জানতে চায় কঙ্কণকে বাঁচানোর জন্যে যে চিঠি সে লিখেছিল—নীতীশকুমার সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

কথাবার্তা সে দিক দিয়ে গেল না। পাখির মনে গুমট জমেই থাকে।

শোনা গেল রবীনবাবু এসেছেন—কাল সন্ধ্যার দিকে। পাখি খবরটা পাওয়া মাত্রই চৌধুরীলজে গেল, কিন্তু বাড়ীশুদ্ধ কাউকেই দেখা গেল না—ওরা সকলে একটা গাড়ী করে চিত্তরঞ্জনে বেড়াতে গেছে ভোর বেলাতেই।

নীতীশকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি চেন নাকি রবীনবাবুকে? রবীনভায়া ত' এই করোর একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা। তবে বছরে দিন পনেরোর বেশী থাকে না। তুমি ওকে চিনলে কি করে।

ওঁর সাহায্য না পেলে আমার পড়ালেখা হতো না। যেটুকু শিখেছি—ওঁরই দয়ায়।—পাখি বললে।

ও। কোনদিন ত' শুনি নি। তোমার কাছেও না, ওর কাছেও না। তবে রবীন আমাদের আদর্শ পুরুষ। বড় কৃতী ছেলে। নিজের চেষ্টায় ও লেখাপড়া শিখেছে। নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়িয়েছে। বইয়ের দোকান দিয়েছে, প্রেস করেছে।

আপনি দেখছি রবীনবাবুর সব খবরই রাখেন।—পাখি বললে।

তার মানে? নীতীশকুমার একটু আশ্চর্যের দৃষ্টি বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ধরতে গেলে রবীনের সংগে একটা আত্মীয়তাও খুঁজে বের করা যায়। ওর স্ত্রী তরফ থেকে।

পাখি ভীরু ভাবে প্রশ্ন করলে—উনি বিবাহিত?

হ্যাঁ তবে সে এক দুঃখের ইতিহাস। বিয়ের ঠিক এক বছর পরেই ওর স্ত্রীবিয়োগ হয়, সন্তান প্রসবের সময়। ছেলেটি বেঁচে আছে থাকে বোর্ডিংয়ে। কেন তুমি কি এসব জানো না?

আমি কেমন করে জানবো বলুন। ওঁর সংগে আমার ত' সে রকম বেশী আলাপ নেই। ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।—পাখি ভক্তি গদগদ হয়ে বললে।

নীতীশকুমারও আর কিছু বললেন না। হঠাৎ বাইরে চোখ পড়ে যেতে দেখলেন কে যেন তাদের দুজনের কথা লুকিয়ে শুনছে। তিনি কে-কে বলে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। বাইরে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল বোধনমায়ী। নীতীশকুমারের গলা পেয়ে সে ছুটে পালাল।

ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকলো—উভয়ের কাছেই। নীতীশকুমার একটু হাসলেন, পাখিকে বললেন—ও কি ভাবে যে তোমাকে দেখে আমি মজেছি। ছোট রাণী করে এনে তোমাকে বোধ হয় পাটরাণী করে রাখবো, তাই ভাবে।

হয়তো—বলে ফেলে পাখি একটু লজ্জাই পায়।

না কি ও নিজেকে দিয়ে, নিজের মন দিয়ে সব কিছু বিচার করে।

সেদিন আর নেই, সে কথা বোধনমায়ীকে বোঝানো গেল না। বোধনমায়ীকে যে দিন এখানে আনি, সে দিনের আমি আর আজকের আমি এক নই। বোধনমায়ীকে তা বোঝানো যায় নি। তাই কি ও ছুকছুক করে?

পাখি এর কি জবাব দেবে? বোধনমায়ীর আচরণ কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারে না।

নীতীশকুমার পাখির চিঠি পেয়ে কি মনে করছেন যে পাখিকে নিজের করে ঘরে বেঁধে না রাখলে করুণের কোনো কল্যাণ হবে না, আর বোধনমায়ী কি নীতীশকুমারের সেই উদ্যমকে ব্যর্থ করার জন্যে ঘুরছে? না, পাখির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে?

পাখির মনে হলো—মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে স্পষ্ট করে বোধনমায়ীকে জিজ্ঞাসা করা অনেক ভালো। সে কি বলতে চায়? কি সে ভেবেছে? পাখির তা আদ্যন্ত জানা দরকার।

করোর পরিবেশ আর যেন স্নিগ্ধ মনে হয় না। লাল সুরকীর পথে কিসের যেন আগুন ঢালা। গাছপালা পর্যন্ত কেমন হতশ্রী, কালচে। করোর জীবন আর ভালো লাগছে না।

এই রকম সময় লোটনের মারফৎ তপেনের নির্দেশ এলো—করোয় তার সংগে দেখা করতে হবে। সন্ধ্যার সময় ভৈরবীর সংগে পাখি যেন কয়েক মিনিটের জন্যে চলে আসে।

পাখির কাছে এ আবার এক নতুন বিপত্তি। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, এখানকার সকলের কাছ থেকে নিজেকে গোপনে রেখে আততায়ীর মতো পাপী মন নিয়ে এসেছে পাখির সংগে দেখা করতে। কেন? বিরহদশার জ্বালা? না সংকল্প সাধনের দৃঢ়তা?

পাখি গেল দেখা করতে। কি উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তপেনের। চেহারাটাও কেমন শুকনো শুকনো ঠেকছে। আহা, পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হচ্ছে ত—পাখির কেমন মায়া হয়। হাজার হোক, এত বড় পৃথিবীতে এত রকম জানা অজানা লোক—তাদের মধ্যে শুধু এই একটি মাত্র

মানুষ, যে পাখিকে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান করেছে। আপনজন বলতে পাখির তপেন ছাড়া আর কেই বা আছে!

তপেন বললে—এত কাছাকাছি আছি, অথচ দুজনের দেখা হচ্ছে না, এ যেন সহ্যের বাইরে। তাই লুকিয়ে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি।

পাখি তপেনের একখানা হাত তুলে নিয়ে দেখলে সে কত রোগা হয়ে গেছে।

তপেন বললে—জীবনে কিছুই পাই নি বলে বড় ক্ষুব্ধ ছিলাম। কিন্তু যখন তোমাকে পেলাম—আমার মনের সমস্ত অসন্তোষ দূরে গেল। কাছে পেয়েও তোমাকে লাভ করতে পারছি না—এ দুঃখ যে সইতে পারছি না পাখি।

পাখির ইচ্ছা হলো একবার বলে—চলো, কোথাও চলে যাই দু' জনে। সেখানে গিয়ে চাকরী বাকরী করে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করা যাবে। কি হবে বড় লোক হয়ে?

কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলো না সে-কথা। তপেন নিজের লক্ষ্য পথে পৌঁছুবার জন্যে চিরটাকাল দুঃখ দুর্দশা সহ্য করেছে। সাধনার সিদ্ধির জন্যে সে জীবনপাত করতেও রাজী। এ রকম একজনকে তার সাধনা থেকে সরিয়ে আনা যায় না।

তপেনের কাছে সরে এসে বুকের আবেগ দিয়ে সে তপেনকে উপলব্ধি করতে লাগলো।

যেন কথায় কথায় তপেন বলে ফেললে—হ্যাঁ করুণের ব্যাপারটা কি হলো। আজ রাত্রে যদি সম্ভব হয়, পূব দিকের বাগানে ওকে নিয়ে এসো। আর তা যদি না হয়—তবে কাল সকালে আমাদের হাত থেকে চেষ্টা করো করুণকে বাঁচাতে।

সহসা শিউরে উঠলো পাখি। একটু বিপন্নতার সংগে বললে—এ তুমি কি বলছো যা-তা! করুণ কি আমাদের পর—যে তার ওপর রাগ বা শত্রুতা করতে যাবো!

তপেন পাখির দিকে শুধু চেয়ে রইলো। পাখি বললে—কি তোমার হয়েছে বলো ত! কি যা-তা ভাবো রাতদিন! যা হয় করে দিন আমাদের চলে যাবে। চলো—আমরা কোলকাতা ফিরে যাই—

তা আর হয় না পাখি। লক্ষ্যপথের অনেকটা দূরে এগিয়েছি, সেখান থেকে ফেরা অসম্ভব।

লোটন ইসারায় তপেনকে কি জানাতেই তপেন বললে—আচ্ছা পাখি, আজ এই পর্যন্ত। তোমাকে বোধহয় খুঁজছে। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাও। আমার কথা কিছু ব৽৷ না। কেউ জানে না যে আমি এখানে আছি—

গোপনে তপেনের সংগে এ ভাবে মেলা মেশার জন্যে সংকোচ আর সংশয় ছিল পাখির যথেষ্ট। তাই দ্রুত সে সেখান থেকে বেরিয়ে একটু ঘুর পথে স্মৃতিসদ্মে গিয়ে হাজির হলো। বুকের ভেতর টিপটিপ করছে।

বাড়ীর বাইরে নীতীশকুমার অপেক্ষা করছিলেন, পাখি দ্বিধা জড়িত পায়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ডাকলেন—পাখির কি কুলায় ফেরার সময় হলো? এসো, এদিকে এসো। তোমাকে যে দেখার জন্যে রবীন যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেছিলে?

এমনি এদিকে একটু বেড়াচ্ছিলাম।—বলে পাখি ভেতরে চলে গেল। তার গমনপথের দিকে লক্ষ্য রেখে নীতীশকুমার বললেন—কাল সকালে যেন কোথাও বেরিও না, রবীন আসবে ভোরবেলা। কাল ও যাচ্ছে শিকারে।

পাখির কথা গুলো কানে গেল বটে, কিন্তু সে দাঁড়াতে পারলো না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে। কেরাসিন তেলের বাতি জ্বলছে। বিছানার একদিকে করুণকুমার ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা জানলা দিয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। চারদিকের গাছপালা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

পাখির মন যেন ভেঙে পড়তে চায়। তপেন শাসিয়ে গেছে

কাল সকালে করুণকে নিয়ে যাবে সে। আবার কাল সকালেই রবীনবাবু আসবেন তার সংগে দেখা করতে।

নীতীশকুমারকে এখন গিয়ে সব বললে কেমন হয়?

কি আবার হবে। পাখির ওই চিঠি পাবার পরেও তিনি নিজের সম্পর্কে কোনো যত্ন নেন নি, কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করেননি। বোধ হয় সবটাই তিনি অবিশ্বাস্য ভাবছেন। পাখির কল্পিত ঘটনা বলে ভেবে পাখিকে অভিসন্ধিমূলক মেয়ে মনে করে বোধনমায়ীকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছেন।

কত এলোমেলো বিশৃংখল চিন্তায় মন ভার হয়ে উঠলো। ঘুম হলো না সারারাত। কোথা থেকে কোথায় সরে এসেছে সে। ধীরে ধীরে জীবনের এই অনিবার্য গতির ধাক্কায় দোল খেতে খেতে কোথায় যে গিয়ে ঠেকবে কে জানে? গ্রাম থেকে নটবরের হাত ধরে যেদিন সে বের হয়েছিল—সেদিন কি সে স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে এই তার পরিণতি?

সব কিছু ত্যাগ করে তপেনকে সম্বল করে আর একবার সে জীবনকে খুঁজে নেবার জন্যে বের হতে পারবে না। করুণ তার কে? করুণের জন্যে তার এই মন কেমন করা? কেন সে নিজের সুখ বা স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেবে?

তপেনের সবটাই ত' অভিনয় নয়? এমনকি কাল সন্ধ্যারাতের ঘটনাটি পর্যন্ত?

ভোরবেলা থেকেই সে করুণকে চোখে চোখে রাখবে—এই রকম প্রতিজ্ঞা করে নিল মনে। করুণ ওঠেও খুব সকালে, প্রায় সূর্যোদয়ের সংগে সংগে। একটু মাঠে উদ্যানে বা ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে যায়। সেই সময়টাই ভয়।

সকালেই নীতীশকুমার পাখিকে ডেকে পাঠালেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাখি নীচের ঘরে বারান্দা পেরিয়ে সদর বৈঠকখানার ঘরে গেল। নীতীশ আলবোলা টানছেন। পাখিকে দেখে তিনি বললেন—

পাখি, বসো। তুমি ত রবীনের ওখানে যাবে মনে করছো। যদি, যাও, একটা কথা শুধু বলো না।

কি কথা? পাখি জিজ্ঞাসা করলে।

এই বোধনমায়ী যে তোমার বা আমার ওপর চোখ রেখে চলে, সেটা যেন কথায় কথায় ব্যক্ত করো না।

কেন?

রবীন আবার আমার সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবে বসবে—এমনিতেই ত' প্রত্যেক বছর এসে সাবধান করে দেয়—দাদা, আর কিন্তু বিয়ে করতে পারবেন না। বোধনমায়ীকে কোথাও পাঠিয়ে দেন—তার ওপর তোমাকে এখানে দেখলে—আর ত'—।

পাখির চোখ হঠাৎ বাইরের দিকে পড়তেই সে ঝড়ের মতো ঊর্ধ গতিতে বেরিয়ে গেল। করুণ ইতিমধ্যে বাড়ীর বাইরে ফাঁকা জায়গায় গেছে বেড়াতে।

খোকা—যেও না, ওদিকে যেও না, বলতে বলতে পাখি প্রায় উন্মাদের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

নীতীশকুমার তৈরী ছিলেন—তবে ব্যাপার যেমন আকস্মিক, তেমনি সন্দিগ্ধ বলে তিনিও মন্থর গতিতে বের হলেন পিছু পিছু।

পাখিকে দৌড়ে আসতে দেখে করুণেরও মনে হলো একটু খেলা করে। সে—'মা-মণি ধরতে পারে না, আমায় ধরতে পারে না' বলতে বলতে দৌড়তে লাগলো।

স্বল্প বাঁকের মুখেই তপেন অপেক্ষা করছিল—সে লুব্ধ চিগলের মতো ছোঁ মেরে করুণকে ধরে বলতে লাগল—আমি ধরতে পারি কিন্তু।

বাঃ বাঃ—কাকু ধরতে পারে—মা-মণি পারে না। কাকু চলো, চলো—এদিকে পালাই—বলে করুণ ছুটতে লাগলো পথ ধরে, তপেনও হাত ধরে দৌড়তে লাগলো।

পিছন থেকে আর্তকণ্ঠে পাখি চোর, খুনে, ডাকাত মেরে ফেললে—বলে চীৎকার জুড়ে দিল।

চৌধুরী লজের পাশ দিয়ে করুণকে ধরে নিয়ে পালাবার সময় রবীনবাবুর দৃষ্টি পড়লো তপেনের ওপর। তৎক্ষণাৎ পাখির সেই আর্ত চীৎকার। তিনি বন্দুক নিয়ে নেমে এলেন।

পাখিকে দেখে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই পাখি বলে উঠলো—করুণকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে—ওই, ওই দস্যু। করুণকে খুন করবে বলে

রবীনবাবু একটু তেড়ে গেলেন। বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন তপেনকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ তার সন্ধান। একটু আওয়াজ, একটু ধোঁয়া! কতকগুলি দাঁড়কাক সন্ত্রস্ত হয়ে গাছ ছেড়ে সশংক চীৎকারে শূন্যতা পূর্ণ করতে করতে উড়ে গেল। ততক্ষণে সে জায়গাটায় করোর প্রায় সকলেই এসে হাজির হয়েছে।

ডান পায়ের থাই ভেদ করে গুলি চলে গেছে তপেনের, রক্তে ভিজে গেছে শরীরের নিম্নাংগ। করুণকে ছেড়ে দিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। লাল সুরকির পথে আর একটু রক্তের লাল দাগ জমেছে।

নীতীশকুমার তপেনকে দেখে সবচেয়ে বেশী আহত হলেন—একি গিরীশ? গিরীরশকে খুন করেছো তুমি, রবীন। কেন?

গিরীশ তখন সংজ্ঞাহীন। নিস্তেজ শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ভগ্নপাখা শকুনের মতো।

উত্তেজনার পর রবীনবাবু কেন গিরীশকে হত্যা করো হলো—তার আনুপূর্বিক কাহিনী শোনার জন্যে পাখির দিকে তাকাতে গেলেন, দেখলেন—সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে নাকে হাত দিয়ে তিনি দেখলেন যে পাখির নিঃশ্বাস বইছে।

লোটন ছাড়া করোর মেয়ে পুরুষ—সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। ব্যাপার কি—জানার কৌতূহল সকলেরই।

নীতীশকুমার আদেশ করলেন—গিরীশের দেহ কুড়িয়ে নিয়ে—তাঁর বাড়ীতে রাখতে। তাঁর ধারণা হয়েছিল—গিরীশ সংগে সংগেই মারা গেছে। আসলে গিরীশ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

পাখিকেও তুলে নিয়ে যাওয়া হলো।

তৎক্ষণাৎ কারমাটার আর চিত্তরঞ্জনে লোক পাঠানো হলো—ডাক্তার ডাকার জন্যে। যদি বাঁচানো যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

করুণ ঠক ঠক করে কাঁপছিল। এত বেশী ভয় পেয়ে গেছে—মুখ দিয়ে তার কথা সরছে না। সে বাবাকে তাই ব্যাপারটা কি ঘটলো বোঝাতে পারলো না। সে শুধু বলতে লাগলো—মা-মণি আমাকে বাড়ীর বাইরে যেতে বারণ করেছে। বলেছে—কিছুতেই তুমি যেয়ো না। যেতে পারবে না।

করুণের কথার এই সূত্রটুকু থেকে রবীনবাবু অন্তত এইটুকু বুঝতে পারলেন যে পাখি জানতো করুণের ওপর আজ একটা হামলা হবে। কিন্তু কেন?

কারমাটার থেকে ডাক্তার এসে পড়লো। পরীক্ষার পর তিনি বললেন—এ যে খুনে কেস। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে? মেয়েটির ত' কিছু হয়নি বিশেষ। শক লেগে ভয়ে হতচৈতন্য হয়েছে। একটা ইন্‌জেকসন দিচ্ছি। একটু ব্র্যাণ্ডি আর গরম দুধের কেস। আর—এই এঁর চিকিৎসা একটু সময় সাপেক্ষ। গুলিটা বড্ড বিশ্রী জায়গায় লেগেছে। এক্সরে করতে হবে, কার্তুজ ভেতরে আছে কি নেই, দেখতে হবে। আর ব্লাড সুগার দেখতে হবে। তবে আপাততঃ যা করণীয় তাই করছি।

গিরীশের দেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে পোষাকের মধ্যে ডাক্তারবাবু রিভলবার আর একটা বড় ছোরা আবিষ্কার করলেন।

করোয় ফাঁড়ি আছে—সেখান থেকে পুলিশ এল। রবীনবাবুই প্রধান আসামী। পাখি রাজসাক্ষী। জবানবন্দী নিয়ে সকলকেই ছেড়ে রাখা হলো—এমনকি আসামীকেও।

কোথা দিয়ে কি হলো কে জানে। পাখি এ আবার কোন্ বিপদে জড়িয়ে পড়লো।

বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরে এলে গিরীশ শুধু এইটুকু বললে—

করুণকে না দেখলে থাকতে পারি না বলেই লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে যাই। আজও দেখতে এসেছিলাম—

পাখি বললে—আদালতেই সব শুনবেন আপনারা। আমি সেখানে আমার সব কথা বলবো।

রবীনবাবু কত সাধনা করলেন পাখির মুখ থেকে কথা বার করার জন্যে, নীতীশকুমার অনুরোধ করলেন, বোধনমায়ী জিজ্ঞাসা করলে, এমন কি করুণেরও কৌতূহল ভরা দু চোখের প্রশ্ন ছিল—পাখি একবারে নীরব হয়ে গেছে। পাথরের মতো নিস্তব্ধ হয়ে রইলো, কিছু সে বলবে না। তপেনকে শুশ্রূষা করতে গিয়েছে সে, সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তারপর থেকেই সে চুপ।

বার বার রবীনবাবু আর নীতীশবাবু তাকে বিরক্ত করতে লাগলেন। খুব বেশী অসহ্য হয়ে পড়ায় একবার মাত্র নীতীশকুমারের মুখের ওপর পাখি বলে উঠলো—আপনি ত' জানেন সব। আমি চিঠি লিখে আপনাকে আগেই ত' সব ব্যাপারটা জানিয়ে ছিলাম।

চিঠি? কোন্ চিঠি? কার চিঠি? নীতীশকুমার ত' কোন চিঠি পান নি?

চিঠি নিয়েই জেরা চললো, প্রশ্নের পর প্রশ্ন হলো। পাখি আর কোনো কথা বলতে রাজী নয়।

পাখির মনে হতে লাগলো নিরীহ সদাশিব রবীনবাবু এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন, খুনে আসামী হয়ে পুলিশের কাছে চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবেন। ছি ছি—এ লজ্জা যে তার কোনদিন ঘুচবে না।

তপেনের কপট আচরণ আর নৃশংস ব্যবহারে পাখি জর্জরিত হয়েছিল। এখন যেন সে পাখিকে চেনে না—এই ভাব দেখাচ্ছে। কিন্তু রবীনবাবু তার সংগে সহজ ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি। এই বিপত্নীক আত্মভোলা মানুষটির জন্যে পাখির চোখে জল এল। কি করে এঁকে বাঁচানো যায় এই হলো পাখির একমাত্র ভাবনা।

॥ দশ ॥

দু একদিন পরে একদা সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধনমায়ী চৌধুরীলজে এসে রবীনবাবুকে নমস্কার করে দাঁড়ালো। রবীনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর?

একঠো বাৎ আছে বাবু। ভরসা দেন ত' বলি। পাখি যে চিঠি চিঠি বলছে না—উ ঠিক কথা বলেছে বাবু। কোলকাতাসে উ চিঠি দিয়েছে।

চিঠি দিয়েছে? তুমি জানলে কি করে?—রবীনবাবু অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর মনে পড়ে যায়—থানা থেকে দারোগা এসেছেন তদন্তে—পাখির, তপেনের, তাঁর জবানবন্দী নিতে। আজ বিকেলে সে পর্ব চুকেছে। এখনো তিনি ফাঁড়িতে আছেন মনে করে তৎক্ষণাৎ গণেশকে পাঠালেন তাঁকে ডেকে আনতে। তারপর বললেন —বোধনময়ী, ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে বুঝতে পারছিস ত! সাচ বলচি, থানার বাবু এখন আসবে। চিঠির কথা তখন বলিস।

সে চিঠি যে আমি লিয়েছি বাবু। কর্তাবাবু তখন ছিলেন না— মধুপুর ছিলেন। আমি সে চিঠি লিয়ে নিজের কাছে রেখেছি।

দারোগা এলেন। তিনিই প্রশ্ন করলেন—কেন তুমি ওই চিঠি নিতে গেলে?

কাঁদো কাঁদো স্বরে বোধনমায়ী বলতে লাগলো—আমি ভাবলাম কি পাখি ছুঁড়িটার বড় প্রেম হয়েছে। বুড়াকে একদিন না দেখেছে ত' প্রেম-চিঠি লিখেছে। এই সংসারটি বাঁচাতে হবে—তাই ভেবে আমি সে চিঠি তুলে রেখেছি—কর্তাবাবুর হাতে পৌঁছে দিই নি।

কোথায় সে চিঠি? দারোগা প্রশ্ন করলেন।

আমারই ঘরে কুলুংগীতে তোলা রাখছি বাবু, লুকায়ে রাখছি কেউ

যাতে না জানতে পারে। আমি সেদিন থেকে কর্তাবাবুরে আর উই ছুঁড়িটারে চোখে চোখে রাখতাম, বেচাল হয়ে যায় পাছে।

পুলিশের লোকের সংগে গিয়ে বোধনমায়ীর ঘর থেকে চিঠি আনা হলো যখন—তখন সকলেই জানতে পারলো পাখির চিঠির হদিস। পাখিও জানতে পারলো। শুধু তপেনকে পাটনা সহরের হাসপাতালে পুলিশের পাহারাদারিতে রাখা হয়েছে বলে সে জানতে পারল না।

খামটি খোলা হয় নি। পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে তারিখ সংগৃহীত হলো। পাখি হাতের লেখা ঠিকানার সংগে পাখির লেখা মেলানো হলো। তারপর খাম খুলে পড়া হলো চিঠিটা। নীতীশ-কুমার সচেতন হলেন। পাখির ওপর মায়া তার বেড়ে গেল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দুচোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। তিনি পাখিকে আশীর্বাদ করার জন্যে হাত বাড়াতে লাগলেন।

দারোগা বললেন—এ কেসের ত' আর কিছু রইলো না রবীনবাবু। একে ত' আমরাও খুঁজছিলাম। আরো কটা মামলা ওর বিরুদ্ধে ঝুলে আছে।

গিরীশের ডান প'-খানা বাদ দিতে হয়েছে। নীতীশকুমারের চেষ্টায় আরো গুরুতর সাজা থেকে ও বেঁচেও গেল। চিরদিনের মতো দাদার অনুগত দাস হবার সাধু প্রচেষ্টা নিয়ে বেঁচে থাকবে, এই মর্মে ঘোষণা জানিয়ে সে দাদার কাছ থেকে মাসোহারা ব্যবস্থা করে কোলকাতা ফিরে এসে বগলে ক্রাচ দিয়ে পথ হাঁটবে প্রতিজ্ঞা করলে।

নীতীশ পাখিকে সহজে ছাড়ে নি। রবীনের কাছে তার জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। রবীন বিপত্নীকে এলোমেলো, ছন্নছাড়া। তার জীবনকে প্রসন্ন করার দায়িত্ব যদি এই উৎপীড়িত মেয়েটি গ্রহণ করে—তার চেয়ে সুখের আর কি হতে পারে?

রবীনবাবু কিন্তু কিন্তু করে প্রতিবাদ করার আগেই নীতীশকুমার পাখিকে তাঁর হাতে সঁপে দিলেন। পাখি একবার বিমূঢ় ভাবে নীতীশ-কুমারের দিকে আর একবার লজ্জানত চোখে রবীনবাবুর দিকে তাকালো।

বসন্তের উন্মাদ এলোমেলো হাওয়ায় পাখির সংযত কৌমার্যের পর্দায় বুঝি বা পলাশ ঝপ করে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলে। তারই আভা ছড়িয়ে পড়লো, দিকে দিগন্তে, প্রকৃতির চতুর্দিকে। ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য-সম্ভার থেকে চুরি করা একখানি রক্তিম বর্ণরাগ বুঝি রাঙিয়ে দিলে করোর গাছপালা, মানুষ জন, পাখির চারপাশে! চিরদিন বিরহের না পাওয়ার বেদনার মাঝখানে হঠাৎ যেন প্রিয়তম বাঞ্ছিততম দেবতার স্পর্শে পাখির চমক লাগলো! কোথায় কোন্ দক্ষিণের প্রদেশ থেকে একখানি হাওয়া বুঝি উড়ে এল, সুর বাজাল, গান তুলে দিলে পাখির প্রাণে।